ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ.

হিন্দু জাতির ইতিহাস

হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন ধর্ম চতুষ্টয়

সত্য, যুক্তি ও তত্ত্বের নিরিখে



প্রকাশকের কথা

মুহতারাম পাঠক, 'হিন্দু জাতির ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থটি অবশেষে আপনাদের সম্মুখে আনতে পেরেছি। স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে মুখ ফসকে বেরিয়ে আসছে আলহামদুল্লিাহ।

ভারতবর্ষে যে সকল জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মাবলম্বী রয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকটি ধর্ম ও ধর্মের ইতিহাস, তাদের জীবনাচার, সংস্কৃতি চর্চা, প্রাকৃতিক গড়ন ও সত্যান্বেষা, সমূহ বিকৃতি ও বিভ্রান্তি, আন্তপ্রতিবেশি সুসম্পর্ক ও বৈরিতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

ওই সকল ধর্মে ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কাছে সত্যধর্ম তথা ইসলামের দাওয়াত কীভাবে পৌঁছেছে, কেন তারা স৲ধর্মকে গ্রহণ করেছেন বা করেননি, পূর্বেকার ইতিহাস ও পরের ইতিহাসের সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্নতা, তাদেরই বিবৃত বা গৃহীত ধর্মগ্রন্থের আলোচ্য বিষয়কে তারা কীভাবে পাশ কাটিয়ে যায়—ইত্যাকার বিশদ বিবরণ উঠে এসেছে এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায়, অধ্যায়ে ও কথামালার আবরণে।

গ্রন্থটি আরবি ভাষায় লেখা। লেখক স্বয়ং নওমুসলিম। কিন্তু নওমুসলিম হলেও তার আলোচনা ও গভীর দৃষ্টিপাত ঐতিহ্যগত মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, নাড়িয়ে দিয়েছে, জাগিয়ে দিয়েছে রীতিমতো। সত্যপথকে আবিষ্কারের তথা হিদায়েতের পথে তার যে দুস্তর অভিযাত্রা, তা অলৌকিক প্রাপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ পথে মহান আল্লাহই যে তার একমাত্র সহায়, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন আমাদের সময়ে বাংলা ভাষায় দ্বীনের একজন বলিষ্ঠ দাঈ ও মুবাল্লিগ জনাব মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন। দ্বীনের পথে তার

গভীর চিন্তাশীলতা ও অবিচল নিষ্ঠা আমাদের তারুণ্যের পাথেয় তথা উজ্জ্বল দিগ্দিশা হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা।

পরিশেষে বলব, সব অনুবাদ এক নয়। সব বই এক নয়। ঠিক এটিই অন্য পাঁচ/দশটি বইয়ের মতো নয়। ভিন্ন ও সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। নানা জটিল শব্দ, স্থান, প্রাগৈতিহাসিক ব্যক্তি ও বিকৃত ধর্মাচারসহ নানা কালের বিবর্তন ও বিবরণ যথাশব্দে প্রয়োগ দিতে পারা, সে বড়ই কঠিন কাজ। সেই কঠিন বিষয়গুলোকে আমরা শতভাগ নির্ভুল করতে চেষ্টার কোনোরূপ ত্রুটি করিনি। তারপরও যেকোনো অসঙ্গতি বা বিচ্যুতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে, আমাদের জানিয়ে বাধিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রাখছি। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেবো, ইনশাআল্লাহ।

এ কাজে যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর, তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যত অসুন্দর ও বেখেয়ালি, তা কেবল আমাদের সীমাবদ্ধতারই ফসল। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.

এই বইয়ের গল্প

সকল প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বিশ্বস্ত রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পূতপবিত্র পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের ওপর।

এই বইটির একটি গল্প আছে; আমার মনে হয় পাঠকের তা সংক্ষেপে জানা উচিত। আল্লাহ তাআলা যখন আমাকে তাঁর বিশুদ্ধ ইসলামে জায়গা করে দিলেন, আমার এই নব নির্বাচিত ধর্ম নিয়ে হিন্দুধর্মের পণ্ডিতদের একটি দলের সঙ্গে আমার নিয়মিত বিতর্ক ও আলোচনা চলতে থাকে। এছাড়াও অন্যান্য ধর্মের সঙ্গেও ইসলামের তুলনা চলতো। সেই তর্ক-বিতর্ক কিংবা আলোচনার মাধ্যমে তাদের জোর প্রচেষ্টা ছিল, আমাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করা। কিন্তু মহান আল্লাহ যেভাবে আমাকে ইসলামের দিশা দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন, সেভাবে এই বিপদসংকুল ঝড়ের সামনেও ইসলামের ওপর অটল থাকার শক্তি দিয়েছেন। সেই পণ্ডিতদের বিতর্ক ও সমালোচনা আমার ঈমান ও আকিদাকেই শুধু বৃদ্ধি করেছে। ইসলামের মজবুত রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার জন্য মুষ্টিকে শানিত করেছে। আমার জীবনে প্রশান্তির ছায়া দান করেছে। সর্বোপরি আমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বাড়িয়েছে।

তখন থেকেই আমি একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—আমি এসব অসার ধর্ম ও বিশ্বাসের বিভ্রান্তি সম্বন্ধে এমন একটি সন্তোষজনক গ্রন্থ প্রণয়ন করবো, যা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে, যদিও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এত কাঠখড় পোড়াতে হয় না।

সেই থেকেই আমার মনে বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাস নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং তা অপরকে জানানোর আগ্রহ গেঁথে যায়। এগুলোর সঙ্গে ইসলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা ঝোঁকও পেয়ে বসে। এই চিন্তা আমার মন-মগজ থেকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হচ্ছিল না। বরং এমনটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, এই চিন্তা থেকে আমার জীবনের একটি মুহূর্তও মুক্ত ছিল না। সুতরাং আমি আহলে কিতাব ও অগ্নি উপাসকদের বিভিন্ন বইপুস্তক থেকে তথ্য ও উপাত্ত আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সেসবে নিজের উদ্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়ি। আমি

আশা করি, এই ময়দানে অবদান রাখা মানুষগুলোর কাতারে আমিও অংশীদার হবো। সেই সঙ্গে আমি এ-ও কামনা করি যে, সম্পূর্ণ কাজটি সাধারণ মুসলিমদের জন্য উপকারী হবে, বিশেষ করে ওইসব নও মুসলিমের জন্য সহায়িকা হবে, যারা আমার মতো পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন অহরহ।

আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমার হৃদয়কে ইসলামের ওপর সুদৃঢ় রেখেছেন। শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ পার হওয়ার পর এ বিষয়ে আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের তাওফিক দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে একটাই চাওয়া যে, তিনি যেন এই কাজটি কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেই কবুল করেন। তিনি উত্তম অভিভাবক, উত্তম সহযোগী।

সালাত ও সালাম আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সকল নবি-রাসুলগণের ওপর।

—গ্রন্থকার
মদিনা মুনাওয়ারায় লিখিত
১০ রমজান, ১৪০৪ হিজরি
(আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন।)

লেখকের ভূমিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين

أما بعد:

হিন্দুস্তান তথা ভারতবর্ষের ধর্মগুলো অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখধর্মের ওপর রচিত এটি একটি ছোট্ট পুস্তিকা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় বিশ বছরের। মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত ইসলামি ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় আমি হিন্দুধর্ম নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এরপর অন্যান্য গবেষণা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আমার সেই কাজের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। কিন্তু তখন থেকে আমি সুযোগ পেলেই এই জাতি সম্পর্কে লিখিত বইপুস্তকে গভীরভাবে নজর বুলাতে থাকি।

১৪০৯ হিজরিতে আমার রচিত গ্রন্থ *আল-ইহুদিয়্যাহ ওয়াল মসিহিয়্যাহ* প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, হিন্দুস্থানের ধর্মগুলো নিয়েও আমি কলম ধরবো। সেই প্রতিশ্রুতি-পূরণে এই গ্রন্থটি রচনা করা আমার ওপর আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আলহামদুলিল্লাহ, আজ সে দিনটি আমার সামনে সমুপস্থিত। এই গ্রন্থটির রচনা আমরা শেষ করতে পেরেছি। যখন একজন মুসলিমকে আমি তার দ্বীন ও আকিদাকে আঁকড়ে ধরে জীবনযাপন করতে দেখি, তখন আমি মনস্তাত্ত্বিক সৌভাগ্যে সিক্ত হই। সেই মুসলিম তার চারপাশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির অন্ধকারে ঘুরপাক খেতে দেখে। অতঃপর সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সিজদাবনত হয়, যে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেছেন—

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ .

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। [সুরা রুম, আয়াত : ৩০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .

যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের উদাহরণ মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানতো। [সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৪১]

তিনি আরও ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ .

হে লোকসকল, একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব, তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করো, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। [সুরা হজ, আয়াত ৭৩]

প্রিয় পাঠক ভাইবোন আমার, আপনাদের দায়িত্ব আল্লাহর দ্বীনকে বোঝা। গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করা। দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আপনাদেরকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, তা হলো তাওহিদ। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আপনি দেখতে পাবেন, কীভাবে একটি জাতি পুরোপুরিভাবে তাওহিদের ক্ষেত্রে পথহারা হয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তাআলাকে বাদ দিয়ে গাছপালা, পাথর, মানুষ-জিন ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। যিনি বলেছেন সত্য বলেছেন, 'তারা এক ইলাহ থেকে পালাতে গিয়ে বহু দেবতার খপ্পরে পড়ে গেছে।'

তাই তো বলা হয়, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি সিজদা তোমাকে বহু দেবতার প্রতি হাজারো প্রণাম করা থেকে বাঁচিয়ে দেবে।'

এই গ্রন্থ রচনায় আমি যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছি :

১. আমি বিষয়াবলিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মত অনুযায়ী উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

২. আমি তাদের উপাস্যদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য না করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। তারা যেভাবে তাদের উপাস্যদের চিত্রায়ণ করেছে, আমিও ঠিক সেভাবেই তাদের বর্ণনা দিয়েছি। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না, যারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালমন্দ করবে। [সুরা আনআম, আয়াত : ১০৮]

৩. আমি বিষয়াবলি উপস্থাপন করেই ক্ষান্ত হইনি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকে ইতিহাস ও যুক্তির নিরিখে সেগুলো পর্যালোচনা করেছি।

৪. জটিল বিষয়গুলোকে আমি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এগুলোর ব্যাখ্যার পেছনে আমি সময় ক্ষেপণ করিনি। কেননা, এগুলো এতই বিরোধপূর্ণ যে, চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে আসা প্রায় অসম্ভব। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতেই বিষয়গুলো নিয়ে সাংঘর্ষিক মতামতও সন্নিবেশিত হয়েছে। মূলত মজবুত আকিদা ও ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্রের অনুপস্থিতির ফলেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ধর্মে আস্থা রাখার মতো কোনো কিছুই নেই। তাদের অধিকাংশ ধর্মীয় বর্ণনাগুলি লোকমুখে প্রচলন-নির্ভর। তাদেরই অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ স্বীকার করেছেন যে, হিন্দুরা তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সেভাবে সংরক্ষণ করেনি, যেভাবে আরব ও গ্রিকরা নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করেছে।

৫. অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি হিন্দুদের নিজেদের লেখা গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছি। তাই পাঠক গবেষণাটির মাঝে তাদের অতীত ও বর্তমানের বহু পণ্ডিতবর্গের আলোচনা দেখতে পাবেন। বিশেষভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাদের সমুন্নত ভাবমূর্তি রয়েছে। অনেক সময় আমি ব্যাপক প্রচলিত বিষয়ে আমার জানাশোনার ওপর নির্ভর করে রেফারেন্স উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি।

আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে আমি ১৪০০ ও ১৪০১ হিজরিতে মদিনায় অবস্থিত ইসলামি ইউনিভার্সিটিতে হাদিস বিভাগে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পাঠদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হই। ফলে, সে-সময়ে আমার কাছে ধর্মগুলো সম্পর্কে বিশাল এক তথ্যভাণ্ডার জমা হয়। সেই তথ্যভাণ্ডারের একটি অংশ *আল-ইহুদিয়্যাহ ওয়াল মসিহিয়্যাহ*[১] নামে ১৪০৯ হিজরিতে প্রকাশিত হয়।

আমার সঞ্চিত সেই তথ্যভাণ্ডারের দ্বিতীয় অংশ প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, বিন্যাস ও সংযোজনপূর্বক *ফুসুলুন ফি আদইয়ানিল হিন্দ* (হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মের ইতিহাস) নামে পাঠক সমীপে উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি। আশা করছি, গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে জ্ঞানান্বেষীদের উপকারে আসবে। আর বিশেষভাবে যারা পৌত্তলিক সমাজে দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন, তাদের উপকারে আসবে। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যাতে আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দান করেন। এবং আমাদেরকে ঈমান ও ইসলামের ওপর মৃত্যু দান করেন।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন।

—লেখক
(আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন)
মদিনা মুনাওয়ারা
১৫/০৬/১৪১২ হিজরি
পুনর্নিরীক্ষণ : ২৫/১২/১৪১৬ হিজরি

---

[১] বইটি বাংলায় *ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস* নামে মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়।-অনুবাদক

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহু অবিভক্ত ভারতের আজমগড়ের একটি সাধারণ হিন্দু পরিবারে ১৩৬২ হিজরি মোতাবেক ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত তিনি সেখানেই লেখাপড়া করেন। এ সময় তিনি ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন। প্রচুর গবেষণা ও অধ্যয়নের পর তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশেষ করে তিনি *দ্বীনে হক* পুস্তিকাটি পড়ে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে আজমগড় শিবলি কলেজে পড়ার সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল বঙ্কেরাম। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের নাম পালটে রাখেন ইমামুদ্দিন। পরবর্তী সময়ে হিন্দুদের নির্যাতনের ভয়ে তিনি পুনরায় নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রাখেন। প্রথম দিকে গোপনে সালাত ও সাধ্যমতো ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করলেও একসময় তা পরিবারে জানাজানি হয়ে যায়। তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তার পিতা ও আত্মীয়স্বজনরা মেনে নিতে পারেননি। তাকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তারা পুরোদমে চেষ্টা করতে থাকেন। তারা তার হাতখরচ ও লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যার হুমকি দেন। প্রাণনাশের আশঙ্কা মাথায় নিয়ে তিনি পাকিস্তান হিজরত করেন।

পাকিস্তানে তিনি একটি মাদরাসায় ভর্তি হন। উপমহাদেশের অধিকাংশ মাদরাসার মতো উক্ত মাদরাসাতেও ফিকহে হানাফি অনুযায়ী পাঠদান করা হতো। কিন্তু তিনি ফিকহি ও ফিকরি দিক থেকে এই মাদরাসার পাঠ্যসূচির সঙ্গে একমত হতে পারেননি। এ সম্পর্কিত আলোচনা তিনি তার *আবু হুরায়রা রা. ফি দওই মরবিয়্যাতিহি* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এরপর তিনি সৌদি আরবে হিজরত করেন। সেখানে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটিতে হাদিস নিয়ে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। এরপর তিনি মিশরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি সম্পন্ন করেন। ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি হাদিস, তাফসির, ধর্মতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তবে সবকিছু ছাপিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রতি তার ঝোঁক ছিল প্রবল।

কর্মজীবনে ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ. প্রথমে মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত রাবেতাতুল আলামিল ইসলামির জেনারেল সেক্রেটারির অফিসের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি সেখানকার হাইআতুত তাদরিসের (শিক্ষক পরিষদ) সদস্য মনোনীত হন। ধীরে ধীরে তিনি প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি সেখানকার কুল্লিয়াতুল হাদিসের (হাদিস ফ্যাকাল্টি) প্রধান মনোনীত হন। এ সময় তিনি ছাত্রদের গবেষণাপত্রের সুপারভিশনের পাশাপাশি *সহিহুল বুখারি*, *সহিহ মুসলিম*সহ বিভিন্ন বিষয়ে দরস দিতেন।

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমিকে সৌদি সরকার অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করেন। তৎকালীন রাবেতাতুল আলামিল ইসলামির সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ বিন আলি আল-হারাকানের সুপারিশে তিনি সৌদি আরবের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহু জীবনের অধিকাংশ সময় ইলমে নববির খেদমতে ব্যয় করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতেন। সৌদি আরবের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করেন। আরবি, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। পাশাপাশি অনেকগুলো গ্রন্থের তাহকিকও (সম্পাদনা) তার কলমে সম্পন্ন হয়।

হিজরত করে সৌদি আরবে থিতু হলেও ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি ভারতে নিজ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। পিতামাতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাদির জোগান দিতেন। তিনি সর্বদা পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন।

কিন্তু সামাজিক লজ্জার অজুহাতে তারা সবসময় তা এড়িয়ে যেতেন। এতদসত্ত্বেও পিতামাতার প্রতি সদাচারে তিনি কোনোরূপ ত্রুটি করতেন না।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা, তাহকিক ও টিকা সংযোজন করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. *আলজামেউল কামিল ফিল আহাদিসিস সহিহিশ শামিল* (১২ খণ্ড)।
২. ইবনে তাল্লা কর্তৃক রচিত *আকজিয়াতু রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম* (তাহকিক ও টীকা সংযোজন)।
৩. *আবু হুরাইরা রা. ফি দওই মরবিয়্যাতিহি*।
৪. *আল-ইয়াহুদিয়্যা ওয়াল মসিহিয়্যা*।
৫. *ফুসুলুন ফি আদইয়ানিল হিন্দ*।
৬. *আল মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা* (তাহকিক)।
৭. *আলমিন্নাতুল কুবরা শরহু ও তাখারিজুস সুনানিস সুগরা*।
৮. *দিরাসাতুন ফিল জরহি ওয়াত তাদিল*।
৯. *আমালি ইবনু মারদুয়াই* (তাহকিক)।
১০. *মুজামু মুসতালাহিল হাদিস ওয় লাতাইফুল আসানিদ*।
১১. *আততামাসসুক বিস সুন্নাহ ফিল আকাইদি ওয়াল আহকাম*।
১২. *দাওয়াতুল কুরআন*।
১৩. *কুরআন এনসাইক্লোপিডিয়া*।
১৪. *কুরআন কি শিতল ছায়া*।

এছাড়াও তার বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ মদিনা ইউনিভার্সিটি জার্নালসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এই মহান বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব বিগত ৯ জিলহজ ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ৩০ আগস্ট ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, আরাফার দিনে ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ শোক প্রকাশ করেন।

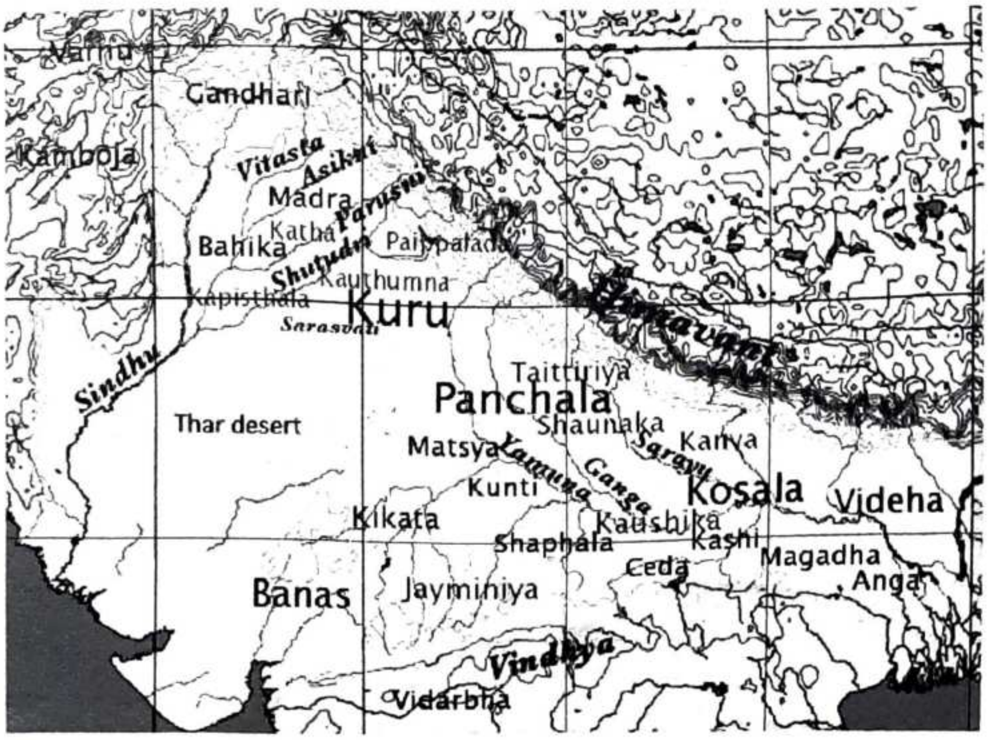
মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ মাকাম দান করুন, আমিন।

সূ চি প ত্র

হিন্দু জাতির ইতিহাস

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান
একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

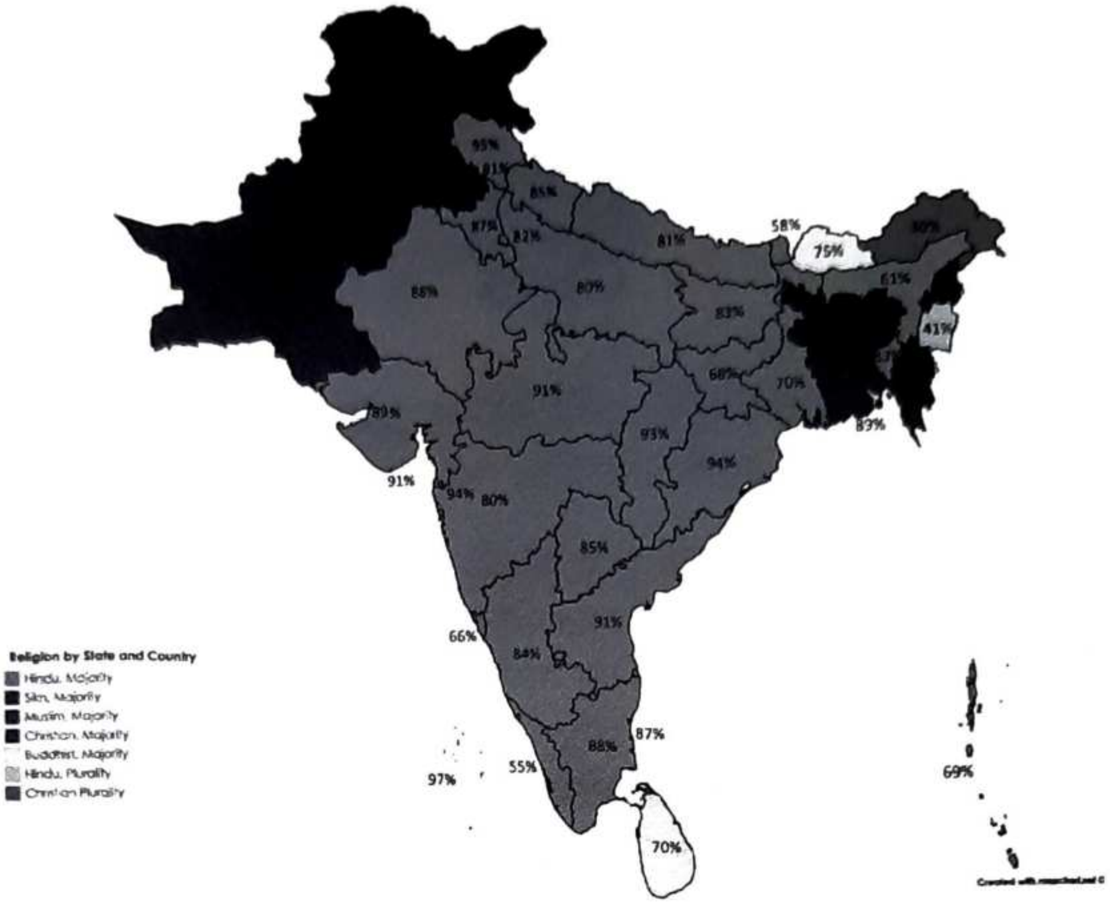
দৈর্ঘ্যের বিশালত্ব, জনসংখ্যার আধিক্য ও প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে ভারতবর্ষকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই ভারতবর্ষ বলতে বোঝায় উত্তরের হিমালয় পর্বত থেকে নিয়ে কাশ্মীর ও ভুটান পর্যন্ত, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে সিন্ধু অঞ্চল ও পূর্বে বার্মা[১] পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল অঞ্চল। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থসমূহের ধারাভাষ্য অনুযায়ী, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ (হিন্দুস্তান) বলতে এই বিশাল ভূখণ্ডকে বোঝাত না। বৈদিক ভারত (VEDIC INDIA) বলতে বোঝানো হতো, কাশ্মীর থেকে নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ এবং সিন্ধু অঞ্চল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে। অপরদিকে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের বিশাল অংশকে বৈদিক ভারতের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হতো না।



বৈদিক ভারতের (VEDIC INDIA) মানচিত্র

---

[১] বর্তমান মিয়ানমার।-অনুবাদক



ভারতীয় উপমহাদেশের বিভি ন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার চিত্র

ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা

খ্রিষ্টপূর্ব তিন সহস্রাব্দ পূর্ব থেকে বসবাসরত ভারতবর্ষের আদি অধিবাসী সম্পর্কে পৃথিবীর জাতিসত্তার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই লেখা হয়নি। তবে এ অঞ্চলে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। মহেঞ্জোদারো (MOHANJODAR) সভ্যতার আবিষ্কার এটাই প্রমাণ করে। কোনো কোনো গবেষকের মতে, এই আবিষ্কারের ফলে বোঝা যায় যে, এ অঞ্চলে মানুষের শারীরিক গঠন, বর্ণ ও জাতিগতভাবে একটি মিশ্র প্রজন্মের অস্তিত্ব ছিল। তারা বলেন, ইতিহাসে এরা 'দ্রাবিড়' নামে পরিচিত। কোল ও তুরানি জাতির সংমিশ্রণে দ্রাবিড়দের উৎপত্তি। কোল হলো পাহাড়, বন ও উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী যাযাবর জাতি। ইতিহাস এদেরকে জংলি বা বন্যমানব হিসেবে অভিহিত করেছে। অপরদিকে তুরানিরা তুর্কিস্তানের অধিবাসী। এরা খ্রিষ্টপূর্ব কয়েক হাজার বছর পূর্বে হিন্দুস্তানে আগমন করে। এখানে এসে তারা কোল সম্প্রদায়কে পরাভূত করে নিজেদের অধীন করে নেয়। কালপরিক্রমায় তুরানি সম্প্রদায় কোল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যায়। এই সংমিশ্রণ থেকে নতুন একটি জাতিসত্তার উদ্ভব ঘটে। এই নতুন জাতিসত্তাই পরে দ্রাবিড় নামে পরিচিতি লাভ করে।

এই দ্রাবিড়রা সিন্ধু উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরই তাদের প্রকৃত নিবাস। এইসব অঞ্চলে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। সে-সব নিদর্শন নিয়ে এখনও গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।

দ্রাবিড়রা সিন্ধু উপত্যকা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করে। সেখানে তারা ভাষাগত দিক থেকে চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভাষাগুলো হলো— কন্নড়, মালয়ালম, তেলেগু ও তামিল। এরাই আর্যদের সঙ্গে শত শত বছর পর্যন্ত সংগ্রাম করে অবশেষে পরাভূত হয়েছে। কেননা, আর্যরা শক্তিমত্তা, উন্নত সভ্যতা ও যুদ্ধবিদ্যায় দ্রাবিড়দের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। দুই জাতির মাঝে সংঘটিত এসব যুদ্ধে আর্যরা নানা প্রকার লৌহজাত অস্ত্র ব্যবহার করে। অপরদিকে দ্রাবিড়দের হাতিয়ার ছিল স্রেফ অস্থি, কাঠ ও পাথর নির্মিত।

এই যুগে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে নিয়ে গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর আবির্ভাবের আগপর্যন্ত সময়ে আমরা এ অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ দেখতে পাই। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল প্রথমত হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে। অতঃপর আর্য ও দ্রাবিড়দের মধ্যে।

এই যুদ্ধগুলো শুধু রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এগুলো বিরাজমান ছিল সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের ময়দানেও। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এই যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল। শেষাবধি আর্যদের বিজয়ের মাধ্যমে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এখানকার মূল অধিবাসীরা তাদের অধীন হয়ে পড়ে। অতঃপর আর্যরা তাদের জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন করতে শুরু করে। তারা মূল অধিবাসীদেরকে বৈদিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তারা ভারতবর্ষের অধিবাসীদেরকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করে।

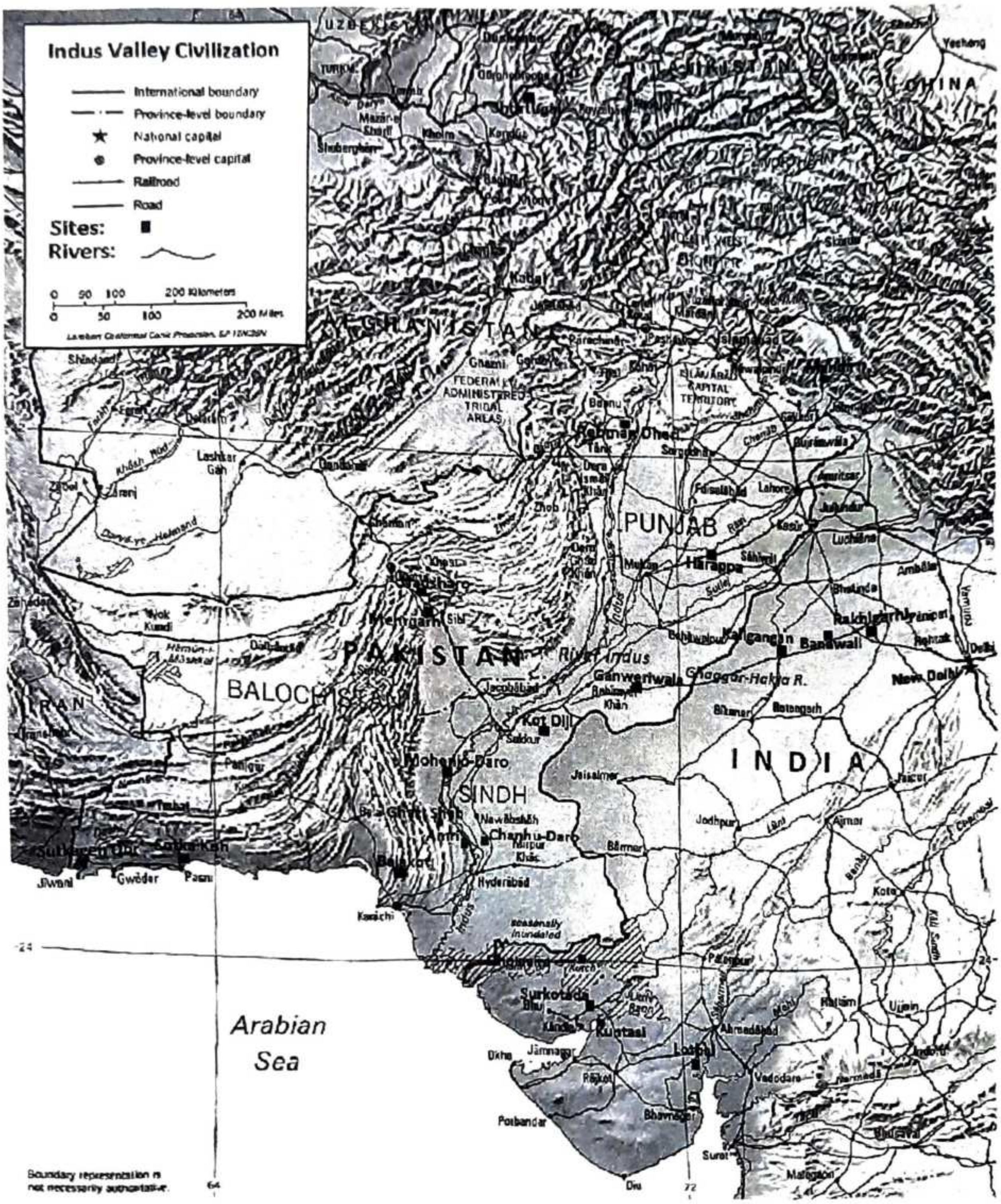
প্রথম শ্রেণি : ব্রাহ্মণ। এরাই মূল আর্য সম্প্রদায়।

দ্বিতীয় শ্রেণি : ক্ষত্রিয়। এরা যোদ্ধা শ্রেণি। এরা মূলত রাজপুত ঘরানার। তবে তুলনামূলক বিশুদ্ধ মতটি হলো—এরাও আর্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাসের সূচনালগ্নে যেসব রাজা ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন, এরা তাদের বংশধর।

তৃতীয় শ্রেণি : বৈশ্য। এরা তুরানি ও কোল সম্প্রদায়ের লোকজন। যারা পরবর্তী সময়ে দ্রাবিড় নামে পরিচিতি লাভ করে।

চতুর্থ শ্রেণি : শূদ্র। এরা দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের ওইসব লোক, যারা আর্যদের বশ্যতা মেনে নেয়নি এবং তাদের সঙ্গে বৈদিক সমাজে একীভূত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফলে তারা আর্যদের দাসশ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। আমরা পরে এ শ্রেণিগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

আর্যরা এই শ্রেণি-বিভাজন, প্রাকৃতিক শক্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ, উপাসনার নানান পদ্ধতি ও ধর্মগীতি উদ্ভাবনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে গৌতম বুদ্ধের আগমন। তিনি এসে আর্যদের মতবিশ্বাস, আচার-প্রথা এবং মানবজাতিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভাজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।



ইন্দুস ভ্যালি সভ্যতার মানচিত্র। মহেঞ্জোদারো ছিল এই সভ্যতারই একটি সমৃদ্ধ শহর

আর্যদের ভারতবর্ষে আগমন

সংস্কৃত ভাষায় আর্য শব্দটির অর্থ হলো অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত। এরা সাদা চামড়া ও কালো চুলের অধিকারী জাতি। তাদের ভাষা সংস্কৃত। পরবর্তীকালে আর্য শব্দটি এমন একটি জাতির জন্য ব্যবহৃত হয়, যাদের আদি উৎস সঠিকভাবে জানা যায় না। কোনো কোনো গবেষকের ভাষ্য হলো, তারা ইউরোপের দানিয়ুব অঞ্চলে বেড়ে ওঠা জনগোষ্ঠী। পরবর্তীকালে স্থান সংকুলান না হওয়ায় তারা এশিয়ায় আবাস পরিবর্তন করে। আধুনিক গবেষণা বলছে, তাদের রং অনেকটা সোনালি রঙের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটি তাদের দেবতা ইন্দ্রের কাঙ্ক্ষিত বর্ণ। যেমন ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় তাদের দেবতা রুদ্রের বর্ণ হলো সোনালি।'

ঋগ্বেদের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'একজন পূজারি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো, যাতে ঈশ্বর তাকে সোনালি বর্ণের সন্তান দান করেন।' এই সাদৃশ্যের কারণে গবেষকগণ দাবি করেছেন যে, আর্যরা মূলত ইউরোপিয়ান জাতি। ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে বেশ কিছু মাথার খুলি পাওয়া গেছে, যেগুলো অনেকাংশে আর্যদের খুলির সঙ্গে মিলে যায়। তাই তারা বলেন, আর্যরা জীবিকা অন্বেষণের নিমিত্তে দানিয়ুব নদী পাড়ি দেয়। অতঃপর বসফরাস, ইরান ও আফগানিস্তান হয়ে সিন্ধুতে এসে পৌঁছায়। এই দীর্ঘ সফরে পাড়ি দেওয়া অঞ্চলগুলোতে তারা তাদের একটি দলকে রেখে আসে। এসব দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের কোনো সংঘর্ষ না হলেও সিন্ধুর অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের দীর্ঘ সময়ব্যাপী যুদ্ধ হয়। প্রায় এক হাজার বছর ধরে এসব যুদ্ধ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সিন্ধুর অধিবাসীরা আত্মসমর্পণ করে। আবার অনেকে বনজঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যায়। আবার তাদের আরেকটি দল দেশত্যাগ করে উত্তর ভারতে দিকে চলে যায়। সেখানে তারা বৈদিক সমাজের সঙ্গে একীভূত হয়। অবশিষ্টরা আর্যদের দাসে পরিণত হয়। এদেরকেই তারা দ্রাবিড় নামে নামকরণ করে।

গোস্তাভ লি বোন মনে করেন, তাদের দেশত্যাগের দুটি পথ খোলা ছিল।

এক : ইউরোপ অভিমুখী পথ।

দুই : ইরান অভিমুখী পথ।

আবার আরেক দল গবেষক মনে করেন, আর্যরা জাতিগতভাবে এশিয়ান। তারা মধ্য-এশিয়ায় তুর্কিস্তানের জিহুন নদীর কাছে বসবাস করতো। অতঃপর কোনো এক অজানা সময় এদের বিশাল বিশাল শ্রেণিগোত্র বসবাসের স্থান ত্যাগ করে। তাদের একদল ইউরোপ অভিমুখে পাড়ি জমায়। আরেক দল ইরান হয়ে ভারতবর্ষে আগমন করে। তবে গোস্তাব লি বোন মনে করেন, আর্যরা মূলত ইরানেরই অধিবাসী। তিনি তার 'হাদারাতুল

হিন্দু'[২] গ্রন্থে বলেন, 'আমি এখানে আর্যদের আদি উৎস বিষয়ে নতুন কোনো ধারণার প্রস্তাব করছি না। বরং আমি উল্লেখ করছি সম্ভাব্য তুলনামূলক সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয়টি। আর তা হলো, আর্যরা মূলত ইরানের অধিবাসী আর ভারতবর্ষে তাদের প্রতিবেশীরা সেখানে সন্দেহাতীতভাবে দফায় দফায় অনুপ্রবেশ করেছে। একইভাবে তাদের পূর্বপুরুষরা ইতিপূর্বে ইউরোপে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। প্রচলিত মতের বিপরীতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, বিজিত জাতিগুলোতে তাদের রক্তের প্রভাব ছিল খুবই দুর্বল।'

আর্যদের পারসিক হওয়ার সপক্ষে আমি একটি ভাষাগত প্রমাণও উপস্থাপন করছি। আর তা হলো—সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শব্দ ও অর্থগত দিক থেকে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইতিহাসে এ কথার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, ভারতীয়রা পারস্য গিয়ে তাদের বিভিন্ন শব্দ ধারণ করেছে। তাই ভাষাবিদগণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, সংস্কৃত ভাষাভাষী তথা আর্য ও পারসিকগণ একই অঞ্চলের অধিবাসী।

পাঠক সমীপে এ পর্যায়ে আমরা এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু শব্দ ও তার অর্থ তুলে ধরছি।[৩]

ফারসি	সংস্কৃত	বাংলা
আঙ্কুশত	আঙ্কুশত	আঙুল
বাজু	বাহু	বাহু
দস্ত	হস্ত	হাত
জিরম	জিরম	চামড়া
যানু	জানু	ঊরু
নর	নর	পুং
পায়	পাও	পা
খুন	শোণ	রক্ত
সের	সের	মাথা

[২] হাদারাতুল হিন্দ, পৃষ্ঠা : ২৬০

[৩] লেখক মূল গ্রন্থে শব্দগুলোর আরবি অর্থ তুলে ধরেছেন। আমরা পাঠকের সুবিধার্থে শুধু বাংলা অর্থ তুলে ধরলাম।-অনুবাদক

আব্রু	আভ্রু	ভ্রু
কাদ্দু (গুল)	গুল কাদ্দু	ফুল
খোয়াব	শোয়াব	ঘুম
শব	শবা	রাত
পেদর	পেতর	পিতা
মাদর	মাতর	মাতা
বেরাদর	ভ্রাদর	ভ্রাতা
দুখতর	দুহ্তর	কন্যা
খেসর	শ্বশুর	শ্বশুর
রোম	রোম	লোম
পঞ্জ	পঞ্জ	পাঁচ
পঞ্জুম	পঞ্জুম	পঞ্চম
হাফত	সপ্তম	সপ্তম
শশুম	ষষ্ঠম	ষষ্ঠ
নহুম	নবম	নবম
দাহুম	দশম	দশম
এক	এক	এক
তারা	তারা	তারা
হুর	সূর্য	সূর্য
মাহ	মাস	মাস
রোজ	রোজ	দিন
শাম	শাম	সন্ধ্যা
মাহর	মাহর	সূর্য

হাওয়া	বায়ু	বাতাস
সরদ	সর্দি	ঠান্ডা
আব	আব	পানি
তিষ্ণা	তৃষ্ণা	তৃষ্ণা
সিয়াহ	শিয়াম	কালো
ছায়া	ছায়া	ছায়া
দেওয়া	দেওয়ার	দেওয়াল
জঙ্গল	জঙ্গল	জঙ্গল
নাম	নাম	নাম
জাল	জাল	জাল
আর্জ	আরজ	মূল্য
শির	কুশির	দুধ
গাও	গাও	গোরু
খর	খর	গাধা
শাখ	শাখা	শাখা

ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার এই কয়েকটি শব্দ আমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ পেশ করলাম। এগুলো আমি আকবর শাহ খান কর্তৃক রচিত 'বেদ ওয়া মাসআলাতু কিদামিহি' তথা 'বেদ ও তার প্রাচীনত্ব' নামক গ্রন্থ থেকে চয়ন করেছি।

লেখক বলেন, এমন শব্দের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এমনকি কয়েক হাজার বললেও অত্যুক্তি হবে না। আমি এখানে উভয় ভাষার মাঝে তুলনার স্বার্থে একশ শব্দের একটি তালিকা উল্লেখ করলাম। সংস্কৃত ভাষা ফারসি ভাষা থেকে উৎসারিত প্রমাণের জন্য এই তালিকাটিই যথেষ্ট।[৪]

এছাড়া এটি এ কথার প্রমাণও বহন করে যে, সংস্কৃত ভাষাভাষীরাই হলো আর্য, যারা মূলত পারস্যের অধিবাসী।

[৪] আমিও এখানে সংক্ষিপ্ত করেছি। মাত্র ঊনপঞ্চাশটি শব্দ উল্লেখ করেছি।

অভিনাশ চন্দ্র, স্বামী শংকরানন্দ, রায় বাহাদুর বর্মা প্রসাদের মতো আধুনিক হিন্দু পণ্ডিতবর্গ এবং জার্মান বিজ্ঞানী গোরে দাবি করেন—আর্যরা অন্য কোনো দেশ থেকে এসে এখানে থিতু হয়নি। বরং তারাই ভারতবর্ষের প্রকৃত বাসিন্দা। মূলত তারা মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে এই দাবিটি পেশ করে থাকেন। তবে তুলনামূলক বিশুদ্ধ মতটি হলো, আর্যরা জাতিগতভাবে মূলত ইউরোপিয়ান। কেননা, গাত্রবর্ণ ও আকৃতির দিক থেকে ভারতীয়দের চেয়ে ইউরোপিয়ানদের সঙ্গেই তাদের বেশি মিল পাওয়া যায়। [৫]

উইচ (WEECH) বলেন, আমরা দেখতে পাই পাঞ্জাবের অধিবাসীরা দীর্ঘকায়, সাদাটে চামড়া ও তীক্ষ্ণ মুখাবয়বের হয়ে থাকে। শারীরিক এই বৈশিষ্ট্যটি অবশিষ্ট ভারতীয়দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তুরান কিংবা দক্ষিণ ভারত যেখানে মূল ভারতীয়দের দেখা যায়, সবখানেই এই ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া আর্যগণ যতই দক্ষিণ কিংবা পশ্চিমে গিয়েছে, তাদের এই বৈশিষ্ট্য ততই হ্রাস পেয়েছে। তাই তো হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও অদ্যাবধি দ্রাবিড়গণ আর্যদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে যাচ্ছে। এই হিংসাত্মক মনোভাব মূলত তাদের পৈতৃক তথা রক্তসূত্রে পাওয়া। যদি আর্যগণ ভারতের মূল জনগোষ্ঠী হতো, তাহলে এমনটা কখনোই ঘটতো না।

ভারতীয়দের হিন্দু সমাজে একীভূত হওয়া

আর্যগণ ভারত জয় করে। পুরো ভারত তাদের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। অতঃপর তারা তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন করতে শুরু করে এবং এরই মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ভারতীয়দেরকে তাদের মতাদর্শে একীভূত করার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে।

নতুন চিন্তাধারার আগ্রাসন

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে গ্রিস, মিসর, ব্যাবিলন ও চীন প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ভারতে নতুন নতুন আদর্শ ও চিন্তাধারার আগমন ঘটতে থাকে। এসব আদর্শ ও চিন্তাধারার সঙ্গে বেদের শিক্ষা ও চিন্তাধারার সংঘর্ষ বাধে। এ সময় আর্য পণ্ডিতগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল এই নতুন ঔপনিবেশবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হন। আরেক দল এই নতুন চিন্তাধারার আলোকে বেদের আদর্শ ও চিন্তাধারাকে পরিমার্জন ও সংশোধন করতে শুরু করেন। ফলে হিন্দুধর্ম দার্শনিকতার পথে হাঁটতে শুরু করে। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। এ সময়ে হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ তথা 'উপনিষদ' ও 'ভগবদ্গীতা' রচিত হয়।

---

[৫] প্রাচ্যবিদ ব্রোঞ্জ দাবি করেছেন, উৎসগত দিক থেকে সংস্কৃত ভাষা ইউরোপিয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা

ইতিহাসের কোথাও হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুনির্দিষ্ট কারও নাম পাওয়া যায় না। বিষয়টি ভারতীয় অন্যান্য ধর্মের ব্যতিক্রম। যেমন বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ। জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর স্বামী। শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক।

ড. রাধা কৃষ্ণণ[৬] বলেন, হিন্দুধর্ম নির্দিষ্ট কোনো জাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বরং এটি বিভিন্ন জাতিসত্তার অভিজ্ঞতার ফসল। কালপরিক্রমায় যা হিন্দু চিন্তাধারা গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

হিন্দুধর্মে বিশ্বাসের জটিলতা

সন্দেহ নেই যে, অতীত ও বর্তমানের প্রতিটি জাতির নিজস্ব কিছু মৌলিক বিশ্বাস থাকে। এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে সে জাতি অগ্রসর হয় এবং তাদের ব্যক্তি বা সামষ্টিক পর্যায়ের নানা সমস্যার সমাধান করে। এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একজন গবেষক যেকোনো দল, সংগঠন কিংবা পক্ষের আকিদা-বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণার মাধ্যমেই তাদের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। যখন কোনো সংগঠন কিংবা ধর্মের কোনো কেন্দ্রীয় আকিদা-বিশ্বাস না থাকে, তখন তাদেরকে আত্মাবিহীন দেহের সঙ্গেই তুলনা দেওয়া যায়। তাই কেন্দ্রীয় কোনো মৌলিক বিশ্বাস না থাকাটাকেই হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

হিন্দু পণ্ডিতগণ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন। শুধু তাই নয়, তারা এটি নিয়ে গর্বও করে থাকেন। ভারতীয় নেতা করমচাঁদ গান্ধী[৭] বলেন, হিন্দুধর্মের সৌভাগ্য যে, এতে কোনো মৌলিক মতবিশ্বাস নেই। যদি আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে আমি বলবো, এই ধর্মের মতবিশ্বাস হলো গোঁড়ামি পরিহার করে বিভিন্ন পন্থায় সত্যকে তালাশ করা। আর সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব উভয় বিশ্বাসই এখানে সমান। কোনো হিন্দুর জন্য সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন জরুরি নয়। হিন্দু হিন্দুই থাকবে, সে বিশ্বাস স্থাপন করুক বা না করুক।

---

[৬] ড. রাধা কৃষ্ণণ একজন আধুনিক হিন্দু দার্শনিক। তিনি ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি ভারতের নেতৃত্বে আসেন। ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে তার রচনাবলির সংখ্যা দেড় শতাধিক। তিনি কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচক ছিলেন।

[৭] মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধী ছিলেন একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা। অহিংস আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি সর্বমহলে পরিচিত। তিনি বাপুজি, গান্ধীজি প্রভৃতি নামেও ব্যাপক সুপরিচিত। -অনুবাদক

তার লিখিত গ্রন্থ হিন্দুধর্ম (HINDU DHARM)-তে তিনি আরো বলেন, হিন্দুধর্মের সৌভাগ্য যে, এটি সকল আকিদা-বিশ্বাস থেকে মুক্ত। তবে এটি অন্যান্য ধর্মের আকিদা-বিশ্বাস ও বাহ্যিক আচার-আচরণ বেষ্টিত। এ কারণেই আমরা হিন্দু পণ্ডিতদের নতুন কিছু সামনে এলেই তাকে পবিত্র জ্ঞান করতে দেখি। তারা মনে করেন, এটাই তাদের আকাঙ্ক্ষিত ও উদ্দিষ্ট। তারা সকল সংস্কারককে আসমান থেকে নেমে আসা প্রেরিত ঈশ্বরের দূত হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন এবং মনে করেন, তারা মানবাকৃতির ঈশ্বর। এমনকি এই সংস্কারক যদি তাদের কোনো কোনো বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও অবস্থান নেন এবং সুস্পষ্টভাবে নিজের হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম কিংবা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের ঘোষণা না দেন, তাহলে শুধু হিন্দু পরিমণ্ডলে বসবাসের কারণে তিনি হিন্দু বলেই বিবেচিত হবেন। এর কারণ হলো, হিন্দুধর্মে এমন কোনো মাপকাঠি নেই, যা দ্বারা তাদের ধর্মীয় বিষয়াবলিকে পরিমাপ করা যায়। সুতরাং হিন্দুধর্মের প্রতি সম্পৃক্ত ব্যক্তি অনন্তকাল অবধি হিন্দুই থেকে যাবে।

সুতরাং সঠিকভাবে যদি একজন হিন্দুকে সংজ্ঞায়িত করতে হয়, তাহলে বলতে হবে, 'হিন্দু হলো ওই ব্যক্তি, যে হিন্দু পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে তার আচারপ্রথা, রীতিনীতি ও উপাসনা-পদ্ধতি যাই হোক না কেন।' সম্ভবত খ্রিষ্টানদের বিরাট অংশ হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েই খ্রিষ্টধর্মীয় আচার-প্রথা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিয়েছে।

হিন্দুধর্মের নাম

মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস থেকে মুক্ত হওয়ায় হিন্দুধর্ম এত বেশি পরিবর্তন ও বিকৃতির শিকার হয়েছে, যা কল্পনাও করা যায় না। এমনকি ধর্মটি তার মূল নামটি পর্যন্ত হারিয়ে বসেছে। ধর্মটির প্রকৃত নাম ছিল বৈদিক ধর্ম অথবা আর্য ধর্ম। অথচ এটিকে হিন্দুধর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়, যার কোনো ভিত্তি সংস্কৃত ভাষায় পাওয়াই যায় না। এই শব্দটি সম্পূর্ণ নবসৃষ্টি। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতে এ নামের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।[৮] অতীতে ভারতের অধিবাসীদের ধর্মকে আর্যধর্ম (ARYA DHARM) অথবা সনাতনধর্ম (SANATAN DHARM) নামে অভিহিত করা হতো। সনাতন ধর্ম হলো প্রাচীন ধর্ম।

হিন্দু শব্দটি সিন্ধু থেকে নির্গত। কেননা, পারসিক ও গ্রিকরা সিন্ধুনদের তীরে পরিভ্রমণ করতো। তারাই 'স' বর্ণকে 'হ' বর্ণে পরিবর্তন করে হিন্দু বলা শুরু করে। তার সঙ্গে

[৮] *হিন্দু ধর্মকোষ*, পৃষ্ঠা : ৭০২।

‘স্তান’ যুক্ত হয়ে এ অঞ্চলের নাম দাঁড়িয়েছে হিন্দুস্তান তথা ভারতবর্ষ অর্থাৎ হিন্দ অঞ্চলের অধিবাসীদের বাসস্থান। এখানকার অধিবাসীদের বলা হয় হিন্দু। আর তাদের দিকে সম্বন্ধ করে তাদের পালিত ধর্মাচারকে বলা হয় হিন্দুধর্ম।

আর ইংরেজরা ‘হ’ বর্ণটিকে ‘ই’ (I) দ্বারা বদলে দিয়েছে। ফলে শব্দটি ‘IND’ রূপধারণ করেছে। এবং শেষে সম্বন্ধপদ হিসেবে ‘IA’ যুক্ত করেছে; সব মিলিয়ে শব্দটি ইন্ডিয়া (INDIA) হয়েছে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের সংকলনের পর্যায়সমূহ

আর্যগণ ভারতে এসে এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। এই সময় তাদের পণ্ডিতগণের একটি দল লেখালেখি ও সংকলনের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। হিন্দুধর্মের মৌলিক গ্রন্থাবলি রচনার এই ধারাবাহিকতা প্রায় হাজার বছর যাবৎ চলতে থাকে। পাঠক সমীপে আমরা এখন এই সময়ে রচিত গ্রন্থাবলির বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পর্যায়

এসব পণ্ডিতবর্গ প্রথম চতুর্বেদের[৯] সংকলন পরিপূর্ণ করেন। বেদ সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ হলো জ্ঞান।

দ্বিতীয় পর্যায়

হিন্দু দার্শনিক তথা ঋষিগণের যুগ। হিন্দু দার্শনিকদের একটি দল উপনিষদ রচনা করতে শুরু করে। প্রকৃত অর্থে উপনিষদ হলো, বেদের দর্শনের সার নির্যাস। উপনিষদ হলো অধ্যাত্মবাদের মূলনীতি, যেখানে মানবাত্মা ইহলোকের বন্ধন ত্যাগ করে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রফেসর রয়েচ (ROYEC) বলেন, অধ্যাত্মবাদের সকল বিধান এই গ্রন্থগুলোতে সন্নিবেশিত হয়েছে। একইভাবে উপনিষদ আর্যদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

---

[৯] বেদ চতুষ্টয় হলো : ঋগবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। বেদগ্রন্থগুলোর বিশদ বিবরণ সামনে আসবে।

তৃতীয় পর্যায়

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের যুগ। তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য শাস্ত্রীয় বিধানাবলি তথা পবিত্রতা, উপাসনা, লেনদেন, পারস্পরিক সম্পর্ক, বিবাহ বন্ধন বা বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ের নীতিমালা সংকলন করেন।

এসব বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ নির্ভর করেন ঋষি, তপস্বী ও পূজারিদের মাঝে প্রচলিত মৌখিক বর্ণনা। তাদের প্রচেষ্টায় স্মৃতিগ্রন্থগুলোর প্রকাশ ঘটে। এ ধরনের গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশোর্ধ। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা।

চতুর্থ পর্যায়

ভারতীয় ও আর্যদের মিশ্রণ পরবর্তী যুগ। এ সময় আর্য দেবতাগণ অন্তরালে চলে যান। এই দেবতাগণ হলেন—

ইন্দ্র : বজ্র, বৃষ্টি ও নদীপ্রবাহের দেবতা।

অগ্নি : অগ্নিদেবতা।

বরুণ : আকাশের দেবতা।

উষা : প্রভাতের দেবতা।

এরপর ভারতীয় দেবতাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা হলেন—

বিষ্ণু : রুজি-রোজগারের দেবতা।

শিব : প্রলয় ও ধ্বংসের দেবতা।

এখান থেকেই নতুন দেবতাদের প্রশংসা ও কীর্তনের জন্য রচনা করা শুরু হয়। অতঃপর 'পুরাণ' (MYTHOLOGY) গ্রন্থগুলো লেখা হয়। পুরাণ শব্দের অর্থ হলো প্রাচীন কাহিনি ও ঘটনাবলি। এই গ্রন্থগুলোতে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো—সৃষ্টি, বিনাশ, দুই মনুর[১০] মধ্যবর্তী সময়কাল প্রভৃতি। এখান থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে, জগতের দুইবার বিনাশের মধ্যবর্তী সময়কাল। কেননা, (হিন্দুদের মতে) লক্ষ লক্ষ বার এই বিশ্বের বিনাশ হয়েছে এবং পুনরায় সৃষ্টি হয়েছে। পুরো

---

[১০] মনু: হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি মতে, ব্রহ্মার মন থেকে উদ্ভূত। মনু {√মন্ (মনে ধারণ করা) + উ, কর্তৃবাচ্য}, এই অর্থে ইনি মনু হিসেবে পরিচিত। হিন্দুধর্ম মতে, প্রায় চার হাজার যুগে ব্রহ্মার একদিন। চার হাজার বছরে হয় এক কল্প। এই রূপ একদিনে বা এক কল্পে ১৪ জন মনু জন্মগ্রহণ করেন। এক এক মনুর অধিকারে থাকা সময়কে মনন্তর বলা হয়।-অনুবাদক

প্রক্রিয়াটি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে। তাদের ধর্মবিশ্বাস মতে এটি একটি অনন্ত ও অবিনশ্বর প্রক্রিয়া।

পঞ্চম পর্যায়

যুদ্ধবিগ্রহ ও মহাকাব্য রচনার যুগ। এসব গ্রন্থে আর্য নেতাদের ধ্বংসাত্মক প্রলয়ংকারী যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসব যুদ্ধ আর্যগণ তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেছিলেন এবং শেষে তারা বিজয় লাভ করেছেন। এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে মহাভারত, গীতা ও রামায়ণ। এই গ্রন্থগুলো তাদের জাতীয় গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে। হিন্দু সমাজে এগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই গ্রন্থগুলো সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

হিন্দুধর্মের মৌলিক ধর্মীয় উৎস সম্পর্কে পর্যালোচনা

হিন্দুরা যেহেতু সুনির্দিষ্ট কোনো আকিদা-বিশ্বাসের গণ্ডিতে আবদ্ধ না, তাই তাদের জন্য ঈশ্বরের পাশাপাশি আরও বহু উপাস্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে কোনো সমস্যা হয় না। চাই সে উপাস্য প্রাকৃতিক কোনো শক্তি কিংবা অন্য কিছু হোক না কেন। আর তাই ধর্মীয় মৌলিক উৎস বিবেচনা করতে গিয়েও তারা বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীরই নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। তবে অন্যরাও এগুলোকে মর্যাদা ও সম্মানের চোখে দেখে। তাই আমি এই বিশেষ গ্রন্থগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আলোচনা করিনি। যে গ্রন্থ কোনো না কোনো দেব-দেবতার গুণকীর্তনে রচিত হয়েছে এবং সেই দেব কিংবা দেবীর জন্য পূজা-অর্চনার কথা বলে, সেটিই তাদের কাছ পবিত্র বলে বিবেচিত হয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মগ্রন্থ সংকলন আলোচনায় যে সব গ্রন্থের নাম এসেছে, সে সব গ্রন্থের কিছুটা বিশদ আলোচনা আমরা পাঠক সমীপে তুলে ধরছি।

এক. বেদ (VEDA)

বেদ শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান। প্রাচীনকালে শব্দটি হিন্দুধর্মীয় সকল গ্রন্থ তথা সংহিতা[১১], ব্রাহ্মণ[১২], আরণ্যক[১৩] ও উপনিষদ[১৪] সবগুলোর জন্যই ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে শব্দটি চারটি গ্রন্থের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। এই চারটি গ্রন্থ হলো—

---

[১১] মন্ত্র ও আশীর্বচন।-অনুবাদক

[১২] ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদির ওপর টীকা।-অনুবাদক

[১৩] ধর্মীয় আচার, ক্রিয়াকর্ম, যজ্ঞ ও ব্রতাকা যজ্ঞ।-অনুবাদক

১. ঋগবেদ।

২. যজুর্বেদ।

৩. সামবেদ।

৪. অথর্ববেদ।

হিন্দুধর্মে বেদকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ বিবেচনা করা হয়। জনসাধারণের কাছে এটি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। বেদ অধ্যায়-পরিচ্ছদ সংবলিত কোনো গ্রন্থ নয়। এটি খ্রিষ্টপূর্ব অজানা সময়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুনি-ঋষিগণের শিক্ষার সমষ্টি। বেদ শব্দটি বিদ্ ধাতু থেকে নির্গত। এটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। হিন্দু ঋষিগণ বিক্ষিপ্ত শিক্ষাধারার প্রতি আগ্রহী হন। তারা নিজেদের অর্জিত জ্ঞান বা বিদ্যাবত্তা তাদের শিষ্যগণের মাধ্যমে লোহার ফলক ও চামড়ায় লিপিবদ্ধ করিয়ে নিতেন। বেদের শিক্ষা যারা মুখস্থ করতেন, তাদেরকে শাস্ত্রী (SHASTRY) বলা হয়।

হিন্দুরা দাবি করে থাকে যে, জগতের মতো বেদও শাশ্বত ও অবিনশ্বর। মনু নামক এক ব্যক্তির প্রতি এটি দৈবভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দু পণ্ডিত বিহারিলাল বর্মা বলেন, বেদ একক কোনো গ্রন্থের নাম নয়; বরং এটি হিন্দু ঋষিগণের চিন্তাধারার সমষ্টি। বেদ অর্থ হলো জ্ঞানার্জন করা অর্থাৎ বেদসমূহে আধ্যাত্মিক নানা জ্ঞান স্থান পেয়েছে। এতে রয়েছে পূজার জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শ্লোক।

হিন্দু দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা ঋগ্বেদের ব্যাখ্যার ভূমিকায় বলেন, এই গ্রন্থটি তিন শতাধিক ঋষির চিন্তাধারার সমষ্টি।

বেদ দুভাগে বিভক্ত : এক, সংহিতা অর্থাৎ মূলপাঠ। দুই, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্যাখ্যা।

হিন্দু পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ মনে করেন, প্রথম প্রকার ঐশ্বরিক আর দ্বিতীয় প্রকার ঐশ্বরিক নয়।

আবার অনেকে বেদকে তিন ভাগে ভাগ করে থাকেন। তাদের মতে, উপরের দুটি ভাগের পাশাপাশি তৃতীয় ভাগটি হলো আরণ্যক (ARNICK)। এই অংশে সংসারত্যাগী তপস্বীগণের শিক্ষা এবং পরবর্তীকালে তাদের শিক্ষা থেকে সংগৃহীত উপনিষদ নামে পরিচিত পবিত্র পুস্তকাবলি স্থান পেয়েছে। এই পবিত্র পুস্তকাবলির সংখ্যা ১০৮টি। তবে শংকরাচার্যের[১৫] বক্তব্য অনুযায়ী এসব পুস্তকের মধ্যে হিন্দুদের কাছে গ্রহণীয় পুস্তক হলো মাত্র ১৬টি।

---

[১৪] ধ্যান, দর্শন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সংক্রান্ত আলোচনা।-অনুবাদক

[১৫] শংকরাচার্য ৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মালাবারে জন্মগ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে তিনি ঋষিগণের জীবনযাপন অবলম্বন করেন। এবং ৩২ বছর বয়সে মারা যান। হিন্দুগণ বলে থাকেন শংকরাচার্য ছিলেন হিন্দুধর্মের ইতিহাসে সবচেয়ে কনিষ্ঠ নেতা। তিনি প্রথম হিন্দুধর্মে অদ্বৈতবাদের ডাক দেন। তার এই দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি বেদ থেকে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। স্বীয় দর্শন ও চিন্তাধারা প্রচারের স্বার্থে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলো মঠ (MATH) নামে পরিচিত। প্রতিটি মঠে একজন করে পুরোহিত থাকেন, যাকে 'শংকরাচার্য' উপাধি প্রদান করা হয়। হিন্দু পুরোহিতদের জন্য এটি সর্বোচ্চ উপাধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তবে সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো, কিছু কিছু আরণ্যক বুদ্ধ-পরবর্তী যুগে রচিত হয়েছে। হিন্দু পণ্ডিত ধর্মানন্দ কোসাম্বি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আলহাদারাতুল হিন্দিয়া* তথা ভারতীয় সভ্যতাতে এই দাবি করেছেন। তার এই বক্তব্য এ কথাকে আরও পাকাপোক্ত করে যে, হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থগুলো অদ্যাবধি ইতিহাসের অন্ধকারেই রয়ে গেছে।

আমরা বেদ সম্পর্কিত আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসছি।

বেদ সর্বমোট চারটি গ্রন্থের সমষ্টি। গ্রন্থগুলো হলো—

ক. ঋগবেদ (RIG VEDA)।

ঋকের অর্থ হলো প্রার্থনা, স্তোত্র ও স্তুতি প্রভৃতি। আর বেদ অর্থ হলো জ্ঞান। বলা হয়ে থাকে, এটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মৌলিক গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে অধিক ও ব্যাপক। হিন্দু পণ্ডিতগণ দাবি করে থাকেন, ঋগবেদ পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ। তথাপি তারা এর রচনার সময়কাল নির্ধারণে মতবিরোধ করে থাকেন। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের মতে এটি ১৫০০-১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব সময়কালে রচিত হয়েছে।

পশ্চিমা গবেষক মন্টের্টন বলেন, এটি প্রায় ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব সময়কালে রচিত হয়েছে। এই সময়কালটি হিন্দু পণ্ডিতগণের দাবিকৃত সময়ের কাছাকাছি। তবে তিনি হিন্দুদের দাবি অনুযায়ী এটি পৃথিবীর মতো প্রাচীন হওয়াটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

গ্রন্থটিতে ১০টি মণ্ডল (খণ্ড), ৬৪টি অধ্যায়, ১০১৭টি সূক্ত (স্তোত্র) এবং ১০৫৫২টি মন্ত্র রয়েছে। ঋগবেদে উল্লিখিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দেবতা হলেন অগ্নি। ইনি আগুনের দেবতা। এর কারণ হলো, বেদ সংকলক মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস পারসিক নেতা জরাথ্রুষ্টের সামসময়িক ছিলেন। জরাথ্রুষ্ট মানুষকে অগ্নিপূজার দিকে আহ্বান করতেন। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন যে, বেদব্যাস এই নতুন নেতার সঙ্গে আলোচনার জন্য পারস্যে ভ্রমণ করেছেন। সেখানে তিনি জরাথ্রুষ্টের মতবাদ ও দাওয়াতে প্রভাবিত হন। ফলে হিন্দুস্তানে তিনি জরাথ্রুষ্টীয় চিন্তাচেতনা নিয়ে ফিরে আসেন এবং সেই চিন্তা ও মতবাদ থেকে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ বেদে প্রবিষ্ট করেন।

ঋগ্বেদের ব্যাখ্যাকারক পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা তার ভূমিকাতে ঋগবেদে উল্লিখিত দেবতাগণের নামের একটি তালিকা প্রদান করেছেন। এসব দেবতার সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক। তন্মধ্যে কয়েকজন দেবতার নাম নিম্নরূপ—

অগ্নি : আগুনের দেবতা।

বায়ু : বাতাসের দেবতা।

ইন্দ্র : বজ্রপাতের দেবতা।

বরুণ : আকাশের দেবতা।

সূর্য : সূর্য দেবতা।

উষা : প্রভাতের দেবতা।

জ্ঞান : জ্ঞানের দেবতা।

কাম : প্রবৃত্তি তথা কামনা-বাসনার দেবতা।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, হিন্দুরা প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। একইভাবে তারা অঞ্চল অনুযায়ী দেবতাগণকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এসব দেবদেবী তাদেরকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী করে দেবে। এটি ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগের অবস্থার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়।

এই হলো ঋগ্বেদের হাকিকত। এই ঋগবেদই হলো হিন্দুধর্মের প্রধান গ্রন্থ। হিন্দুরা এই গ্রন্থকে পবিত্রজ্ঞান করে সম্মানের চোখে দেখে। এর শ্লোক আবৃত্তি করে। সকাল-সন্ধ্যায় পূজা-অর্চনায় এর পঙ্‌ক্তিগুলো আওড়ায়। বিবাহ অনুষ্ঠানে এগুলো পাঠ করে মঙ্গল কামনা করে। মৃতদেহ পোড়ানোর সময় এগুলো পাঠ করে থাকে।

খ. যজুর্বেদ[১৬] (YAJUR VEDA)।

এই গ্রন্থটিতে যজ্ঞদানের নিয়মকানুন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আকৃতিতে এটি ঋগ্বেদের দুই তৃতীয়াংশের সমান। এটি গল্পাকারে লিখিত। এতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রদানের শিক্ষা রয়েছে। অনেক হিন্দু পণ্ডিত যজুর্বেদকে পবিত্র বেদের অন্তর্ভুক্তা হিসেবে গণ্য করেন না।

গ. সামবেদ (SAM VEDA)।

সাম অর্থ নিরাপত্তা ও সুখ। এতে ১৮১০টি শ্লোক রয়েছে। ৫৭টি শ্লোক ব্যতীত সবগুলো শ্লোকই ঋগবেদে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পূজা-অর্চনা ও দেবতাদের কাছে পরিত্রাণ কামনা করার সময় হিন্দুরা এগুলো সুর দিয়ে পাঠ করে থাকে। ভারতে প্রচলিত গানের সপ্তসুরের উৎপত্তি এই প্রাচীন গ্রন্থ থেকে।

তাদের কোনো কোনো পণ্ডিত বলে থাকেন : ভারতীয় গানের সম্প্রসারণে সামবেদ কোনো দিক থেকেই ঋগ্বেদের চেয়ে কম গুরুত্বের নয়।

---

[১৬] যজুর্বেদ গদ্যমন্ত্রসমূহের বেদ। এটি যজুস ও বেদ শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। যজুস শব্দের অর্থ হলো পূজা, যজ্ঞ, যজ্ঞে উচ্চারিত প্রার্থনা প্রভৃতি। যজুর্বেদের রচনাকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে গবেষকদের মতে, ১২০০-১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব সময়কালে এটি রচিত হয়। যজুর্বেদ দুই খণ্ডে বিভক্ত : কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ।-অনুবাদক

ঘ. অথর্ববেদ (ATHER VEDA)।

অথর্ব বেদ হলো জাদুমন্ত্রের বেদ। এই গ্রন্থটিতে অনেকগুলো শ্লোক সন্নিবেশিত হয়েছে। ঊনবিংশ ও বিংশ খণ্ড ঋগবেদ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে দৈত্য-দানব থেকে রক্ষা পাওয়া এবং এগুলোকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জাদুমন্ত্র রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে হিংস্র জন্তু থেকে সুরক্ষা, নিরাপত্তা, সুখ, সমৃদ্ধি, জুয়া ও ব্যবসায় উন্নতির মন্ত্র।

অথর্ববেদ হলো সর্বশেষ বেদগ্রন্থ। এতে আর্য ও অন্যান্য সভ্যতার মিশেল পাওয়া যায়। তাই প্রাচীন আর্য গ্রন্থাবলিতে এই বেদের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বেদের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি

বেদের ব্যাখ্যাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন তিনটি আঙ্গিকে বেদের ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথম

এটি সায়ানাচার্যের ব্যাখ্যা। ইনি বেদের প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণের অন্যতম। সায়নাচার্য নিজ যুগে প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী চতুর্বেদের ব্যাখ্যা লিখেছেন। একইভাবে ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে তিনি মহাভারত থেকে ঐতিহাসিক দলিলপ্রমাণও উপস্থাপন করেছেন। হিন্দু পণ্ডিতগণ তাকে অত্যন্ত ভক্তির চোখে দেখেন এবং তাকে মেধা ও বেদের বোধগম্যতার ক্ষেত্রে শীর্ষ পর্যায়ের বিবেচনা করেন। তারা বলে থাকেন, 'সায়নাচার্য না হলে আমরা বেদের রহস্য বুঝতে পারতাম না।'

প্রখ্যাত ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ম্যাক্স ম্যুলারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, সায়নাচার্য যদি আমাদের জন্য পথ সুগম করে না দিতেন, তাহলে এই দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করা আমাদের সাধ্যে ছিল না।

দ্বিতীয়

এটি ম্যাক্স ম্যুলারের ব্যাখ্যা। হিন্দুদের মাঝে এই ইউরোপিয় ইংরেজের যথেষ্ট কদর রয়েছে। কেননা, ইনিই প্রথমে পাশ্চাত্য ধারায় বেদ বোঝার প্রয়াস চালিয়েছেন। ইউরোপ-আমেরিকাতে ইনিই প্রথমে বেদের প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন। এমনকি হিন্দুরা তাকে মুকেশ ম্যুলার উপাধিতে ভূষিত করেছে। মুকেশ ম্যুলার অর্থ হলো আত্মার চক্রাবর্তন থেকে মুক্ত ম্যুলার।

তৃতীয়

এটি দয়ানন্দের ব্যাখ্যা। ইনি হিন্দুদের কাছে একজন সংস্কারক হিসেবে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনি হিন্দুদের মাঝে আর্য-সভ্যতার পুনর্জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। একইভাবে বেদে বর্ণিত বিভিন্ন

ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকেও তিনি অস্বীকার করেন। এরই মাধ্যমে তিনি বেদের ব্যাখ্যায় এক নতুন পদ্ধতির সূচনা করেন, যা ইতিপূর্বে আর কেউ করেনি। তিনি একেশ্বরবাদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক সকল বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বেদে বহুল উল্লিখিত মূর্তি ও প্রতিমা প্রভৃতি। তিনি একেশ্বরবাদ সাব্যস্ত করার নিমিত্তে এগুলোকে সৃষ্টিকর্তার কুদরতের বাহ্যিক রূপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার মত অনুযায়ী এই সংখ্যাগুলো ঈশ্বরের শাখা-প্রশাখার মতো। তার সাধারণ অস্তিত্ববিহীন এদের অস্তিত্ব নেই। তার ব্যাখ্যায় রূপক শব্দ ও উপমার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক হিন্দু সমাজে এই ব্যক্তিটির বিশাল প্রভাব রয়েছে। এ পর্যায়ে পাঠক সমীপে তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি।

স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী

দয়ানন্দ (১৮২৪-১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) হলেন আর্যসমাজের (ARYA SAMAJ) প্রতিষ্ঠাতা। এটি ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি কট্টরপন্থি হিন্দু সংগঠন। হিন্দুধর্মের মূল উৎস তথা বেদ ও তার ব্যাখ্যার আলোকে প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির ওপর এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আর্যসমাজের সবচেয়ে বিপজ্জনক উদ্দেশ্য হলো, শুদ্ধি আন্দোলন। শুদ্ধি আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নও মুসলিমদেরকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা। কেননা, তারা ইসলাম বা খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশের কারণে অপবিত্র হয়ে গিয়েছে। তাই তাদের পবিত্র করা আবশ্যক।

মুসলিমরা অত্যন্ত কঠোরভাবে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। তাদের অগ্রভাগে ছিলেন হিন্দুস্তানের জমিয়তে আহলে হাদিসের কর্ণধার মহান মুজাহিদ, সুদক্ষ বিতার্কিক শাইখ সানাউল্লাহ অমৃতসরী। আল্লাহপ্রদত্ত মেধাকে কাজে লাগিয়ে তিনি মুসলিমদের মাঝে স্বীয় ধর্ম ও বিশ্বাসের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

এভাবেই মুসলিমরা এই ফিতনার আগুনটি নির্বাপিত করতে সক্ষম হন। তবে আর্যসমাজ তাদের সেই চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

এই দলটির কাছে স্বামী দয়ানন্দ কর্তৃক রচিত *যথার্থ প্রকাশ* বইটি মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে আসছে। লেখক এই বইতে প্রসিদ্ধ সকল ধর্ম খণ্ডন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। বইটিতে ১৪টি অধ্যায় রয়েছে। তন্মধ্যে চতুর্দশ অধ্যায় তিনি ইসলাম ধর্মের খণ্ডনে লিখেছেন। ইসলাম সম্পর্কে তার সেইসব বাগাড়ম্বরের জবাবে ভারতীয় আহলে হাদিস নেতা সানাউল্লাহ অমৃতসরী *হক প্রকাশ* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর শাইখ

ইমামুদ্দিন রামনগরীও একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম *দালায়েলুল কুরআন ফি ইফতিরাই দয়ানন্দ ওয়াল বুহতান*।

যথার্থ প্রকাশ বইটি ভারতীয় ও ইউরোপিয় বহু ভাষায় অনূদিত হয়।

১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের সূচনালগ্নে আর্যসমাজ এই গ্রন্থটি রচনার শতবর্ষ উদ্‌যাপন করে। প্রত্যেক বিবেকবান মুসলিমের উচিত এই একটি বই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে কী পরিমাণ অনিষ্ট সাধন করেছে, তা চিন্তা ও গবেষণা করে দেখা।

আমাদের অধিকার রয়েছে এই সংস্কারক ও তার দলকে এই প্রশ্ন করার যে, কোথায় থাকে তাদের বেদের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস, যখন বেদের শিক্ষা ও তাদের রীতিনীতির মাঝে বৈপরীত্য দেখা দেয়? বেদ তো পশু উৎসর্গের কথা বলে। আর তারা তো এগুলোকে খাওয়া নিষিদ্ধ মনে করে। বেদ মূর্তির জন্য গৃহনির্মাণ করতে বলে অথচ তারা এটা নিষিদ্ধ মনে করে। বেদ বহু দেবতায় বিশ্বাসের কথা বলে আর তারা মাত্র তিন দেবতায় বিশ্বাস স্থাপন করে।

যেমন ঋগবেদে বলা হয়েছে, হে ইন্দ্র, অখিল মরুৎগণ সম্প্রীতিভাজন হইয়া তোমাকে স্তোত্র দ্বারা বর্ধিত করে তোমার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন।[১৭]

অন্যস্থানে বলা হয়েছে, ...তাহারা বৃষভসমূহ পাক করে, তুমি তাহা ভোজন করো।[১৮]

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে, ...হে ইন্দ্র, তোমার নিমিত্ত পুরোহিতদিগের সহিত একত্র স্থূলকায় বৃষকে পাক করি।[১৯]

অন্যত্র বলা হয়েছে, (ইন্দ্র বলেন) আমার জন্য পঞ্চদশ এমনকি বিংশ বৃষ পাক করিয়া দেয়, আমি খাইয়া শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি।[২০]

যজুর্বেদের দ্বাবিংশ ও পঞ্চবিংশ অধ্যায় বিভিন্ন প্রাণীর উৎসর্গ সংবলিত আলোচনায় ভরপুর।

তারা এক ঈশ্বরে পূজা করে অথচ বেদ বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানায়। যেমন ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুণ, প্রজাপতি, বিষ্ণু, যম প্রভৃতি। তবে আর্যসমাজ দয়ানন্দের মতো এই অনুচ্ছেদগুলোর বিশ্লেষণ করে থাকে। দয়ানন্দের দাবি অনুযায়ী বেদের রয়েছে প্রকাশ্য ও গোপন মর্ম। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু জনসাধারণ তার ব্যাখ্যাগুলো মেনে নেয়নি।

---

[১৭] ঋগবেদ, মণ্ডল : ৬, সূক্ত : ১৭, শ্লোক : ১১।
[১৮] ঋগবেদ, মণ্ডল : ১০, সূক্ত : ২৮, শ্লোক : ৩।
[১৯] ঋগবেদ, মণ্ডল : ১০, সূক্ত : ২৭, শ্লোক : ২।
[২০] ঋগবেদ, মণ্ডল : ১০, সূক্ত : ৮৬, শ্লোক : ১৪।

দুই. উপনিষদ (UPNISHAD)

উপনিষদ অর্থ হলো জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে গুরুর সান্নিধ্য-প্রাপ্তির মাধ্যমে অর্জিত মূলত বেদের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এতে রয়েছে হিন্দু পুরোহিত ও সন্ন্যাসব্রত পালনকারীগণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। এসব সন্ন্যাসব্রত পালনকারীগণ সৃষ্টিজগতের রহস্য জানা ও মৃত্যুকে জয় করার উদ্দেশ্যে বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি নির্জন স্থান বেছে নিয়ে সাধনায় লিপ্ত হতেন। তারা চাইতেন এই সাধনার মাধ্যমে তারা মোহময় এই জীবন পেরিয়ে অনন্ত সুখ লাভ করবেন। অনাড়ম্বর জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ভারতীয় ও ইউরোপিয়দের মাঝে সমানভাবে এই গ্রন্থগুলো প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ভারতীয় সন্ন্যাসবাদ ও ইউরোপিয় সংযমবাদে অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে এই গ্রন্থগুলোর প্রভাব ছিল বেশি। কিন্তু এই গ্রন্থগুলোর হাকিকত অদ্যাবধি রহস্যাবৃত ও ইতিহাসের অন্ধকারে নিমজ্জিত। না এগুলোর রচয়িতা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়, না পাওয়া যায় এগুলোর সঠিক রচনাকাল। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, এই গ্রন্থগুলোর একটির নাম হলো 'আল্লাহ উপনিষদ'। এতে ইসলাম ধর্মের উলুহিয়্যাতের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি রচিত হয়েছে মোঘল সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের সময়ে।

এভাবেই আর্যদের সময় এই গ্রন্থগুলোর রচনা শুরু হয়ে মোঘল আমল পর্যন্ত চলতে থাকে। দীর্ঘ দুই সহস্রাব্দ সময়ে রচিত এই গ্রন্থগুলোর কী মর্যাদা থাকতে পারে! কিন্তু একটু আগেই আমরা যেমনটা বলছিলাম যে, হিন্দুধর্মের মৌলিক কোনো আকিদা-বিশ্বাস নেই। তাই সন্ন্যাসীগণের অভিজ্ঞতা, ঋষিগণের আচার-আচরণ, এককথায় তাদের ধর্ম ও কৃষ্টি সম্পর্কে যে গ্রন্থেই আলোচনা করা হোক না কেন, তারা সেটাকে পবিত্রজ্ঞান করে থাকে। চাই সেটা ইবনে আরাবির *ফুসুসুল হিকাম* কিংবা *ফুতুহাতে রব্বানির* মতো উঁচুদরের কোনো কিতাব হোক না কেন।

উপনিষদের সংখ্যা

মাদ্রাজের আদিয়ার লাইব্রেরির (ADYAR LIBRARY) হিসেব অনুযায়ী অপ্রকাশিত উপনিষদের সংখ্যা প্রায় ১০৮টি। আর লাইব্রেরিটি উপনিষদ নামে প্রকাশ করেছে ৭১টি গ্রন্থ। এতে করে উপনিষদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৯টি। এদিকে রায়বেরেলিতে পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মার টীকা সংবলিত ১০৮টি গ্রন্থ ছাপা হয়। তিনি এগুলোকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হলো—

১. জ্ঞান খণ্ড।

২. ব্রাহ্মবিদ্যা খণ্ড।

৩. যোগ খণ্ড।

তবে উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ ও বিবেচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি[২১]। গ্রন্থগুলো হলো—

১. ঈশ।

২. কেন।

৩. কঠ।

৪. প্রশ্ন।

৫. মুণ্ডক।

৬. মাণ্ডুক্য।

৭. ঐতরেয়।

৮. তৈত্তিরীয়।

৯. ছান্দোগ্য।

১০. বৃহদারণ্যক।

১১. কৌষিতকি।

১২. শ্বেতাশ্বতর।

এসব উপনিষদের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে রয়েছেন শংকরাচার্য, রামানুজ, নিমবার্ক, বল্লভ প্রমুখ। তারা প্রত্যেকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন।[২২]

ভারতীয় দার্শনিক ড. রাধাকৃষ্ণ মনে করেন, উপনিষদগুলোর রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে। তাছাড়া এই উপনিষদগুলোর মাঝে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাচীন যুগে লিখিত উপনিষদগুলোতে সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনার কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগে লিখিত উপনিষদগুলোতে ব্রহ্মার উপাসনা ও ধর্মীয় আবশ্যিক বিষয়ের প্রতিপালনের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি হলো বিষ্ণু উপনিষদ। এতে 'আনাল হক' তথা 'আমি চিরন্তন সত্য' আকিদার হাকিকত সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি যুগে এই আকিদার দাওয়াত দিয়েছিলেন হুসাইন বিন মনসুর হাল্লাজ। ৩১০ হিজরিতে বাগদাদে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। হুসাইন বিন

---

[২১] বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য উপনিষদের সংখ্যা ১৩টি। উপরের ১২টির সঙ্গে মৈত্রায়ণীয় নামে একটি উপনিষদের নাম সেখানে যুক্ত করা হয়েছে।-অনুবাদক

[২২] *কামুসুল হিন্দুস*, পৃষ্ঠা : ১১৭।

মনসুর হাল্লাজ ভারতে এসেছিলেন। এখানেই তিনি হিন্দু ধর্মীয় বিষয়াবলি, যোগসাধনা ও জাদু প্রভৃতি সম্পর্কে অবগত হন।[২৩] এরপর বাগদাদ এসে 'আনাল হক'-র দাওয়াত দিতে শুরু করেন।

ইবনে হাইকল বলেন, পারস্য থেকে হাল্লাজের উদ্ভব হয়। সে সুফিবাদ ধারণ করেছিল। এরপর এতে সে একেক স্তর অতিক্রম করতে করতে এমন অবস্থায় পৌঁছে গেল যে, তার মনে হতে লাগল, সে ইবাদতের মাঝে নিজের দেহকে পরিশোধিত করে নিয়েছে এবং সে তার কলবকে কাজে লাগিয়েছে। সে ভোগবিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্য থেকে নিজেকে দূরে রাখতে শুরু করে এবং তার ধারণা অনুযায়ী সে সাধনা ও মোরাকাবার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে মানব-স্বভাব থেকে মুক্তি লাভ করেছে। এই স্তরে পৌঁছার পর তার মধ্যে 'আল্লাহর রুহ' প্রবেশ করেছে, যে রুহ ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এর মাধ্যমে সে সকলের কাছে এই মর্মে অনুকরণীয় মানবে পরিণত হয়েছে যে, নিজেকে 'কুন ফায়া কুন' বলার পর্যায়ে চলে গেছে।[২৪]

ভারতীয় প্রসিদ্ধ সুফি সারমাদ ছিলেন ইহুদি। তিনি নিজেকে মুসলিম ঘোষণা করেন। এরপর মাতৃভূমি তুর্কিস্তান ছেড়ে ভারত চলে আসেন। সেখানে তিনি মুসলিমদের মাঝে ইহুদি ও হিন্দু ধর্মীয় চিন্তাচেতনা ছড়িয়ে দিতে প্রয়াসী হন। সারমাদ প্রায়শ উলঙ্গ চলাফেরা করতেন। নিজেকে মজজুব-রূপে দাবি করতেন। এমনকি মুখে কুফরি কথাবার্তাও আওড়াতেন। সে সময়ের আলিমগণ ভারতীয় মুঘল সম্রাট আলমগিরের দরবারে মিলিত হন। তারা তাকে বিষয়টির নাজুকতা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পক্ষে ফতোয়া দেন। অতঃপর তাদের ফতোয়া অনুসারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

হাল্লাজ-সারমাদরা যে সব স্তরের দিকে মানুষকে আহ্বান করেন এবং যে ওয়াহদাতুল উজুদের কথা বলেন, হুবহু একই জিনিসের অস্তিত্ব পাওয়া যায় হিন্দু সন্ন্যাসীগণের নিকট সংস্কৃত শব্দ 'ওঁম'-এর মধ্যে। তাদের এই ওয়াহদাতুল উজুদের মূল উৎসই হলো হিন্দুদের এসব উপনিষদ।

তারা বলেন, ছয়জন সন্ন্যাসী তাদের গুরু ঋষি পিপলাদ/পিপ্পালদার কাছে সমবেত হন। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুযায়ী প্রশ্ন করেন। তন্মধ্যে পঞ্চমজনের প্রশ্ন ছিল: যে মানুষ্য তার পার্থিবজীবন পুরোটাই উপাসনার মধ্যে কাটিয়েছে, তার অন্তিম পরিণতি কী হতে পারে? তখন গুরু উত্তর দিলেন : ওঁম শব্দটি তিনটি বর্ণের সমন্বয়ে

[২৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩১৮-৩১৯।
[২৪] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩৪৭।

গঠিত। এর প্রথম বর্ণ তোমাকে মনুষ্য জগতের রহস্যের সন্ধান দেবে। দ্বিতীয় বর্ণ তোমাকে ঊর্ধ্বজগতের রহস্যের সন্ধান দেবে। আর তৃতীয় বর্ণ তোমাকে ব্রহ্মার জগতের রহস্য সম্পর্কে অবগত করবে। যে ব্যক্তি এই সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হবে, তার সামনে 'ওঁম'-এর তাৎপর্য উন্মোচিত হবে। সে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে।

প্রিয় পাঠক, আপনি নিজেই এবার হাল্লাজের 'আনাল হক' ও উপনিষদের মূলমন্ত্র 'ওঁম'-এর মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখুন।[২৫]

তিন. পুরাণ (PURAN)

পুরাণ হলো ওই গ্রন্থ, যেখানে পূর্ববর্তীদের রূপকথা ও আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে পুরাণ পঞ্চম বেদ হিসেবে বিবেচিত। কেননা, বেদের বোধগম্যতা পুরাণের ওপর নির্ভরশীল। হিন্দু পণ্ডিতগণ দাবি করেন, বেদের মতো এটিও প্রাচীন যুগ থেকে অস্তিত্বশীল। বেদের হাকিকত যে বুঝতে চায়, তার জন্য পুরাণ সম্পর্কে সম্যক অবগতি আবশ্যক। কেননা, বেদের সকল ইঙ্গিতবহ ঘটনাবলি পুরাণে উদাহরণ ও উপন্যাসাকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পুরাণে নিম্নোক্ত বিষয়াবলির আলোচনা পাওয়া যায়—

১. সৃষ্টিজগতের জ্ঞান।

২. সৃষ্টিজগতের প্রসার।

৩. মনুর যুগসমূহ এবং এসব যুগে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি।

৪. সূর্যবাসী ও চন্দ্রবাসী রাজাগণের বর্ণনা।

পুরাণ অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, এটি প্রথমে ১৮টি অধ্যায়ে সংবলিত। প্রতিটি অধ্যায়ই আলাদা এবং স্বতন্ত্রভাবে রচিত। পুরাণ গ্রন্থগুলোর মৌলিক উদ্দেশ্য হলো—'অবতার' আকিদা সাব্যস্তকরণ। অবতার বলা হয় মানবাকৃতিতে ঈশ্বরের পৃথিবীতে আগমনকে। এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে।

---

[২৫] আধুনিক যুগে স্বামী রাম তেরেস (১৮৭৩-১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ) মনসুর হাল্লাজের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ কবি আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের সহকর্মী। লাহোরে তারা একসঙ্গে অধ্যাপনা করতেন। তিনি সাধনাজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এরপর তিনি পার্থিব সকল অবলম্বন ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন এখতিয়ার করেন। হিমালয় পর্বতে গিয়ে তিনি ধ্যান ও সাধনা করতে থাকেন। সেখানকার বিভিন্ন গুহায় দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। তিনি বেশ বড় মাপের মজজুব ছিলেন। গঙ্গা নদীতে ডুবে তার মৃত্যু হয়।

ভারতীয় এই অধ্যাত্মবাদী যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় দেশগুলোতে দীর্ঘ সফর করেছিলেন। সেখানে তিনি বেশ কিছু ভাষণও প্রদান করেন। এমনকি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও যোগসাধনার কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি বলতেন, আমি রামের অভ্যন্তরে আর রাম আমাতে। তিনি অধিকাংশ সময় রাম রাম জপ করতেন।

পুরাণের সংখ্যা ১০৮-এরও অধিক। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতবর্গের নিকট গ্রহণযোগ্য পুরাণ হলো ১৮টি। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও সর্বাধিক প্রচলিত হলো, 'ভগবত পুরাণ' (VHAGWAT PURAN)। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিদিন ভোরে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে এটি পাঠ করে থাকে।

পুরাণের রচয়িতা নির্ধারণে হিন্দু পণ্ডিতগণের মাঝে তুমুল বিরোধ বিদ্যমান। তাদের অধিকাংশের মতামত হলো, বেদের রচয়িতা অর্থাৎ বেদব্যাসই পুরাণ রচনা করেছেন। তবে এই দাবিটির অসারতা একেবারে স্পষ্ট। কেননা, পুরাণে হিন্দু দার্শনিক শংকরাচার্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তিনি হলেন ৮ম শতাব্দীর ব্যক্তি অর্থাৎ বেদব্যাসের পরে।

একইভাবে এই গ্রন্থগুলোর মাঝেও রয়েছে পরস্পর সাংঘর্ষিক বক্তব্য। যেমন শিব পুরাণে শিবকে প্রধান ঈশ্বর বলা হয়েছে। আর অন্যান্য দেবতাগণ তার সেবক। পক্ষান্তরে দেবী পুরাণে বলা হয়েছে দেবীই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আর অন্যান্য দেবতাগণ তার সেবক।

এসব কারণে হিন্দু পণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, বিষ্ণু পুরাণ ও বামন পুরাণ ব্যতীত বাকি সকল পুরাণই বিকৃত ও মিথ্যাচারে ভরপুর। অপরদিকে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ পুরাণসমূহকে হিন্দুধর্মের মৌলিক উৎসগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। এগুলো সবই তাদের পণ্ডিতগণের বিবৃতি। তাদের বিবৃতিতেই এগুলোর অসারতা প্রমাণিত হয়। এ পর্যায়ে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, কীসের ওপর ভিত্তি করে তারা এই পুরাণগুলোকে সকাল-সন্ধ্যা জপ করে? কেনইবা তারা বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মঙ্গল লাভের আশায় এগুলোর আবৃত্তি করে? এগুলো পাঠের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানইবা কেন শুরু করে? এগুলো কি নিছক অজ্ঞতা ও অন্ধ অনুসরণ নয়?

পাঁচ. মহাভারত (MAHA BHARAT)[২৬]

মহাভারত নামটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। একটি হলো 'মহা' অপরটি হলো 'ভারত'। সুতরাং গ্রন্থটির নাম থেকেই তার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এটি

[২৬] মূল গ্রন্থে এখানে ক্রমিক 'পাঁচ' দেওয়া আছে। ক্রমিক 'চার'-এর উল্লেখ নেই।-অনুবাদক

ভারতে সংগঠিত মহাযুদ্ধের ইতিহাস। তিনজন হিন্দু লেখক এটি রচনায় অংশ নেন। তারা হলেন : কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস, বৈশম্পায়ণ ও উগ্রশ্রবাঃ সৌতি।[২৭]

প্রথমে এই গ্রন্থটির নাম ছিল জয়া অর্থাৎ বিজয়। অতঃপর তার নাম হয় ভারত। সর্বশেষ এটি মহাভারত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

গ্রন্থটি হুবহু আমাদের পর্যন্ত পৌঁছায়নি। বরং এতে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও বর্ধিতকরণ হয়েছে। গবেষকগণের মতে, এতে দুই সহস্রাধিক অধ্যায় এবং এক লক্ষ বিশ হাজারেরও অধিক শ্লোক ছিল।

হিন্দু পণ্ডিত শ্রী বাল দেব তার *তারিখুল হাদারাতি ওয়াস সাকাফাতি ফিল হিন্দ* নামক গ্রন্থে বলেন, এ কথা প্রসিদ্ধ যে, মহাভারত খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। এটি এক লক্ষ শ্লোক সংবলিত একটি সুবিশাল গ্রন্থ।

গ্রন্থটি রচনার প্রেক্ষাপট

ইতিপূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি যে, আর্যরা খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই এ অঞ্চল জয় করে। এরপর তারা তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারা প্রণয়ন করতে শুরু করে। কিন্তু শুরুতেই তারা বড় রকমের ধাক্কা খায়। তারা নিজেরাই তিনটি সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে পড়ে। দলগুলো হলো—

১. ব্রহ্মা সম্প্রদায়।

২. বিষ্ণু সম্প্রদায়।

৩. শিব সম্প্রদায়।

অচিরেই আমি এই সম্প্রদায়গুলোর বিরোধ নিয়ে আলোচনা করব।

একইভাবে এ সময় দুটি নতুন ধর্মেরও আবির্ভাব ঘটে—

১. বৌদ্ধ ধর্ম, যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন গৌতম বুদ্ধ।

২. জৈন ধর্ম, যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহাবীর।

বুদ্ধ এবং মহাবীর বেদের আকিদা-বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানতে শুরু করেন। তাই আর্য সভ্যতার হিন্দু পণ্ডিতগণ বাধ্য হন এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে, যে গ্রন্থটি

---

[২৭] হিন্দুধর্মের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বেদব্যাস প্রথমে ৮৮০০ শ্লোক বিশিষ্ট জয়া নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পরে তার শিষ্য বৈশম্পায়ণ সেই শ্লোককে বৃদ্ধি করে ২৪০০০ শ্লোক বিশিষ্ট ভারত গ্রন্থ রচনা করেন। পরে অপর এক শিষ্য উগ্রশ্রবাঃ সৌতি ভারত গ্রন্থকে বৃদ্ধি করে এক লক্ষ শ্লোক বিশিষ্ট মহাভারত গ্রন্থ রচনা করেন।-অনুবাদক

উপর্যুক্ত তিনটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। তখনই এই মহাভারতের প্রকাশ ঘটে। বিবদমান তিনটি সম্প্রদায়ই এর দুই মলাটের মাঝে একত্রিত হয়। এতে সন্নিবেশিত হয় যোগ ও বেদান্তের চিন্তাধারা। ফলে তারা নতুন করে একতাবদ্ধ হয়। সকল হিন্দু এই গ্রন্থটিকে স্বীকার করে নেয়। তারা এটাকে পবিত্র জ্ঞান করতে শুরু করে।

গ্রন্থটিতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত হয়েছে, যার সত্যতা সম্পর্কে আমরা অবগত নই। দ্রৌপদী নামক এক নারীকে কেন্দ্র করে রাজ পরিবারে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। শেষ পর্যন্ত একদলের বিজয়ের মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি হয়। এই ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে কৃষ্ণ নামক গল্পের একজন নায়কের ভাষায় ধর্মীয় দর্শন ও আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। যদ্দরুন এটি হিন্দুদের কাছে শিষ্টাচার ও নীতি-নৈতিকতার উচ্চমার্গীয় গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে।

গ্রন্থটি আরবিসহ পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়। একজন ভারতীয় মুসলিম আবদুল হামিদ নোমানি এটিকে আরবিতে ভাষান্তর করেন। তবে আমি এই আরবি কপির কোনো হদিস পাইনি। আমি সর্বদা হিন্দি অনুবাদ-সংবলিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এর মূল কপিটির ওপর নির্ভর করতে চেষ্টা করেছি।[২৮]

ছয়. গীতা (GEETA)

গীতাকে হিন্দুধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভারতীয় চিন্তাধারায় এর যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। এতে সেনাপ্রধান অর্জুনকে প্রদত্ত ভারতীয় বীর কৃষ্ণের উপদেশমালা ও শিক্ষা সংকলিত হয়েছে। এসব উপদেশমালার মধ্যে রয়েছে সৈনিকের দায়িত্ব সম্পর্কিত আলোচনা। সৈনিকের প্রধান দায়িত্ব হলো মাতৃভূমির প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকা। এমনকি আক্রমণকারীরা তার নিকটাত্মীয় হলেও। মাতৃভূমির জন্য এই যুদ্ধকে পবিত্র যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে।

গ্রন্থটিতে আরও রয়েছে ঈশ্বরের সত্তা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা। কেননা, তাদের ধারণা অনুযায়ী কৃষ্ণ হলেন ব্রহ্মার অবতার। উল্লেখ্য ব্রহ্মা হলেন সেই ঈশ্বর, যিনি মানবরূপে পৃথিবীতে আগমন করে থাকেন।

এছাড়া গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে মুক্তি লাভের উপায় হলো তিনটি। যথা—

[২৮] বাংলা ভাষায় মহাভারতের রচয়িতা অনেক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবি নিজেদের মতো করে মহাভারত রচনা করেছেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত মহাভারতকে বাংলা ভাষায় প্রথম মহাভারত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি তিনি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ) চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের নির্দেশে রচনা করেন। এ কারণে এটিকে কবীন্দ্র মহাভারত নামকরণের পাশাপাশি পরাগলি মহাভারতও বলা হয়। কোনো কোনো বর্ণনামতে, সঞ্জয় রচিত মহাভারতই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাভারত। (সূত্র, বাংলাপিডিয়া)-অনুবাদক

১. জ্ঞান

২. উপাসনা

৩. কর্ম

জ্ঞানলাভের উপায় হলো তুমি সমস্ত সৃষ্টিজগতকে মহৎপ্রাণে অবলোকন করবে। একইভাবে মহৎপ্রাণকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের মাঝে অবলোকন করবে। জ্ঞানের এই স্তরে পৌঁছতে পারলে তোমার ওপর থেকে ধর্মীয় সকল বিধি-নিষেধ রহিত হয়ে যাবে।

উপাসনার পথ হলো তুমি ঈশ্বরের অর্চনা করবে এবং তার উপাসনার মাঝে নিজেকে বিলীন করে দেবে। অর্থাৎ এ পথে নিজেকে কষ্ট দেবে। এছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই। আর কর্মের পদ্ধতিটি হলো, তুমি পৃথিবীতে অবস্থান করে তোমার পার্থিব দায়িত্বগুলো পালন করে যাবে। এক্ষেত্রে কোনো ফল লাভের অপেক্ষা করতে পারবে না। এভাবে সমস্ত সম্পর্ক থেকে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। আসীন হবে সুউচ্চ মার্গে। আর এখানেই তুমি পরমাংশের সঙ্গে মিলিত হবে।

উপর্যুক্ত শিক্ষার পাশাপাশি গীতাতে নিম্নোক্ত বিষয়ের শিক্ষাও প্রদান করা হয়েছে।

১. আত্মা অবিনশ্বর। মানুষ বাঁচেও না, মরেও না। বরং দেহ পরিবর্তন করে, যেভাবে পোশাক পরিবর্তন করা হয়।

২. ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে যুদ্ধে নিয়োজিত থাকা।

৩. রিপুর দমনের লক্ষ্যে আত্মার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

৪. মানুষ তার নিজের শত্রু এবং বন্ধুও বটে।

৫. সিদ্ধপুরুষের অন্তরে ভগবান অবস্থান করেন।

৬. জ্ঞানের চেয়ে উত্তম কিছুই নেই।

গ্রন্থটিতে ১৮টি অধ্যায় ও সাত লক্ষ শ্লোক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গীতা মহাভারতেরই একটি অংশ।

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলির মধ্যে বিবিধ জ্ঞানের আকর হিসেবে গীতা পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়। এতে রয়েছে কর্মবাদ দর্শন, পুরোহিত-সন্ন্যাসীগণের দায়িত্ব সম্পর্কিত আলোচনা, রাজনীতি বিদ্যা, রাজকীয় বিধান, আত্মার চক্র থেকে মুক্তি লাভের উপায় প্রভৃতি।

এতদ্‌সত্ত্বেও বড় বড় হিন্দু পণ্ডিতবর্গ এই গ্রন্থটিকে কাল্পনিক ও রূপক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা কৃষ্ণ নামক কোনো বীরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। একইভাবে

গ্রন্থটিতে বর্ণিত ভারতীয় মহাযুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের নিহত হওয়া ও প্রচুর সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার বিষয়টিও তারা অস্বীকার করে থাকেন।

ভারতীয় নেতা গান্ধিজি বলেন, কৃষ্ণের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না। তার সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্কও নেই।

ড. রাধা কৃষ্ণণ বলেন, গীতার চিন্তাধারা হলো কতগুলো বিরোধপূর্ণ বিষয়ের সমষ্টি। জ্ঞানের কোনো আলোকবর্তিকা সেখানে পাওয়া যায় না। এটির রচনায় বহু লেখকের হাত রয়েছে।

অনেক আধুনিক গবেষক এই গ্রন্থটি নিয়ে বিতর্ক তুলেছেন। কেননা, এটি ভারতীয় মহাযুদ্ধের উপলক্ষ্য। এমনকি এটি এখনও যুদ্ধ-সংঘাতের দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। আর যুদ্ধ-বিগ্রহের এই চিন্তাধারাটি হিন্দুধর্মের মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কেননা, হিন্দুধর্মের স্লোগানই হলো 'অহিংসা পরম ধর্ম'। স্বয়ং গান্ধিজি ছিলেন এই স্লোগানের অন্যতম আহ্বায়ক।

এই হলো বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করা গীতা ও তার বীর কৃষ্ণের তাৎপর্য। অথচ ভারতের প্রতিটি উপাসনালয়, স্টেশন ও এয়ারপোর্টে সর্বত্র এই কৃষ্ণের মূর্তি ও প্রতিকৃতি দেখা যায়। হিন্দুরা ভীষণ ভক্তি সহকারে তার পূজা করে থাকে।

সাত. রামায়ণ (RAMAYAN)

এই গ্রন্থটি রাম নামক এক ব্যক্তি ও লঙ্কান সম্রাট রাবণের মাঝে সংঘটিত এক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। উভয়ের মাঝে সংঘটিত এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে রামের বিজয়ের মাধ্যমে। এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে। আর তা হলো সত্য ও মিথ্যা, কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে বিদ্যমান চিরন্তন দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

ঘটনাটি সত্য না হলেও এই ঐতিহাসিক গল্পটি উপন্যাস আকারে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের বিষয়টি অত্যন্ত মজবুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। তাই তো এই উপন্যাসটি খ্রিষ্টপূর্ব সময়কাল থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দুদের মনেও এটি ভালোভাবে স্থান করে নিয়েছে।

অন্য ভাষায় বলা যায়, এটি এমন একটি জাতীয়তাবাদী গ্রন্থ, যা হিন্দু জনসাধারণের নিকট বিরাট মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করে নিতে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় সকল ভাষাতেই এর অনুবাদ সম্পাদিত হয়েছে। এমনকি ভারতের বাইরে ইন্দোনেশিয়া, চীন, বার্মা (মায়ানমার) ও তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলেও এটি সমাদৃত হয়েছে।

প্রসার বিবেচনায় রামায়ণ গ্রন্থটি গীতার চেয়েও এগিয়ে। এর কারণ হলো গীতাতে সূক্ষ্ম দার্শনিক বিষয়ে আলোচিত হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য সহজ বোধগম্য নয়। পক্ষান্তরে রামায়ণ একটি উপন্যাস গ্রন্থ, যা সাধারণ পাঠককেও আকৃষ্ট করে।

এখানে আমি সংক্ষেপে রামায়ণের বর্ণিত ঘটনাটি উল্লেখ করছি। এর পরেই আমি ঘটনাটির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করবো।

> অযোধ্যার[২৯] সম্রাট দশরথের তিন স্ত্রী ছিল। রাম ছিলেন তার প্রথম স্ত্রীর পুত্র। সম্রাট দশরথ দ্বিতীয় স্ত্রীকে অধিক ভালোবাসতেন। কেননা, দ্বিতীয় স্ত্রী কোনো এক যুদ্ধে তাকে সাহায্য করেছিলেন। তাই সম্রাট খুশি হয়ে তাকে কোনো একটি ইচ্ছে পূরণ করার প্রতিশ্রতি দিলেন। এরপর সম্রাট যখন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে রাজ সিংহাসনে বসাতে মনস্থ করলেন, তখন দ্বিতীয় স্ত্রী তার গর্ভে জন্ম নেওয়া ভারতকে অধিষ্ঠিত করার আবেদন জানায়। পাশাপাশি এ আবেদনও করে যে, রামকে যেন চৌদ্দ বছরের জন্য দেশান্তর করা হয়। সম্রাট তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে রাজ্য থেকে বের করে দিলেন। মেঝ ছেলে ভারতকে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করলেন।
>
> রাম স্বীয় স্ত্রী ও বৈমাত্রেয় ভাই লক্ষণকে নিয়ে বনজঙ্গলে চলে গেলেন। সেখানেই লঙ্কার (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) সম্রাট রাবণের সঙ্গে তার বিরোধ দেখা দেয়। রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সীতাহরণের বিষয়টি জানতে পেরে রাম বানরদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে লঙ্কায় আক্রমণ করেন। হনুমান ছিল এই বানরদলের সেনাপতি। সে লঙ্কাকে পুড়িয়ে দেয় এবং সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দেয়। এই যুদ্ধে লঙ্কান সম্রাট নিহত হয়।

এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত আখ্যানই হিন্দুদের রামকে সম্মান করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এই রূপকথায় বলা হয়েছে যে, রাবণ যখন সীতাকে অপহরণ করে নিজ দেশে নিয়ে যায়, তখন রাম বানরদেরকে নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে। কিন্তু উভয় বাহিনীর মাঝে ভারত মহাসাগর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি রামের বাহিনী তিনদিন পর্যন্ত সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে থাকে। একপর্যায়ে রাম ক্রোধান্বিত হয়ে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ধনুক নিয়ে আসতে বলে। রাম ধনুক দিয়ে সমুদ্রে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলে সেখানে আগুন ধরে যায়।

---

[২৯] অযোধ্যা হলো সেই স্থান, যেখানে ষোড়শ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর রবিবার, উগ্র হিন্দুরা এই মসজিদটিকে গুঁড়িয়ে দেয়। তারা সেখানে রাম মন্দির স্থাপন করে। এতে করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তীব্র সহিংস দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলিম শাহাদত বরণ করেন।

আগুনের প্রকোপে সমুদ্র শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। তখন সমুদ্র রামের সাহায্য কামনা করে বলে, হে মহাত্মন, আপনার ক্রোধের আগুনে আমি পুড়ছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আর নির্দেশ দিন। আপনার সেবায় আমি হাজির।

তখন রাম হেসে দিয়ে সমুদ্রকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাদেরকে পার হতে দাও। সমুদ্র বলল, হে মহাত্মন, আপনার বাহিনীতে নীল ও নল নামক দুজন মহান বানর রয়েছেন। তাদের রয়েছে পাহাড় বহন করার শক্তি। তারা পাহাড়কে সমুদ্রে স্থাপন করতে পারে।

অতঃপর রাম পাহাড় এনে সমুদ্রে ফেলতে নির্দেশ দিলেন, যাতে পাহাড় দিয়ে জাহাজের কাজ সারা যায়। নীল ও নল রামের নির্দেশ পালন করলো। তখন পুরো বাহিনী নিরাপদে পার হয়ে গেল এবং লঙ্কা জয় করে নিলো।

এই হলো রামায়ণ কাহিনির ঐতিহাসিক উপন্যাস। রামায়ণ অর্থ হলো রামচরিত। এই উপন্যাস রামকে মহান দেবতার আসনে আসীন করেছে কিন্তু পাঠকের কাছে কি এমন দেবতার ব্যাপারে আশ্চর্য লাগে না, যিনি নিজ বাহিনীতে অবস্থানরত নীল ও নল সম্পর্কে ছিলেন বেখবর? আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই দেবতা সমুদ্র পাড়ি দিতে অপারগ হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি তিনদিন পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

এই রূপকথার আলোচনার পর আমরা মূলগ্রন্থের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

রামায়ণের রচনাকাল নিয়ে হিন্দু পণ্ডিতগণ একমত হতে পারেননি। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, এটি বেদের অল্প কিছুকাল পরেই রচিত হয়েছে। আবার অনেকে দাবি করেছেন, এটি ৫০০ থেকে ২০০ খ্রিষ্টপূর্ব সময়কালে রচিত হয়েছে।

একইভাবে এর রচয়িতা বাল্মিকী (BALMIKI) হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত হলেও লেখকের সময়কাল সম্পর্কে রয়েছে মতবিরোধ। তারা কখনো কখনো বলে থাকে, বাল্মিকী রামের সামসময়িক ছিলেন এবং রামের সঙ্গেই ভ্রমণ করেছেন। আবার কখনো বলে যে, বাল্মিকী রামের কয়েক শতাব্দী পর রামায়ণ রচনা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, এটি একই সময়ে লিপিবদ্ধ হয়নি। বরং বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য লেখকগণ এতে অনেক কিছু সংযোজন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়, যা 'বালকাণ্ড' (শৈশব কাল) নামে পরিচিত।

পশ্চিমা গবেষকগণ মনে করেন, অশোক রাজ-পরিবারের কিছু ব্যক্তিবর্গ শ্লোকাকারে রামায়ণ রচনা করেন। এই গ্রন্থটিতে ১২ হাজার শ্লোক ছিল। হিন্দু ভিক্ষুকগণ ভিক্ষাবৃত্তির সময় এগুলো আবৃত্তি করতো এবং নিজেদের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী শ্লোক বাড়িয়ে নিতো। এভাবেই রামায়ণ বড় আকৃতি লাভ করে।

এরপর বাল্মিকী এসে বিক্ষিপ্ত এই অংশগুলোকে বিন্যস্ত করেন। কিন্তু প্রাচীন যুগে এটি তেমন একটা প্রচারণা পায়নি। এরপর ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের সময়ে তুলসি দাসের (১৫৩২-১৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ) আবির্ভাব হয়। তিনি এটিকে হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করেন। এরপরই রামায়ণ ভারতের সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা আগ্রহভরে এটি পড়তে থাকে।

কিন্তু তুলসি দাস তার অনুবাদে আমানতদারি রক্ষা করেননি। বরং বাল্মিকীর রচনার ওপর তিনি নিজের মতো করে অনেক কিছুই সংযোগ করেন। উদাহরণস্বরূপ তুলসি দাস রামকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে দেন। অথচ বাল্মিকীর উপন্যাসে তিনি ছিলেন একজন মর্যাদাবান দৃঢ়চেতা পুরুষ। তাই হিন্দু পণ্ডিতগণ তুলসি দাসের এই হস্তক্ষেপকে মেনে নিতে পারেননি। তারা তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। বিশেষত নারীদেরকে প্রহার করা ও নিম্ন শ্রেণির মানুষকে অবজ্ঞা করার বিষয়ে তারা তার কঠোর নিন্দা করেন। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। তুলসি দাসের রামায়ণ সাধারণ হিন্দু পরিমণ্ডলে গৃহীত হয়ে গেছে।

ঘটনার শেষে বলা হয়েছে, রাম তার পিতার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন। চৌদ্দ বছর তিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে বনজঙ্গলে বসবাস করেন। এদিকে তার ছোট ভাই ভারত (যার মা তাকে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন) রাজা হতে অস্বীকৃতি জানান।

ভারত চেষ্টা করছিল বনজঙ্গলে বসবাস করা তার ভাই রামকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু রাম ফিরে আসেননি। পিতা কর্তৃক নির্ধারিত সময় পূরণ করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। বাধ্য হয়ে ভরত রামের জুতা নিয়ে রাজ্যে ফিরে আসেন। এই জুতা তিনি সিংহাসনে রাখেন আর ধারণা করতে থাকেন যে, তার ভাই রাম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। অবশেষে নির্ধারিত সময় শেষে রাম রাজ্যে ফিরে আসেন এবং অযোধ্যার রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। সিংহাসনে বসে রাম রাজ্যময় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন।

এ কারণেই ভারতীয় সাহিত্যে তাকে ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করা হতে থাকে। ভারতে পুনরায় এই শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম আহ্বায়ক হলেন গান্ধিজি। তারা এটাকে রামরাজ্য হিসেবে অভিহিত করে থাকেন।

আট. বেদান্ত (VEDANT)

বেদান্ত শব্দের অর্থ হলো বেদের সারাংশ। এটি হিন্দুদের নিকট দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হিন্দু দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে এর প্রভাব অনেক বেশি।

এই গ্রন্থটিকে ব্রহ্মসূত্রও বলা হয়। কোনো কোনো হিন্দু পণ্ডিত দাবি করেছেন যে, প্রসিদ্ধ লেখক বেদব্যাসই এটি রচনা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা একমত হয়েছেন যে, এটি বাদরায়ণ রচনা করেছেন। বাদরায়ণ ছিলেন বুদ্ধ ও মসিহ (ঈসা) আলাইহিস সালামের মধ্যবর্তী সময়ের মানুষ। কেননা দেখা যায় যে, তিনি বুদ্ধের বহু অধর্মীয় শিক্ষার সমালোচনা করেছেন।

গ্রন্থটি চারটি অধ্যায় ও ষোলোটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে ব্রহ্মার উপাসনা ও উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অধর্মীয় মূলনীতিগুলোর খণ্ডন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে মুক্তি লাভের দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পদ্ধতিটি হলো, পূর্ণ উপাসনা ও উপাসনার পথে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। আর দ্বিতীয়টি হলো, ঐশ্বরিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া।

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়ে উপাসনায় সাধনাকারী ব্যক্তির প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি আত্মাসমূহের পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার অবস্থা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায় বেদান্তে হিন্দু দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ দশটি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। বিষয়গুলো হলো ঈশ্বরের পরিচয়, আত্মা, আত্মার চক্র, মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা, প্রতিদানের নিয়ম, উপাসনা, ঐশ্বরিক জ্ঞান, প্রলুব্ধকারী ও মুক্তি।

এই গ্রন্থটি তিনটি স্থায়ী হাকিকতকে স্বীকার করে। সেগুলো হলো—

প্রথম : পারমার্থিক অর্থাৎ আত্মার নিত্যতা ও অবিনশ্বরতা।

দ্বিতীয় : ব্যবহারিক অর্থাৎ সৃষ্টিজগতই ঈশ্বর। তিনি মানবাকৃতিতে উদ্ভাসিত হন। কেননা, মানবই হলো পরিপূর্ণ ও সুন্দরতম।

তৃতীয় : প্রাতিভাসিক অর্থাৎ হাকিকতের আশ্রয়ে ছলনার প্রকাশ।

বেদান্ত ব্যাখ্যাকারগণের দৃষ্টিভঙ্গি

বেদান্তের ব্যাখ্যাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন দুটি আঙ্গিকে এর ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। এক : অদ্বৈতবাদ। দুই : দ্বৈতবাদ। প্রথমটির আহ্বায়ক ছিলেন প্রসিদ্ধ হিন্দু দার্শনিক শংকরাচার্য, যার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় মতবাদের আহ্বায়ক ছিলেন হিন্দু পণ্ডিত রামানুজ।

উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য

১. শংকরাচার্যের মতে, ব্রহ্মা নির্গুণ ও নিরাকার।[৩০] অপরদিকে রামানুজের মতে, ব্রহ্মার সত্তাগত গুণ বিদ্যমান। তিনি বলেন, গুণহীন ব্রহ্মার অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। নির্গুণ ব্রহ্মা অনস্তিত্বের শামিল।

২. শংকরাচার্য বলেন, আমরা চোখে যা দেখি, তা সত্য নয়। এটি মায়া। অচিরেই এটি হারিয়ে যাবে। জগৎ হলো স্বপ্নের মতো বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই। এটা হলো ওই রজ্জুর মতো, যাকে অন্ধকারে মানুষ অজগর মনে করে। অতঃপর খেলার এই জগৎ শেষ হওয়ার পর শুধুই ব্রহ্মার অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকবে।

   তিনি আরও বলেন, মানুষের এ কথা বোঝা উচিত যে, তার বাইরের সত্তা বস্তুর ক্ষেত্রে অপর সত্তার মতো ভিন্ন। যে সত্তা জন্ম নেয়, মৃত্যুবরণ করে, খায়, পান করে, সে সত্তা বাস্তবে উল্লেখ করার মতো কিছু নয়। মানুষের উচিত তার অস্তিত্বের ভেতরে নজর দেওয়া। কেননা, সেটাই হলো প্রকৃত ব্রহ্মসত্তা। তাই তাকে এ কথা বলা অনুচিত হবে না যে, 'তুমিই মানুষ, তুমিই ঈশ্বর। তুমিই স্রষ্টা, তুমিই সৃষ্ট। তুমিই পূজারি, তুমিই পূজনীয়।'

   তিনি আরও বলেন, পূর্ণজ্ঞান অর্জন ও সকল পার্থিব সম্পর্ক থেকে মুক্ত হওয়া ব্যতিরেকে মানুষ ব্রহ্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। এ অবস্থায় সে নিজেই অদৃশ্যে বিলীন হতে পারে অথবা ঈশ্বরে বিলীন হতে পারে অথবা চিরস্থায়ী সুখের স্তরে পৌঁছে যেতে পারে।

   তার মতে, শিরক হলো মানুষের এ ধারণা করা যে, সে ঈশ্বরকে চিনতে পেরেছে। এই বক্তব্যটি দ্বি-পাক্ষিক। পাঠক শংকরাচার্যের এই বক্তব্যকে মিলিয়ে দেখুন সুফি ইবনুল আরাবির বক্তব্যের সঙ্গে। ইবনুল আরাবি বলেছেন, 'পূতপবিত্র সেই সত্তা, যিনি সবকিছু প্রকাশ করেছেন। আর তিনিই সেগুলো।'

   তিনি আরও বলেন—

---

[৩০] এটি ভ্রান্ত ফিরকা জাহামিয়াদের সঙ্গে মিলে যায়।

فما نظرت عيني إلى غير وجهه * وما سمعت أذني خلاف كلامه

আমার চক্ষু তার চেহারা ভিন্ন অন্য কিছু দেখেনি,

আমার কর্ণ তার কালাম ভিন্ন অন্য কিছু শোনেনি।

শংকরাচার্যের এই মতের বিপরীতে রামানুজের মত হলো, ব্রহ্মা ও সৃষ্টিজগৎ ভিন্ন। তবে সৃষ্টিজগৎ ব্রহ্মার অংশ। উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যমণ্ডিত। পরিপূরণ আকৃতিতেই উভয়ে বিদ্যমান। আত্মার রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। চাইলে ভালো কাজ করতে করতে পারে। চাইলে মন্দ কর্মও করতে পারে। তার মুক্তির উপায় হলো ব্রহ্মার দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ হওয়া।

বেদান্তের ব্যাখ্যায় এই দুটি ছাড়াও আরও নানা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তবে সেগুলো হিন্দু পরিমণ্ডলে ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিমবারাকের দর্শন। তিনি অদ্বৈত দ্বৈতবাদ ও দ্বৈত অদ্বৈতবাদের দাবিদার। আরও রয়েছেন মাধবাচার্য, যিনি ব্রহ্মা ও জগতের শাশ্বত হওয়ার দাবিদার। তিনি সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য করে থাকেন।

নয়. যোগবশিষ্ঠ (YOGAVASISHTA)

এই গ্রন্থটিকে হিন্দুদের মৌলিকগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হিন্দু ধর্মীয় অন্যান্য গ্রন্থের মতো এর লেখক সম্পর্কেও সঠিকভাবে জানা যায় না। এটি খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী এবং তার পরবর্তী সময়কালে রচিত হয়েছে। মূলত হিন্দু পণ্ডিতবর্গের নিকট এই যুগটিই তাদের ধর্মগ্রন্থ রচনার যুগ হিসেবে পরিচিত। কেননা, এ সময়েই আর্যরা তাদের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শেষ করে। অতঃপর তারা তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনপদ্ধতি সাজিয়ে নিতে শুরু করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পণ্ডিতগণ আধ্যাত্মিক গল্পের আদলে ধর্মীয় কিতাবাদি লিখতে শুরু করেন। এসব গল্পের মধ্যে থাকতো ঐশ্বরিক ও চারিত্রিক নানা শিক্ষাদীক্ষার বিবরণ।

এই গ্রন্থটিতে ৬৪ হাজার শ্লোক রয়েছে। ঋষি বশিষ্ঠ তার একনিষ্ঠ শিষ্য রামচন্দ্রকে দৈবশাস্ত্র, আধ্যাত্মিক শাস্ত্র ও ধ্যানশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেন। এই শাস্ত্রগুলো মানুষকে আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছে দেয়। এমনকি তাদের ধারণা অনুযায়ী ব্রহ্মা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

এই গ্রন্থে যোগের তিনটি পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। সেগুলো হলো—

ক. এককত্বের বিশ্বাস অর্থাৎ জগতে শুধুই ব্রহ্মার অস্তিত্বের বিশ্বাস করা।

খ. প্রশান্ত চিত্ত অর্থাৎ স্বীয় আত্মাকে অনুগত করা। তাদের ধারণা, যার আত্মা স্থির হয়, সে মানবের ওপর আপতিত পার্থিব সকল মুসিবত ও কষ্ট থেকে মুক্তি পায়।

গ. ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ। কেননা, এই গ্রন্থটি মানুষের জীবনকে ভুলভ্রান্তি, পাপ ও কামনা-বাসনায় পরিপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করে। আর এসব ভুলভ্রান্তি, পাপ ও কামনা-বাসনা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তখন মানুষ দুঃখ-বেদনা ও কষ্ট-ক্লেশে নিপতিত হয়। অতঃপর এই তিন পদ্ধতির কোনো একটি পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সে এখান থেকে মুক্তি পায় এবং চিরস্থায়ী আনন্দ ও সুখের জীবন লাভ করে। আর সেই জীবনটা হলো ঊর্ধ্বজগতে ব্রহ্মার সঙ্গে আত্মার মিলন।

ড. আহমদ শালবি কর্তৃক রচিত *আদইয়ানুল হিন্দ আলকুবরা* গ্রন্থের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে, এই গ্রন্থটির কিছু অংশ আরবিতে অনুবাদ হয়েছে। তিনি তার গ্রন্থে তার কিছু বাক্য তুলে ধরেছেন। আমি আহমদ শালবির[৩১] গ্রন্থ থেকে সেই লাইনগুলো হুবহু উল্লেখ করছি।

মৃত্যুর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এমন কোনো সত্তার জন্য সুখ-সমৃদ্ধির কোনো পথ খোলা নেই। জগতের সবকিছুই নিঃশেষ ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই জগতের আনন্দ ধোঁকা আর কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। দুঃখের কারণে সুখ বিলুপ্ত। আমাদেরকে দাস হিসেবে কেউ ক্রয় করেনি। তথাপি আমরা কাজ করে যাই দাসের মতো।

কামনা সর্বদা বানরের মতো অস্থির। আত্মা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। হাতে থাকা সম্পদে তুষ্ট হয় না। সর্বদা আরও অর্জনের জন্য লাফাতে থাকে। যতই তাকে তৃপ্তি দেওয়া হোক, তার ক্ষুধা ও চাহিদা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে।

দেহের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। এটি মুসিবত ও সকল দুঃখ-কষ্টের আধার। *শৈশব* হলো দুর্বলতা, অক্ষমতা ও বাকহীন সময়। আর যৌবন থেকে কীই-বা পাওয়ার আছে? সে তো বিজলির ঝলকের মতো। দৃষ্টিশক্তিকে ধাঁধিয়ে দিয়ে মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায়। কঠিন, বরফ-শীতল কষ্টময় বার্ধক্যের রাস্তাকে সে সুগম করে দিয়ে যায়।

জীবন হলো উন্মুক্ত প্রান্তরে রাখা প্রদীপের আলোর মতো। বাতাস সেই আলো নিয়ে ইচ্ছেমতো খেলা করে। বস্তুসমূহের চাকচিক্য বিজলির এক ঝলকের মতো। মুহূর্তকালের জন্য চারিদিক আলোকিত করে অনন্তকালের জন্য হারিয়ে যায়।

---

[৩১] *আদইয়ানুল হিন্দ আলকুবরা*, পৃষ্ঠা : ৭১।

গ্রন্থটি এভাবেই জীবনকে চিত্রায়িত করে। মানুষের মনে সৃষ্টি করে হতাশা ও বিতৃষ্ণা। এটি পুরোপুরি ইসলামের চেতনার বিপরীত। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা জুমার, আয়াত : ৫৩]

সংক্ষেপে বলতে গেলে হিন্দু পুরোহিতগণ এই গ্রন্থটি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এর ফলে তারা পার্থিব সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং সাধনার জন্য পাহাড়-গুহা ও বনজঙ্গল প্রভৃতি বেছে নেন।

আধুনিক যুগে ঋষি স্বামী রাম তিরাত (RAM TIRATH) এর উত্তম দৃষ্টান্ত। তিনি শেষ জীবনে মজজুব হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দাবি করতেন, 'আকাশের নিচে যোগবশিষ্ঠ-এর মতো কোনো গ্রন্থ কখনো রচিত হয়নি।'

এতক্ষণের আলোচনা থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, আল্লাহর তাআলার হিকমতের তাকাজা অনুযায়ী পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে যাওয়াই উপযুক্ত। আর অনন্তকাল পর্যন্ত কুরআনুল কারিমই মানুষের জীবনবিধান হওয়া উচিত। এতে করে মানুষ জাহিলিয়্যাতে ফিরে যাবে না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, তিনি আমাদেরকে ইসলামের সুমহান নিয়ামত দান করেছেন।

দশ. ধর্মশাস্ত্র (DHARMA SHASTRA)

এটি হিন্দুধর্মের বিধানবিষয়ক গ্রন্থসমূহের সমষ্টি। এটি বেদান্তের মূল ও সার। তবে এর অধিকাংশ গ্রন্থ হারিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে মাত্র ১৬টি গ্রন্থের অস্তিত্ব রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো মনুস্মৃতি অর্থাৎ মনুর বিধান।

ধর্মশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়

এই গ্রন্থগুলোতে মৌলিকভাবে তিনটি মৌলিক শিরোনাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিরোনামগুলো হলো— এক) মানবজীবনের চারটি পর্যায়। এর বিস্তারিত আলোচনা

সামনে করা হবে ইনশাআল্লাহ। দুই) অপরাধ ও দণ্ড। তিন) ধর্মীয় বিধিবিধান না মানলে একজন হিন্দু কী ধরনের শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে।

আর মনু নামক ব্যক্তিটির ব্যাপারে হিন্দুদের বক্তব্য বিরোধপূর্ণ। কখনো তারা বলছে, মনু হলেন মহাপ্লাবনে সমগ্র সৃষ্টিকুল বিনাশ হওয়ার পর জমিনের বুকে প্রথম মানুষটি হলেন মনু। তার থেকেই নতুন করে মানব-সভ্যতার সূচনা হয়েছে। আবার কখনো তারা বলছে, তিনি হলেন প্রধান পুরোহিত, যিনি নৈবেদ্য গ্রহণ করে থাকেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মতে, তার সময়কাল হলো ১০০০-৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব।

মনু সম্পর্কে এই পরিচিতির পর আমরা মূল গ্রন্থের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

এই গ্রন্থটিতে ১২টি অধ্যায় ও ২৬৯৪টি শ্লোক রয়েছে। এখানে আমরা অধ্যায়গুলোর আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করছি—

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে জগতের সৃষ্টি, প্রাণের অস্তিত্ব, অতঃপর সমগ্র জগতের বিনাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ব্রহ্মাচার্যাশ্রম। এটি হলো মানবজীবনের প্রথম স্তর।

তৃতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে বিবাহের প্রকার ও বিধিবিধান এবং ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য অর্পণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এখানে গৃহাশ্রম (মানবজীবনের দ্বিতীয় স্তর) সম্পর্কিত বিধিবিধান, বেদান্তের অনুসরণ ও মন্দ কাজ থেকে সতর্ক করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে দাম্পত্য বিধিবিধান ও স্বামীর অনুগত রমণীর পুণ্যার্জন প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : এখানে বানপ্রস্ত আশ্রম তথা দুনিয়া ত্যাগ (মানবজীবনের তৃতীয় স্তর) এবং বেদান্ত অধ্যয়ন ও তার অর্থ নিয়ে গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : এখানে সম্রাট, সাম্রাজ্য, দণ্ড প্রয়োগ, সেনাপতির দায়িত্ব এবং মানবজীবনে দুঃখ-পেরেশানির অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে বিচারব্যবস্থা, মিথ্যা রটনাকারীদের শাস্তি এবং শাসকের প্রতি উপাসনার ধরন সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

নবম অধ্যায় : নারী-পুরুষ ও শাসকের বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায় : হিন্দু সমাজের চার শ্রেণির লোকের কর্মপরিধি ও দায়িত্ব সম্পর্কিত আলোচনা এ অধ্যায়ে স্থান লাভ করেছে। এ সংক্রান্ত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

একাদশ অধ্যায় : পূজারিদের নিকট দারিদ্র্যের প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায় : এ অধ্যায়ে প্রতিদানের নিয়ম ও আত্মার চক্র থেকে মোক্ষ লাভের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এই হচ্ছে মনু কর্তৃক রচিত গ্রন্থ, যা হিন্দুদের শরিয়ত তথা হিন্দুদের অনুশাসনে ব্যবহৃত মুখ্য এক গ্রন্থ। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠক এই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত কিছু বিষয় দেখতে পাবেন। এটি হিন্দুধর্মের ফিকাহের সমতুল্য। বেদান্তের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে এটি রচিত হয়েছে।

হিন্দু সমাজের শ্রেণিবৈষম্য

হিন্দু সমাজের শ্রেণিবৈষম্য এই ধর্মের অন্যতম ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। কেননা, আর্যধর্ম বংশ বিবেচনায় মানবজাতিকে চার শ্রেণিতে ভাগ করেছে। তাছাড়া প্রত্যেক শ্রেণির জন্য আলাদা বিধিবিধান ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই নির্ধারিত গণ্ডির বাইরে যাওয়ার অধিকার কারো নেই। সম্মানজনক সকল কাজ ব্রাহ্মণ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত। তারাই হলো মানবজাতির সর্বোচ্চ শ্রেণি। তাদের ধারণা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। এই শ্রেণির সর্বোচ্চ উৎস তিনিই। আর তাদের শেষ পরিণতি হলো সেই মহান সত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া।

আর শূদ্ররা হলো অস্পৃশ্য ও মানবজাতির সবচেয়ে নিম্নশ্রেণির। তারা মানবীয় সকল গুণশূন্য। ঠিক যেন চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং তার চেয়ে নিকৃষ্ট। কেননা, তাদের ধর্মে গাভিকে পবিত্রজ্ঞান করে পূজা করা হয় অথচ শূদ্র সম্প্রদায়কে করা হয় অপমান। শপথ আল্লাহর, তাদের এই নীতি সম্পূর্ণ জুলুম ও মানবতার সঙ্গে ধৃষ্টতা বৈ কিছু নয়। এই সম্প্রদায়টির মুক্তির জন্য তাদেরকে ইসলামের উদারতার দিকে আহ্বান করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। কেননা, ইসলাম তাকওয়া তথা খোদাভীতিকেই সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছে।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেজগার।
[সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩]

এই শ্রেণিবিভাজন সৃষ্টির মূল উৎস হলো, তাদের পবিত্র গ্রন্থ ঋগ্বেদ। অতঃপর মনুসংহিতাতে এর বিস্তারিত বিবরণ ও প্রত্যেক শ্রেণির দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হয়।

পাঠক দেখুন ঋগ্বেদে কী বলা হয়েছে দেখুন, ঈশ্বর তার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরু থেকে বৈশ্য এবং চরণ থেকে শূদ্র সৃষ্টি করলেন।[৩২]

---

[৩২] ঋগ্বেদ, মণ্ডল : ১০, সূক্ত : ৯০, শ্লোক : ১২।

ঋগ্বেদের এই শ্লোকটিই হিন্দুদের শ্রেণিবিভাজনকারী। যতদিন পর্যন্ত তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে এই শিক্ষা বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই শ্রেণিবিভাজন লুপ্ত হবে না এবং এই শ্রেণিবৈষম্য দূরীকরণের সকল প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম হিসেবে বিবেচিত হবে।

আরও অবাক করা বিষয় হলো, হিন্দু পণ্ডিতগণ শূদ্র শ্রেণিকে চণ্ডাল নামে সম্বোধন করতে কোনোরূপ দ্বিধা করে না। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই শ্রেণিগুলোর নামকরণ করা হয়েছে : ব্রহ্মা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও চণ্ডাল। আবার কখনো কখনো হিন্দুদের ধর্মীয় পুস্তকগুলো এই শ্রেণিটির আলোচনা এমনভাবে এড়িয়ে গেছে যেন তারা মানবজাতির কোনো অংশই নয়।[৩৩]

হিন্দু ধর্মীয়গ্রন্থগুলো ব্রাহ্মণ শ্রেণিকে মর্যাদা দিয়েছে। তাদেরকে সর্বপ্রকার জবাবদিহির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। যেন তারা ঊর্ধ্বজগতের বাসিন্দা। ঋগ্বেদের একটি জায়গায় বলা হয়েছে, দুনিয়ার বুকে নারীর প্রকৃত স্বামী হচ্ছে একজন ব্রাহ্মণ। যদিও সে নারীর কোনো ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য শ্রেণির স্বামী থাকে।[৩৪]

এর অর্থ হলো ব্রাহ্মণের জন্য যেকোনো নারীকে বিবাহ করা বৈধ। এমনকি সে নারী কোনো ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য শ্রেণির পুরুষের সঙ্গে পূর্ব থেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকলেও। সর্বোপরি তার প্রকৃত স্বামী হলো একজন ব্রাহ্মণ।

এখানে মূলত অবজ্ঞাবশত শূদ্র শ্রেণির নাম নেওয়া হয়নি। কেননা, যেখানে ব্রাহ্মণের জন্য উপরস্থ দুই শ্রেণি তথা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণির বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করে নেওয়া বৈধ, সেখানে শূদ্র শ্রেণির বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করে নেওয়াটা বৈধ হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

শাত বাত ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হয়েছে, সম্রাট সূর্যত'র কন্যা সুকাইনা চৌহান নামক এক ব্যক্তির বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। অতঃপর সে একজন ব্রাহ্মণকে বিয়ে করে।[৩৫] একইভাবে রাতবীথির কন্যাও বিবাহিতা ছিল। পরে সে-ও একজন ব্রাহ্মণ শ্রেণির লোকের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।[৩৬]

এভাবেই আমরা দেখতে পাই হিন্দুদের গ্রন্থগুলোতে ব্রাহ্মণদেরকে অন্যান্য শ্রেণির ওপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অপর শ্রেণিগুলোকে চরমভাবে অপমানিত করা হয়েছে। তারা এ কথার প্রচার করে যে, ব্রাহ্মণ হলো সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে সৃষ্ট। সুতরাং কারোর

---

[৩৩] অথর্ববেদ : ৫/১৭/৯, মৈত্রায়ণীয় সংহিতা : ৩/১/৫, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ : ৩/২,৯,১২, তৈত্তিরীয় সংহিতা : ৬/২,৫।

[৩৪] অথর্ববেদ : ৪/২৪-২৫।

[৩৫] *শাত বাত ব্রাহ্মণ* : ৪/১,৫,৭।

[৩৬] *বৃহত যুথা* : ৫/৫০।

অধিকার নেই তাদেরকে আঘাত দেওয়া কিংবা সমালোচনা করা। এমনকি তারা অমর্যাদাকর ও অপ্রীতিকর কিছু করে বসলেও।

আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এখানে বিজয়ীদেরকে সম্মানের আসনে বিবেচনা করা হচ্ছে আর বিজিতকে বলা হচ্ছে পঙ্কিল। সাধারণত ইতিহাস এর বিপরীত আচরণের সাক্ষ্য দেয়। সাধারণভাবে বিজিতরা বিজয়ীদেরকে ঘৃণার চোখেই দেখে থাকে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা হিন্দুদের প্রত্যেক শ্রেণির দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরছি। এতে করে বিষয়গুলো আরও সুস্পষ্ট হবে এবং বোঝা যাবে যে, ভারতের বিশ কোটি দলিত শ্রেণির দুর্দশা কতটা প্রকট ও শোচনীয়।

প্রথম শ্রেণি : ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ হলো যিনি ঈশ্বরকে চেনেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক।

মনুস্মৃতির বক্তব্য অনুযায়ী এ শ্রেণির দায়িত্ব ও কর্মপরিধি পাঠক সমীপে তুলে ধরা হলো—

১. কিন্তু এদের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণেরাই অধ্যাপনা করবেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণের পক্ষে অধ্যাপনা করা উচিত নয়। এটাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।[৩৭]

২. ব্রাহ্মণেরাই অন্যান্য সকল বর্ণের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী।[৩৮]

৩. ব্রাহ্মণ সম্মানিত ও পূজনীয়। এমনকি সে অমর্যাদাকর কিছু করলেও।[৩৯]

৪. অগ্নিকে যেভাবে প্রধান দেবতাগণের মধ্য হতে গণ্য করা হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণও প্রধান দেবতাগণের মধ্যে পরিগণ্য।[৪০]

৫. ব্রাহ্মণের সর্বোত্তম কর্ম হলো বেদ অধ্যয়ন। ক্ষত্রিয়ের সর্বোত্তম কর্ম হলো দেশ রক্ষা করা। বৈশ্যের সর্বোত্তম কর্ম হলো ব্যবসায় নিয়োজিত থাকা।[৪১]

---

[৩৭] মনুস্মৃতি : ১০/১।
[৩৮] মনুস্মৃতি : ১০/৩।
[৩৯] মনুস্মৃতি : ৯/৩১৯।
[৪০] মনুস্মৃতি : ৯/৩১৭।
[৪১] মনুস্মৃতি : ১০/৮০।

৬. ব্রাহ্মণের জন্য প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি বৈধ। এতে তার কোনো দোষ ধরা হবে না। একইভাবে তার জন্য অন্যদের সম্পদ লুট করাও বৈধ।[৪২]

৭. ব্রাহ্মণের যদি সকল বর্ণের অনেক স্ত্রী থাকে, তখন মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদকে সাড়ে সাত ভাগ করা হবে। অতঃপর ব্রাহ্মণ বর্ণের স্ত্রী তিন অংশ পাবে। ক্ষত্রিয় বর্ণের স্ত্রী পাবে দুই অংশ। বৈশ্য বর্ণের স্ত্রী পাবে দেড় অংশ। আর শূদ্র বর্ণের স্ত্রী পাবে এক অংশ।[৪৩]

৮. সম্রাটের জন্য ব্রাহ্মণকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এমনকি সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপরাধে লিপ্ত হলেও। তবে শাসক উপযুক্ত মনে করলে তাকে তার সকল সম্পদসহ তাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাকে কোনোরূপ কষ্ট দেওয়া যাবে না।

৯. শাসকের জন্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে কঠোর আচরণ করা বৈধ নয়। কেননা, এতে তার রাজত্ব বিলীন হয়ে যেতে পারে।[৪৪]

১০. দশ বছরের ব্রাহ্মণ-শিশু অন্য বর্ণের শতবর্ষী ব্যক্তিরও সম্মান পাওয়ার অধিকারী।[৪৫]

দ্বিতীয় শ্রেণি : ক্ষত্রিয়

ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ হলো বীর, ক্ষমতাবান, শাসক প্রভৃতি। এই শ্রেণিটিকে রাজপুতও বলা হয়। এটি মূলত সিন্ধু থেকে আগ্রার প্রবেশদ্বার ও দক্ষিণ পাঞ্জাব থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দিকে সম্বন্ধ করে ডাকা হয়। ভারতের অধিকাংশ রাজা এই রাজপুতদের মধ্য থেকেই ছিলেন। মরু অঞ্চলে বসবাসের কারণে এরা ছিলেন অত্যন্ত শক্তপোক্ত গড়নের। তাদের জীবনযাপন অনেকটা যাযাবর জীবনের মতোই ছিল। যাই হোক, তাদের বিস্তীর্ণ রাজ্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লাহোর, দিল্লি, কনৌজ, অযোধ্যা প্রভৃতি।

চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজপুতগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধ ভারতীয় সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ) বিজয়ের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে।

---

[৪২] মনুস্মৃতি : ১০/১০৩-১০৪।

[৪৩] মনুস্মৃতি : ৯/১৫১-১৫২।

[৪৪] মনুস্মৃতি : ৯/৩১৩।

[৪৫] মনুস্মৃতি : ২/১৩৫।

ভারত বিজয়ের পর আর্যগণ অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসনকল্পে রাজপুতদেরকে সম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত করতে মনস্থ করে। আর তারা নিজেরা মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। মূলত রাজপুতগণ বিশাল বপুর অধিকারী ও শক্তিশালী হলেও তারা ছিল স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন। আর এভাবেই আর্যগণ ভারতে নিজেদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং রাজত্বের স্থায়িত্বকে পাকাপোক্ত করতে সক্ষম হয়। তারা ক্ষত্রিয় বর্ণের লোকদের জন্য ধর্মীয় কিছু নিয়ম বেধে দেয়। এই নিয়মগুলো অনেকটা রাজকীয় কার্যের মতোই। সামনে, পাঠক সমীপে তেমনই কিছু দায়িত্ববিধি তুলে ধরা হচ্ছে—

১. ক্ষত্রিয় বর্ণ থেকেই সম্রাট হবেন।

২. যাদের বিবেক-বুদ্ধি বেদের শিক্ষা দ্বারা পুষ্ট হবে, তারাই মানুষের মাঝে নেতা, সম্রাট, বিচারক ও শাসক হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

৩. কোনো ব্রাহ্মণ ওয়ারিশবিহীন মৃত্যুবরণ করলে সম্রাট তার সম্পদ গ্রহণ করতে পারবেন না। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণির কেউ মৃত্যুকালে ওয়ারিশ রেখে না গেলে সম্রাটের জন্য তার সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ।

৪. সম্রাট চোরের হাত কেটে শূলিতে চড়ানোর নির্দেশ দেবেন।

৫. প্রথমবার চুরির ক্ষেত্রে সম্রাট চোরের আঙুল কর্তনের নির্দেশ দেবেন। সে যদি পুনরায় চুরি করে, তখন তার উভয় হাত ও উভয় পা কর্তনের নির্দেশ দেবেন। তৃতীয়বার চুরি করলে তাকে হত্যার নির্দেশ দেবেন। যে ব্যক্তি চোরকে আশ্রয় দেবে, চোরের খাবার-পানীয় ও পোশাকের ব্যবস্থা করবে, চুরিকৃত সম্পদ সংরক্ষণ করবে, তাকেও চোরের মতোই শাস্তি প্রদান করা হবে।

৬. বিচারকার্যে যে ঘুষ গ্রহণ করবে, তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৭. প্রশাসন বৈশ্যবর্ণের লোকজন থেকে ব্যবসায়িক সম্পদের এক-অষ্টমাংশ এবং কৃষিপণ্যের বিশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করবে।

তৃতীয় শ্রেণি : বৈশ্য

বৈশ্য শব্দের অর্থ হলো কৃষক ও ব্যবসায়ী। বৈশ্য শ্রেণিকে তুরানি বলা হয়। কেননা, এরা মূলত তুরান ও তুর্কিস্তানের বাসিন্দা। হাজার হাজার বছর পূর্বে তারা ভারতে হিজরত করে আসে। এরপর তাদের সঙ্গে স্থানীয় ভারতীয়দের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। তুরানিরা ছিল শক্তিশালী ও যুদ্ধে পারঙ্গম। ফলে একসময় স্থানীয়রা আত্মসমর্পণ করে। আর্যগণ তুরানিদের সঙ্গে মিলিত হয়। তারা সন্ধির মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম পরস্পরের মাঝে বণ্টন করে নেয়। এই বণ্টনে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজের দায়িত্ব পড়ে তুরানিদের

ভাগে। কেননা, তারা এই বিদ্যায় ছিল অধিক পারদর্শী। মনুস্মৃতিতে তাদের জন্য কানুন প্রণয়ন করা হয়। সেসব কানুনের কিছু নিম্নরূপ—

১. বৈশ্য শ্রেণি খেতখামার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চতুষ্পদ পশু প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করবে।[৪৬]

২. বৈশ্য যদি জীবিকা নির্বাহে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তার জন্য শূদ্র শ্রেণির কর্ম যেমন ব্রাহ্মণের সেবা প্রভৃতি কাজ করা বৈধ হবে। আর যদি প্রয়োজন না পড়ে, তাহলে এমন কাজ করবে না।[৪৭]

৩. বৈশ্যের দায়িত্ব বিবাহ সম্পাদনের পর তার জন্য নির্ধারিত কর্ম যেমন চতুষ্পদ জন্তুর প্রতিপালন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে মনোনিবেশ করা। কেননা, সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা সৃষ্টিকালে যেভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তদ্রূপ বৈশ্যকেও চতুষ্পদ জন্তুর প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

৪. বৈশ্যের জন্য মণিমুক্তা, খনিজ সম্পদ, কাপড়, সুগন্ধি প্রভৃতির মূল্য জানা আবশ্যক।

৫. একইভাবে বীজবপন, জমির উপযুক্ততা নির্ণয়, মাপজোক প্রভৃতিতে পারদর্শী হওয়া তার ওপর আবশ্যক।

৬. সর্বোপরি, তার ওপর সুগন্ধি দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয়, রাষ্ট্রীয় অবস্থা, ব্যবসায়িক লাভ-লোকসান এবং চতুষ্পদ জন্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রতিপালন সম্পর্কে অবগত হওয়া কর্তব্য।

৭. একইভাবে তার জন্য বিভিন্ন ভাষা, ব্যবসার নানা পথ ও পদ্ধতি, বেচাকেনার মূলনীতি সম্পর্কে অবগত হওয়াও জরুরি।

৮. বৈশ্যের দায়িত্ব হচ্ছে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে তার সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা এবং সৃষ্টিকুলের খাদ্যের সংস্থান করা ইত্যাদি।

চতুর্থ শ্রেণি : শূদ্র

শূদ্র অর্থ হলো দলিত, ঘৃণ্য ও নীচ। এই শ্রেণিটি মূল ভারতীয় ও তুরানি বংশোদ্ভূত। হাজার বছর যাবত তারা আর্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা আত্মসমর্পণ

---

[৪৬] মনুস্মৃতি : ৯/৩২৭।
[৪৭] মনুস্মৃতি : ১০/৯৮।

করে এবং আর্যদের বন্দিতে পরিণত হয়। আর্যরা তাদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন করে। নির্যাতনের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষেরা পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেয়। অনেকেই আবার উত্তর ভারতের দিকে পালিয়ে যায়। আর্যগণ তাদের অন্তর থেকে স্বাধীনতার চেতনা ও সম্মানের জীবনযাপনের চিন্তা মুছে দিতে সক্ষম হয়। এরপর তারা তাদের জন্য মনুশাস্ত্রে দায়িত্ব ও কর্মপরিধি নির্ধারণ করে দেয়। দক্ষিণ ভারতে আর্যদের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের যুদ্ধ অদ্যাবধি চলমান।

সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আর্যদের প্রতি তাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের কিছু চিত্র আমি তুলে ধরবো। এ পর্যায়ে আমি মনুস্মৃতির আলোকে শূদ্র শ্রেণির দায়িত্ব ও কর্মপরিধি সম্পর্কে আলোকপাত করছি।

১. চণ্ডাল (শূদ্র) শ্রেণির বাসস্থান হবে গ্রামের বাইরে। তারা মাটির পাত্র ব্যবহার করবে। কুকুর এবং গাধা হবে তাদের সম্পদ। তাদের পরিধেয় হবে মৃতের পোশাক। তাদের অলংকার হবে লোহার। তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করবে না। তাদের লেনদেন নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। রাতে শহর বা গ্রামে তাদেরকে ঘোরাঘুরি করতে দেওয়া যাবে না।[৪৮]

২. ধনসম্পদ অর্জনে সমর্থ হলেও শূদ্রকে কিছুতেই ধন সঞ্চয় করতে দেওয়া যাবে না। কেননা, এতে ব্রাহ্মণদের মনে দুঃখ হয়।[৪৯]

৩. ব্রাহ্মণের সেবা করে শূদ্র যদি স্বীয় জীবিকা না পায়, সেক্ষেত্রে তার জন্য ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যের সেবা করা বৈধ। কিন্তু উত্তম হলো, ব্রাহ্মণের সেবায় নিয়োজিত থেকে ধৈর্যধারণ করা। এতে সে স্বর্গ লাভ করবে। কেননা, এটাই তার সর্বোত্তম কাজ। ধর্মীয় বিষয়ে নাক গলানোর অধিকার তার নেই।[৫০]

৪. ব্রাহ্মণের সেবা শূদ্রকে স্বর্গে পৌঁছে দেয়।[৫১]

৫. যে শূদ্র কোনো ব্রাহ্মণের অধীনে থাকে, পরবর্তী জন্মে সে উঁচু শ্রেণির হয়ে জন্ম লাভ করে।[৫২]

৬. যে শূদ্র কোনো ব্রাহ্মণ থেকে প্রতিশোধ নিতে চায়, তাকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে এবং তার ওপর কঠিন শাস্তি আরোপ করা হবে।[৫৩]

---

[৪৮] মনুস্মৃতি : ১০/৫১-৫৪।
[৪৯] মনুস্মৃতি : ১০/১২৯।
[৫০] মনুস্মৃতি :১০/ ১২১,১২২,১২৪।
[৫১] মনুস্মৃতি : ৯/৩৩৪।
[৫২] মনুস্মৃতি : ৯/৩৩৫।

৭. শূদ্র স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেওয়া ব্রাহ্মণের সন্তান উত্তরাধিকার সম্পত্তির অধিকারী হবে না।[৫৪]

৮. ঈশ্বর শূদ্রকে একটাই নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হলো, অপর তিন শ্রেণির সেবা করা এবং এতে তার মনে কোনো ধরনের সংকীর্ণতা না থাকা চাই।[৫৫]

এই হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শ্রেণি চতুষ্টয়ের দায়িত্ব ও কর্মপরিধির কিছু বর্ণনা। এখান থেকে একজন পাঠক সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, শূদ্র শ্রেণির ওপর হিন্দুধর্ম কী পরিমাণ জুলুম-নির্যাতন করেছে। অথচ এই শূদ্র শ্রেণিই হলো ভারতের মূল বাসিন্দা। এরাই আর্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তাদের সামনে শত শত বছর ধরে মজবুত প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শেষ অবধি তারা পরাজিত হয়ে আর্যদের হাতে নিপতিত হয়েছে। তাদের সঙ্গে করা হয়েছে নিকৃষ্টতম আচরণ। বীরত্ব সত্ত্বেও তাদেরকে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

এই শ্রেণিপ্রথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আজও বিদ্যমান। অতীতে এই নিপীড়িত জাতির সঙ্গে তুমুল দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ হয়েছে।

এখানে আমার স্মৃতি থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ঘটনাটি ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের। তখন এই শূদ্র শ্রেণির নেতৃত্বে ছিলেন ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। তিনি ছিলেন একজন আইনবিদ এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান রচয়িতা। দীর্ঘ গবেষণা ও যাচাই-বাছাইয়ের পর তিনি অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলামধর্ম দ্বারা অধিক প্রভাবিত হন। এমনকি দিল্লি সম্মেলনে তিনি 'কেন আমরা হিন্দুধর্ম থেকে বেরিয়ে যেতে আহ্বান করি?' শিরোনামের বক্তৃতায় শূদ্র শ্রেণিকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

'হিন্দু সমাজ তোমাদেরকে চরম শত্রু মনে করে। তোমরা তাদের দৃষ্টিতে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট।'

তিনি আরও বলেন, 'পৃথিবীর বুকে ইসলামের চেয়ে উত্তম কোনো ধর্ম নেই। কিন্তু মুসলিমরা তাদের এই ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করে বহু দলে বিভক্ত করে রেখেছে। এই দলগুলো পরস্পর পরস্পরকে বিধর্মী ও কাফির বলেও অভিহিত করে থাকে। তাই ইসলামধর্মে প্রবেশ করে আমাদের তেমন একটা লাভ হবে না। কেননা, ইসলামে প্রবেশ করার পরও আমরা তাদের দৃষ্টিতে কাফিরই থেকে যাবো।'

---

[৫৩] মনুস্মৃতি : ৯/২৪৮।
[৫৪] মনুস্মৃতি : ৯/১৫৫।
[৫৫] মনুস্মৃতি : ১/৯১।

অতঃপর তিনি তার অনুসারীদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু এতে তাদের কী অর্জন হলো? বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করেও তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য তথা ইজ্জত, সম্মান ও মানবতা অর্জন করতে পারলেন না। তাই তো পরবর্তী সময়ে তাদের একটি দল ইসলামে দীক্ষিত হন।

দলিত শ্রেণির ইসলামে প্রবেশ

গত শতাব্দীর আশির দশকের গোড়ার দিকে তামিলনাড়ু প্রদেশের দলিত শ্রেণির একদল মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হন। এতে করে হিন্দু পরিমণ্ডলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। পাঠক সমীপে আমি এই ঘটনার কিছু দিক তুলে ধরছি।

তামিলনাড়ুর ভৌগোলিক অবস্থান

তামিলনাড়ু প্রদেশটি দক্ষিণ ভারতের সীমান্তে অবস্থিত।

জনসংখ্যা

তামিলনাড়ুর মোট জনসংখ্যা চার কোটি আশি লক্ষ (৪,৮০,০০,০০০)।

মুসলিম জনসংখ্যা

ত্রিশ লক্ষ (৩০,০০,০০০)।

খ্রিস্টান জনসংখ্যা

বত্রিশ লক্ষ (৩২,০০,০০০)।

এছাড়া অবশিষ্ট জনগণ হিন্দু। তন্মধ্যে এক কোটি (১,০০,০০,০০০) দলিত শ্রেণির মানুষ।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রামা স্বামী নটকর (RAMASWAMI NATAKER) দলিত শ্রেণির মাঝে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই সংস্কার কার্যক্রমকে সামনে রেখে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন দ্রাবিড় কাজগম (DRAWID KAZGHAM) নামক সংস্থা। এই মানুষটির প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। দলিত শ্রেণির অনেকেই খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে অধ্যয়ন করতে শুরু করে। তাদের অনেকেই খ্রিষ্ট ও বৌদ্ধধর্মের চেয়ে ইসলাম ধর্মে এ কারণে প্রভাবিত হন যে, এতে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া আছে। একইভাবে ইসলাম-ধর্মে সকল মানুষের মাঝে

সমতার দৃষ্টিভঙ্গিটিও তাদেরকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। তবে সে সময় তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেননি। পূর্ববর্তী কয়েক বছর আলিম-উলামা ও দাঈগণ ব্যাপক-আকারে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ শুরু করেন। তারা শত শত ইসলামি বই তামিল ভাষায় অনুবাদ করেন। ফলে লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেন। তাদের এই ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়।

এখানে আমরা সে সময়কার ভারতীয় বিভিন্ন পত্রিকা থেকে কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি।

এক. তামিল পত্রপত্রিকা

দৈনিক দিনা মালার পত্রিকায় ২৯/০৬/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে 'মিনাক্ষিপুর[৫৬] থেকে আমরা কি শিক্ষা পেয়েছি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। সেখানে বলা হয়, 'মিনাক্ষিপুরের মোট জনসংখ্যা ৯৪৫ জন। তন্মধ্যে ৫৫৮ জন ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। মুসলিম হওয়া এসব লোকজন শিক্ষাদীক্ষায় অন্যদের চেয়ে বেশ উঁচু পর্যায়ের। তাদের মধ্যে রয়েছে দুজন ডাক্তার, একজন প্রকৌশলী এবং বেশ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ১৯/০২/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে তারা নিজেদের গ্রামের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করে 'রহমত-নগর'। তাদেরকে বলা হলো: ভারতীয় সরকার তাদের সকল সুযোগ সুবিধা রহিত করবে। তখন তারা একবাক্যে জবাব দিলো: আমরা ইসলামে প্রবেশ করেছি সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য। রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করতে আমরা প্রস্তুত আছি।'

একই পত্রিকা ২৫/০৬/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে লেখে, 'সরকারের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ঘোষণা দিয়েছেন যে, সরকার দলিত শ্রেণির এসব লোককে ইসলাম গ্রহণের পর তাদেরকে প্রদত্ত সকল নাগরিক সুবিধা রহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সকল সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে ফ্রি শিক্ষা, উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি, ফ্রি পাঠ্যপুস্তক ও সরকারি চাকুরিতে ১৮% কোটা প্রভৃতি। একইভাবে সরকার তাদেরকে কৃষি ও ঘরনির্মাণের জন্য ঋণ প্রদান করতো। ইসলাম গ্রহণের কারণে তারা এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।'

পত্রিকাটি ২৭/০৬/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে কয়েকজন নও মুসলিমের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। এসব নও মুসলিমদের মধ্যে ছিলেন আহমদ নামক এক ব্যক্তি। তিনি বলেন, গতকাল পর্যন্ত আমি মুরগানের (MURUGAN) পূজা করতাম। আর আজকে আমি এক আল্লাহর ইবাদত করি, যার কোনো শরিক নেই। তাঁর হাতেই জীবন-মরণ। আমি

[৫৬] মিনাক্ষিপুর দক্ষিণ ভারতের প্রান্তবর্তী একটি গ্রাম। এখানকার অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন।—অনুবাদক

মসজিদে যাতায়াত করি। মুসলিমদের সঙ্গে নামাজ আদায় করি। আমার পরিবারের আর কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি। আর আমিও কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছি না।

পত্রিকাটি এটাও লিখেছে যে, 'ইসলামে প্রবেশকারীগণ তাদের অনেক সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন করে নিয়েছেন।'

সাক্ষাৎকারে একজন নও মুসলিম অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ভারতীয় সরকারের মিথ্যা প্রোপাগান্ডার সমালোচনা করেন। কেননা, সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছিল যে, তারা পার্থিব স্বার্থ ও অর্থ-বিত্তের লোভে ইসলাম গ্রহণ করেছে। নও মুসলিম লোকটি বলেন, কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে, আমি ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন করেছি, তাহলে আমাকে যাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, ভারতের জনগণ যদি নিরাপদ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে তাদের উচিত ইসলাম অনুযায়ী আমল করা।

এই হলো তামিল পত্রিকাগুলো থেকে চয়ন করা কিছু অংশ।

দুই. উর্দু পত্রপত্রিকা

উর্দু পত্রিকা 'প্রতাপ'। এর দায়িত্বে ছিলেন একজন কট্টর হিন্দু। দলিত শ্রেণির লোকজন ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে লোকটি ইসলামি রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে নানান আষাঢ়ে গল্প বানিয়ে প্রচার করতে থাকে। এই পত্রিকাটি থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ আমি এখানে তুলে ধরছি।

০২/০৬/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে পত্রিকাটি লেখে, 'দলিত শ্রেণির ইসলাম গ্রহণ হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ষড়যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। আর্য সমাজের তিনজন নেতা দলিত শ্রেণির মাঝে ইসলামের প্রচার-প্রসার বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ভারতীয় সরকারের কাছে দাবি জানায়। অন্যথায় আর্য সমাজ এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেবে। তারা দক্ষিণ ভারতে নও মুসলিমদের শিক্ষাদীক্ষার কাজে নিয়োজিত একটি শিক্ষাকেন্দ্রও বন্ধ করার আহ্বান জানান।'

পত্রিকাটি ২৩/০৫/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে 'মিনাক্ষিপুরে যা ঘটেছিল' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সেখানে পত্রিকাটি লেখে, 'মিনাক্ষিপুরে দলিত শ্রেণির ইসলাম-গ্রহণে হিন্দুদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুদের একটি দল এসব নও মুসলিমদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সেখানে যান। প্রতিনিধিদলের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, এদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক ষড়যন্ত্র কাজ করছে। তারা আরও বলেন, এদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য আরব-বিশ্ব প্রচুর পরিমাণে

অর্থ খরচ করে। তারা এটাও ব্যক্ত করেন যে, আমরা হাজার হাজার হিন্দু নারীদেরকে সেবিকার ভিসা নিয়ে আরব রাষ্ট্রগুলোতে যেতে দেখি। অচিরেই এরাও ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

'হিন্দুদের এখনই সতর্ক হতে হবে' শিরোনামে পত্রিকাটি ১৫/০৬/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে একটি আর্টিকেল ছাপে। সেখানে পত্রিকাটি হিন্দুদেরকে আহ্বান জানায় দলিত শ্রেণিকে ঘৃণা না করতে। নতুবা তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে।

এই হলো *প্রতাপ* পত্রিকাটির মিথ্যাচারের কিছু নমুনা। এর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করা। সকাল-সন্ধ্যা যেকোনো সময়ে এই ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বিরাজমান ছিল।

আল-হায়াত নামক আরেকটি পত্রিকা ২১/০৬/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে 'দলিত শ্রেণির ইসলাম গ্রহণে কেন এই চাঞ্চল্য' শিরোনামে সংবাদ পরিবেশন করে। পত্রিকাটি লেখে, 'ভারতে দলিত শ্রেণির জীবন কি পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট ছিল না? স্বাধীনতার পর থেকে ভারত সরকার এদের উন্নয়নের জন্য কী করেছে? নিপীড়িত এই লোকগুলো যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন কেন তাদেরকে নিয়ে এত চেঁচামেচি ও হই-হুল্লোড়?'

ভারতের একটি ইসলামি সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা *আদ-দাওয়াহ* 'হিন্দুদের জুলুমের পর দলিতদের ইসলাম গ্রহণ' শিরোনামে লেখে, 'তারা তাদের শহরের নাম মিনাক্ষিপুর পরিবর্তন করে 'রহমত-নগর' নামকরণ করে। আর্য সমাজ এদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যাপক হামলা চালায়।'

তিন. ইংরেজি পত্রপত্রিকা

মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* (INDIAN EXPRESS) পত্রিকার প্রতিনিধি যেসব স্থানে ইসলাম গ্রহণের পরিমাণ বেশি, সেসব অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। ১৭/০৬/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে পত্রিকাটি ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু দীর্ঘ ও সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিনিধির লিখিত প্রতিবেদনের সারাংশ আমি পাঠক সমীপে তুলে ধরছি—

১. যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছেন যে, তারা কোনোরূপ বাধ্য হয়ে কিংবা আর্থিক প্রলোভনে ইসলাম গ্রহণ করেননি। তারা বলেছেন, আমরা সন্তুষ্টচিত্তে নিজ আগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমরা এ কথার উপর আশ্বস্ত হয়েছি যে, ইসলাম সত্যধর্ম। এটি মানবতাকে বিভিন্ন ধর্মের জুলুম থেকে মুক্তি দিয়ে ইনসাফের ছায়াতলে নিয়ে আসে। বহু উপাস্য থেকে মুক্তি দিয়ে

এক আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত করে। ইসলামে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। এখানে মর্যাদা নির্ধারিত হয় তাকওয়ার ভিত্তিতে।

২. প্রতিনিধি আরও বলেন, মুসলিমরা নও মুসলিমদেরকে সাদরে আমন্ত্রণ জানান। এর ফলে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি রাতারাতি পাল্টে যায়। এদিকে হিন্দুদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ অঞ্চলের সকল মানুষ অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে। আগামী দিনগুলোতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কাউকেই আর পাওয়া যাবে না।

৩. প্রতিনিধি আরও বলেন, অন্যান্য হিন্দুগণও ইসলাম গ্রহণকারী তাদের ভাইদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের অবস্থার পরিবর্তন দেখলে এরাও শীঘ্রই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে।

৪. অনেক হিন্দু নেতা অভিযোগ করেছেন, এরা মূলত লোভের বশবর্তী হয়ে কিংবা প্রাণভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু পত্রিকার প্রতিনিধি নেতাদের এই অভিযোগের সঙ্গে একমত পোষণ করতে পারেননি।

৫. একই পত্রিকা ২১/০৬/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ ও ২৩/০৬/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে লেখে যে, বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন এসব নও মুসলিমদেরকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নানান পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে।

৬. ৩০/০৬/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে পত্রিকাটি লেখে, 'তামিলনাড়ুর ঘটনাটি দলিত শ্রেণির প্রতি হিন্দুদের নির্যাতনের ফসল। সাইয়েদ বিলু নামক একজন দলিত নেতা ঘোষণা দিয়েছেন যে, দলিত সম্প্রদায়ের পঞ্চাশ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। কেননা, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা তাদেরকে হিন্দুধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে পারে।'

৭. পত্রিকাটির প্রতিনিধি বলেন, আমি সবখানে হিন্দুদের প্রতি দলিত শ্রেণির প্রবল ক্ষোভ ও ঘৃণা দেখতে পেয়েছি। প্রত্যেকেই ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। ধারণা করা হচ্ছে, তাদের নেতৃবৃন্দ জেল থেকে মুক্তি পেলেই তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবেন।

তাছাড়া কলকাতা থেকে প্রকাশিত *সানডে* (SUNDAY) পত্রিকা ০৭/০৬/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে তামিলনাড়ুতে ইসলামের প্রচার বিষয়ে একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রবন্ধটিতে তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণ বর্ণনা করা হয়।

হিন্দুস্তান টাইমস (HINDUSTAN TIMES) ০৫/০৫/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে পত্রিকায় লেখে, 'আর্যসমাজ দাবি করে যে, মুসলিমরা দলিত শ্রেণিকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে। কিন্তু সরকার তাদের এই দাবির কোনো সত্যতা খুঁজে পায়নি।'

পত্রিকাটি আরও লেখে, 'সরকার এখন পর্যন্ত দলিতদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার কোনো প্রমাণ পায়নি।'

পত্রিকাটি লেখে, 'নও মুসলিমগণ নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। তথাপি তারা আশাবাদী যে, তারা না পারলেও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ইসলামের নিয়ামত ভোগ করতে পারবে।'

এই হলো ভারতীয় পত্রপত্রিকার প্রকাশিত ঘটনাবলির যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ।

হিন্দুরা রাজধানী দিল্লিতে ১৮/০৯/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে একটি হিন্দু সমাবেশের ডাক দেয়। সেখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এক লক্ষেরও বেশি হিন্দু একত্রিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্র সরকারের সাবেক মন্ত্রী করণ সিং।

সমাবেশের সূচনাতে তিনি বলেন, হিন্দুদের অন্যান্য ধর্ম, বিশেষ করে ইসলামে প্রবেশ করা অচিরেই নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করবে। তিনি তার বক্তব্যে স্বীকার করেন যে, হিন্দুধর্মে দলিত সম্প্রদায়ের মানবিক কোনো অধিকার স্বীকৃত নয়। এ কারণে তিনি আক্ষেপও করেন। এরপরও তিনি সকল বিভেদ ভুলে হিন্দুদেরকে একতাবদ্ধ হতে আহ্বান করেন এবং হিন্দু সমাজে ব্যাপক সংস্কারের আহ্বান জানান।[৫৭]

দলিত সম্প্রদায়ের নেতা জগজ্জীবন রাম দাবি করেন, ভারত সরকার কট্টরপন্থি হিন্দু সংগঠন আরএসএস-কে এই বিশাল সমাবেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি ইসলামে প্রবেশের দ্বারা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না। তথাপি তারা হিন্দু সমাজের একচ্ছত্র জুলুম থেকে নিষ্কৃতি পাবে।[৫৮]

আমার বক্তব্য হলো, এই সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য হলো, হিন্দুত্ববাদের জাগরণ ও তাদের হেফাজত করা এবং ভারত উপমহাদেশে হিন্দুধর্মের ওপর ইসলাম-ধর্মের ভয়াবহতা সম্পর্কে হিন্দুদেরকে অবহিত করা। সমাবেশটিকে তার উদ্দেশ্যের দিক থেকে সফলই বলা চলে। কেননা, সমাবেশ-পরবর্তী বেশ কিছু কট্টরপন্থি হিন্দু সংগঠন সৃষ্টি হয়। সংগঠনগুলো যেসব অঞ্চলে দলিত শ্রেণির লোকজন ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে, সেসব অঞ্চলে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বড় সমাবেশটি ঘটে হিন্দু পুরোহিতদের ডাকে। তারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে ইসলামের বিরুদ্ধে হামলার ডাক দেন। প্রায় তিন হাজারেরও অধিক পুরোহিত এই আহ্বানে সাড়া দেন। ধারণা করা হচ্ছে, সামনে এই সংখ্যা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

---

[৫৭] *দৈনিক আদ-দাওয়াহ,* ২০/০৯/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ।
[৫৮] *দৈনিক আদ-দাওয়াহ,* ২০/০৯/১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ।

সংঘবদ্ধ এই দলটি পুরোহিত বেশে ভারতের বড় বড় শহরগুলো প্রদক্ষিণ করবে। তারা দলিত শ্রেণিকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেবে। দলিত শ্রেণির মনোতুষ্টির জন্য এ সকল পুরোহিত তাদের ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবেন। এতে করে তাদের মাঝে মানবতাবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধের উদয় হবে।

এসব বিষয়কে সামনে রেখে মুসলিমদের কর্তব্য হলো, দলিত শ্রেণিকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা।

হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় বিধিবিধান

(হিন্দু ধর্মাবলম্বীর জীবনের চার স্তরের বিধান)

হিন্দুধর্ম মানুষকে বয়স বিবেচনায় চারটি স্তরে ভাগ করেছে। প্রত্যেকটি স্তরের জন্য নির্দিষ্ট বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে। এই চারটি স্তরের প্রতিটি স্তর পঁচিশ বছর করে। কেননা, তাদের মতে মানুষের সাধারণ বয়স একশত বছর।

মনু তার সংহিতায় বলেন, এখন আমরা সন্ন্যাসব্রতের বিধিবিধান উল্লেখ করবো। তারা চার শ্রেণি, প্রথম শ্রেণি : ব্রহ্মাচার্য আশ্রম অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষার যুগ। দ্বিতীয় শ্রেণি : গার্হস্থ্য আশ্রম অর্থাৎ পারিবারিক জীবনকাল। তৃতীয় শ্রেণি : সন্ন্যাস আশ্রম অর্থাৎ দৈহিক ও আত্মিক দীক্ষার যুগ। চতুর্থ শ্রেণি : বাণপ্রস্ত আশ্রম অর্থাৎ পুরোহিত জীবন।

এরপর তিনি বলেন, এই প্রকারভেদের প্রত্যেকটি পারিবারিক জীবনকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেভাবে সকল নদী সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়, একইভাবে এই প্রকারগুলোর প্রত্যেকটি গার্হস্থ্য আশ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।[৫৯]

এ পর্যায়ে পাঠক সমীপে আমরা প্রত্যেকটি শ্রেণির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

প্রথম স্তর : ব্রহ্মাচার্য আশ্রম বা জ্ঞান অর্জনের স্তর

এই স্তরটির ব্যাপ্তি হলো আট থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত। এই স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুগন্ধি ব্যবহার, বাহ্যিক সাজসজ্জা গ্রহণ ও নারীসঙ্গ থেকে দূরে থাকা।

স্বামী দয়ানন্দ বলেন, ব্রহ্মাচার্য স্তরে কোনো শিষ্য যদি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তার কর্তব্য হলো স্ত্রীর নিকটবর্তী না হওয়া এবং তার সঙ্গে রাতযাপন না করা।[৬০]

---

[৫৯] অধ্যায় : ৬, শ্লোক : ৯০-৯৪।

[৬০] যথার্থ প্রকাশ, অধ্যায় : ৩, পৃষ্ঠা : ৬৮।

মনু বলেন, 'প্রথম স্তরে শিষ্যের প্রথম কাজ হলো, মাতা কিংবা ভগ্নী কিংবা মাসি অথবা এমন কোনো নারীর কাছে ভিক্ষা করা, যে তাকে ফিরিয়ে দেবে না।'[৬১]

'তার কর্তব্য হলো দিনে একবার আহার করা।'[৬২]

'অধ্যয়নের শুরুতে এবং শেষে শিষ্য তার গুরুকে প্রণাম করবে। এরপর তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, যেভাবে পূজারি ঈশ্বরের সামনে দণ্ডায়মান হয়। গুরু অনুমতি দিলে তবেই প্রস্থান করবে।'[৬৩]

'শিষ্যের ওপর অত্যাবশ্যক কর্তব্য হলো, সকল কামনার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করা। গুরুর ঘরে রাতযাপন করা। প্রতিদিন গোসল-পূর্বক দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রদান করা।'[৬৪]

'শিষ্যের জন্য বৈধ নয় মদপান করা, মাংস ভক্ষণ করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, নারীসঙ্গ লাভ করা, জীব হত্যা করা ইত্যাদি। একইভাবে তার ওপর নিষিদ্ধ কোনো নারীর দিকে কামাসক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করা, যাতে তার বীর্য সংরক্ষণ করতে পারে, এমনকি ঘুমের মধ্যে হলেও। এ সকল প্রচেষ্টার পরও যদি তার স্বপ্নদোষ হয়, তখন তার কর্তব্য হবে, গোসল করে দীর্ঘ সময়ব্যাপী সূর্যের পূজা করা।'[৬৫]

'শিষ্যের কর্তব্য হলো, যেসব পরিবার বেদের শিক্ষার প্রতিপালন করে, শুধু সেসব পরিবারের কাছে ভিক্ষা চাওয়া। তার নিজ পরিবার এবং তার গুরুর পরিবারের কাছে ভিক্ষা চাওয়া থেকে বিশেষভাবে নিবৃত্ত থাকা। তবে সে যদি তাকে দান করার মতো কাউকে না পায়, সেক্ষেত্রে এদের কাছ থেকে ভিক্ষা করতে কোনো বাধা নেই।'[৬৬]

'যে শিষ্য তার গুরুর সমালোচনা শ্রবণ করবে, পরবর্তী জন্মে সে গাধা হয়ে জন্মাবে। আর যে গুরুর সমালোচনা করবে, সে শয়তানের আকৃতিতে জন্ম নেবে। আর যে গুরুর সম্পদ নষ্ট করবে, সে কীটপতঙ্গ হয়ে জন্ম নেবে।'[৬৭]

'গুরুর সম্মানার্থে শিষ্যের জন্য বৈধ নয় তার গুরুর সঙ্গে বাহনে, চাটাইয়ে, চেয়ারে বসা কিংবা নৌকায় আরোহণ করা।'[৬৮]

---

[৬১] মনুস্মৃতি : ২/৫০।
[৬২] মনুস্মৃতি : ২/৫৫।
[৬৩] মনুস্মৃতি : ৩/৭১।
[৬৪] মনুস্মৃতি : ২/১৭৫-১৭৬।
[৬৫] মনুস্মৃতি : ২/১৭৭-১৮২।
[৬৬] মনুস্মৃতি : ২/১৮৩-১৮৪।
[৬৭] মনুস্মৃতি : ২/২০১।

'শিষ্য সূর্যোদয়ের আগে নিদ্রা ত্যাগ করতে না পারলে তার জন্য সে-দিন উপবাস করা ও সূর্যের জপ করা আবশ্যক। একইভাবে তার অজান্তে যদি সূর্য অস্ত যায়, তাহলে পরের দিনও উপবাস করা কর্তব্য। কেননা, ঘুম ও অসতর্কতা অবস্থায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অতিবাহিত হওয়ায় তার বিরাট পাপ হয়েছে। তার ওপর আবশ্যক ছিল এ সময়ে সূর্যের পূজা করা।'[৬৯]

'শিষ্যের কর্তব্য হলো, বেদের শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য ছত্রিশ বছর গুরুর সেবায় নিয়োজিত থাকা। সম্ভব না হলে আঠারো বছর কিংবা কমপক্ষে নয় বছর সেবা করা। এরপর সে জীবনের দ্বিতীয় স্তর তথা পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করবে।'[৭০]

মনু প্রথম স্তরে শিষ্যের জন্য পালনীয় বিধিবিধান বর্ণনার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বলেন, 'ব্রহ্মাচার্য স্তরে যে এই বিধিবিধান ও শিষ্টাচার মেনে চলবে, সে স্বর্গ লাভ করবে। এই পৃথিবীতে সে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন করবে না।'[৭১]

মনুসংহিতায় বর্ণিত বিধিবিধান এখানেই শেষ। একটি উপনিষদে বলা হয়েছে শিক্ষা-দীক্ষাকাল তিন প্রকার। প্রথম প্রকার চব্বিশ বছর বয়সে সমাপ্ত হয়। এটাকে বলা হয় কনিষ্ঠ ব্রহ্মাচার্য। দ্বিতীয় প্রকার চুয়াল্লিশ বছর বয়সে সমাপ্ত হয়। এটাকে বলা হয় মধ্যম ব্রহ্মাচার্য। তৃতীয় প্রকার আটচল্লিশ বছর বয়সে সমাপ্ত হয়। এটাকে বলা হয় উত্তম ব্রহ্মাচার্য।[৭২]

স্বামী দয়ানন্দ বলেন, 'বিবাহের উপযুক্ত বয়স হলো চল্লিশের পর। কেননা, তখন দেহের সুপ্ত শক্তি পূর্ণতা লাভ করে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত হয়। একজন জ্ঞানান্বেষীর জন্য এই সময়টি জ্ঞানার্জনে ব্যয় করা এবং ব্রহ্মাচার্য জীবনযাপন করা উচিত।'[৭৩]

ব্রহ্মাচার্য জীবনে পুরুষ ও নারী সমান কিনা? এমন প্রশ্নের জবাবে দয়ানন্দ বলেন, না, সমান নয়। পুরুষের পঁচিশ বছরের বিপরীতে নারীর জন্য ষোলো বছর নির্ধারিত হবে। পুরুষের ত্রিশ বছরের বিপরীতে নারীর সতেরো বছর নির্ধারিত হবে। পুরুষের ছত্রিশ বছরের বিপরীতে নারীর আঠারো বছর নির্ধারিত হবে। পুরুষের চল্লিশ বছরের বিপরীতে নারীর বিশ বছর নির্ধারিত হবে। পুরুষের চুয়াল্লিশ বছরের বিপরীতে নারীর বাইশ বছর

---

[৬৮] মনুস্মৃতি : ২/২০৩-২০৪।
[৬৯] মনুস্মৃতি : ২/২২০।
[৭০] মনুস্মৃতি : ৩/১-২।
[৭১] মনুস্মৃতি : ২/২৪৯।
[৭২] ছান্দোগ্য উপনিষদ : ৩/১৬।
[৭৩] *যথার্থ প্রকাশ*, অধ্যায় : ৩, পৃষ্ঠা : ৭০।

নির্ধারিত হবে। পুরুষের আটচল্লিশ বছরের বিপরীতে নারীর চব্বিশ বছর নির্ধারিত হবে। এরপর ব্রহ্মাচার্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে।[৭৪]

ভারতীয় নেতা গান্ধিজি তার পুরো জীবন ব্রহ্মাচার্যে অতিবাহিত করাকে প্রাধান্য দেন। এ সময় যদি সে বিবাহ করে, তাহলে তাদের উচিত ভাইবোনের মতো জীবনযাপন করা। স্বামী-স্ত্রী সুলভ আচরণে থেকে বিরত থাকা।

দ্বিতীয় স্তর : গার্হস্থ্য আশ্রম তথা পারিবারিক জীবন

হিন্দুধর্ম তার সামাজিক কাঠামোতে পারিবারিক জীবনের চেয়ে সন্ন্যাসব্রত পালনের প্রতি অধিক উৎসাহী। কেননা, হিন্দু পুরোহিতগণ সর্বদা পার্থিব জীবনের নিন্দা করে থাকেন। অনুসারীগণকে পার্থিবতাকে ত্যাগ করতে উৎসাহ দেন। হিন্দু পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্মের জন্য ভবিষ্যতে এই সন্ন্যাসবাদের ভয়াবহতা আঁচ করতে সক্ষম হন। তারা পারিবারিক জীবনের পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করেন। প্রথম যিনি এই স্তরকে অন্যান্য স্তরের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, তিনি হলেন মনু। মনুসংহিতায় তিনি বলেন, 'গার্হস্থ্য আশ্রম স্তরটি অন্যান্য সকল স্তর থেকে উত্তম।'[৭৫]

এই স্তরে হিন্দুদের আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো বিয়ে করা এবং নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য জীবিকা নির্বাহের কাজে মনোনিবেশ করা।

তৃতীয় স্তর : বান আশ্রম তথা দৈহিক ও আত্মিক দীক্ষার যুগ

মনু বলেন, 'যখন মানুষ বার্ধক্যে পৌঁছুবে, চুল সাদা হয়ে যাবে, চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়বে, নাতি-নাতনি জন্ম গ্রহণ করবে, তখন তার কর্তব্য হলো পার্থিব জীবন ত্যাগ করে বনবাসে চলে যাওয়া। তার স্ত্রী চাইলে তার সঙ্গে যেতে পারে। নতুবা স্ত্রী তার সন্তানদের সঙ্গেই থাকবে। সে জমিন থেকে উৎপদিত ফল-ফলাদির ওপর আপন পানাহার গ্রহণ করবে। হরিণের চামড়া পরিধান করবে। প্রতিদিন গোসল করবে। মাথার চুল রেখে দেবে। দাড়ি-গোঁফ রেখে দেবে। নখ কাটবে না।'[৭৬]

'শারীরিক বিশ্রামের দিকে লক্ষ করবে না। বৈরাগী জীবনযাপন করবে অর্থাৎ স্ত্রী থাকলেও তার নিকটবর্তী না হওয়া। জমিনের ওপর ঘুমানো। গাছের গোড়াকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করা। গাছের ছায়ায় ছায়া গ্রহণ করা।'[৭৭]

---

[৭৪] *যথার্থ প্রকাশ*, অধ্যায় : ৩, পৃষ্ঠা : ৭০।
[৭৫] মনুস্মৃতি : ৩/৭৮।
[৭৬] মনুস্মৃতি : ৬/২,৬।
[৭৭] মনুস্মৃতি : ৬/৮,২৬।

'সে ভূমি থেকে উৎপন্ন শাক-সবজি ও ফল-ফুলের ওপর জীবনধারণ করবে। আর মাংস ও মদ থেকে বিরত থাকবে।'[৭৮]

'খেতখামারে উৎপাদিত দানাদার খাবার গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ নয়, এমনকি ক্ষুধার্থ হলেও।'[৭৯]

'একদিন আহার গ্রহণ করবে, অন্যদিন উপবাস করবে। অথবা একদিন আহার গ্রহণ করবে, দুইদিন উপবাস করবে। অথবা একদিন আহার গ্রহণ করবে, তিনদিন উপবাস করবে।'[৮০]

'জমিনে চিত হয়ে শয়ন করবে নতুবা পায়ের অগ্রভাগের ওপর ভর দিয়ে দিনভর দাঁড়িয়ে থাকবে।'[৮১]

'প্রচণ্ড গরম সহ্য করবে। সূর্যের দাবদাহে বসে থাকবে। বৃষ্টির দিনে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান নিবে। শীতকালে ভেজা কাপড় জড়িয়ে রাখবে। এভাবেই নিজ দেহকে শাস্তি দিয়ে দমিয়ে রাখবে।'[৮২]

তিনি (মনু) বলেন, 'এভাবেই সে তার জীবনের তৃতীয় স্তর অতিবাহিত করবে, যে স্তরটির পঞ্চাশ বছর বয়সে শুরু হয়ে পঁচাত্তর বছর বয়সে শেষ হয়। এরপর সে চতুর্থ স্তর গ্রহণ করবে।'

চতুর্থ স্তর : সন্ন্যাস আশ্রম তথা পুরোহিত জীবন

পূর্বের স্তরগুলো পার করে মানুষ নতুন এক জীবনে প্রবেশ করেন। এটি হলো সন্ন্যাস ও গুরুর জীবন। এ সময় তিনি মানুষের সামনে একজন অনুসরণীয় মানবে পরিণত হয়। তার ওপর থেকে ধর্মীয় সকল বাধ্যবাধকতা ওঠে যায়। তিনি কামনাহীন বিবেকবান মানুষে পরিণত হন। তার মানবীয় সত্তা ঐশ্বরিক সত্তায় প্রবেশ করে। ফলে ঈশ্বরের ন্যায় তিনিও একজন উপাস্যে পরিণত হন। সুফি সম্প্রদায় এই পর্যায়কে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন—

আল্লাহর কাছ থেকে শোনো
আল্লাহর কাছেই ফিরে যাও।

---

[৭৮] মনুস্মৃতি : ৬/১৩।
[৭৯] মনুস্মৃতি : ৬/১৬।
[৮০] মনুস্মৃতি : ৬/১৯।
[৮১] মনুস্মৃতি : ৬/২২।
[৮২] মনুস্মৃতি : ৬/২২।

এখান থেকেই সুফিগণ তাদের সেই বিখ্যাত বক্তব্য গ্রহণ করেছেন, যেখানে বলা হয়, 'পীরকে মান্য করো, তার আনুগত্য করো, তার নির্দেশ পালন করো, যদিও তা শরিয়তের নির্দেশের পরিপন্থি হয়।'

হাফেজ শিরাজি এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'পীর নির্দেশ দিলে তোমার জায়নামাজ শরাবে ভিজিয়ে নিয়ো। কেননা, তিনিই অবগত কোন্ পথ তোমাকে মনজিলে মকসুদে পৌঁছাবে আর সে পথে চলার আদবকায়দা কী?'

মনু বলেন, 'এ স্তরে সে তার চুল, দাড়ি, গোঁফ মুণ্ডন করে ফেলবে। নখ কেটে ফেলবে এবং তার সঙ্গে ঝুলি বহন করবে।' [৮৩]

'দিনে শুধু একবার ভিক্ষা করা তার কর্তব্য।'[৮৪]

স্বামী দয়ানন্দ বলেন, 'সকল সৃষ্টি, সম্পদ ও সন্তানসন্ততির মায়া ছিন্ন করবে। ভিক্ষুকের জীবন গ্রহণ করবে। রহস্যজ্ঞানে ডুবে থাকবে। ধ্যানে মগ্ন হয়ে নিজ সময় অতিবাহিত করবে। এভাবে তার নির্বাণ তথা বারংবার জন্ম নেওয়া থেকে মুক্তি লাভ হবে।'[৮৫]

সুফিদের পরিভাষায় এটিকে 'ফানায়ে কামেল' বলা হয়।

দয়ানন্দ পূর্ণাঙ্গ সন্ন্যাস-জীবন ব্রাহ্মণ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যেহেতু তারা সৃষ্টিকুলের সেরা। আর মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম হলো সন্ন্যাস-জীবন পরিচালনা করা। তাই শ্রেষ্ঠ কর্মটি শ্রেষ্ঠ মানব শ্রেণি ব্রাহ্মণের জন্যই নির্ধারিত থাকবে। [৮৬]

---

[৮৩] মনুস্মৃতি : ৬/৫১।

[৮৪] মনুস্মৃতি : ৬/৫৫।

[৮৫] *যথার্থ প্রকাশ*, অধ্যায় : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৫।

[৮৬] *যথার্থ প্রকাশ*, অধ্যায় : ৫, পৃষ্ঠা : ১৯১।

পারিবারিক আইন

বিবাহ

আর্য সমাজে তিন পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন হতো:

প্রথম পদ্ধতি : পিতা স্বীয় কন্যার জন্য পাত্র তালাশ করতেন।[৮৭]

দ্বিতীয় পদ্ধতি : জোরপূর্বক বিবাহ। কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তি কারও কন্যাকে অপহরণ করতো। অতঃপর তার পিতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ করে নিতো।[৮৮]

তৃতীয় পদ্ধতি : কোনো ব্যক্তি স্বীয় কন্যাকে কোনো পণ্ডিতের জন্য উপঢৌকন হিসেবে পেশ করতেন।

বিবাহ অনুষ্ঠান কনের বাড়িতে সম্পাদিত হতো। পাত্র তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে উপস্থিত হতো। অতঃপর ঘরের পবিত্র স্থানে আগুন প্রজ্বলিত করা হতো। সে আগুনে ঢালা হতো গরুর চর্বি। এরপর বর-কনের পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্ত বেঁধে দেওয়া হতো। উভয়ে আগুনের চারপাশে কয়েকবার ঘুরতো। এ সময় ব্রাহ্মণ শ্রেণির একজন পণ্ডিত বেদ থেকে কিছু পঙ্ক্তি পাঠ করতো। এভাবেই বিয়ের রীতিটি সম্পাদিত হতো।[৮৯]

একাধিক স্ত্রী

হিন্দুধর্ম একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার বৈধতা দিয়ে থাকে। তাই হিন্দু বীরদের দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে স্ত্রী গ্রহণ করতেন। যেমন হিন্দু বীর অর্জুনের অনেক স্ত্রী ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও গৌতাঙ্গ। আরেক হিন্দু বীর কৃষ্ণ সম্পর্কে তারা বলে থাকে

---

[৮৭] ঋগবেদ, মণ্ডল : ১৫, সূক্ত : ৮৫, শ্লোক : ১০।

[৮৮] ঋগবেদ, মণ্ডল : ৭, সূক্ত : ৩৯, শ্লোক : ১০।

[৮৯] ঋগবেদ, মণ্ডল : ১০, সূক্ত : ৮, শ্লোক : ৫৩৪, মণ্ডল : ৮, সূক্ত : ১৮, শ্লোক : ১০।

যে, তার সতেরো হাজার স্ত্রী ছিল। অপরদিকে তাদের ধর্মীয়গ্রন্থ বেদ এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে উৎসাহ দেয়।[৯০] তাই হিন্দুদেরকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়।

বিধবা বিবাহ

ধর্মগ্রন্থ বেদে আমরা বিধবা বিবাহের উল্লেখ পাই না। বরং বেদ বিধবাদেরকে মৃত স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে উৎসাহ দেয়। তাই হিন্দু নারীরা তাদের মৃত স্বামীর সঙ্গে আগুনে বসে পড়তো এবং তার সঙ্গেই পুড়ে মারা যেতো।

এটাকে হিন্দুধর্মে একজন নারীর জন্য অত্যন্ত পুণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে যে, শ্যালুগনা তার মৃত স্বামী মদনদার সঙ্গে, মৌরি তার স্বামী বান্দুর সঙ্গে সহমরণ গ্রহণ করে। মহাভারতে বলা হয়েছে, কৃষ্ণের সঙ্গে তার বেশকিছু স্ত্রী নিজেদেরকে দাহ্য করে।

গ্রিক ঐতিহাসিকগণ খ্রিষ্টপূর্বে রচিত বিভিন্ন পুস্তকে এইসব রীতিনীতি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

বর্তমানে ভারতীয় আইনে এই ঘৃণ্য রীতিটি নিষিদ্ধ রয়েছে। ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ভারতীয় চিন্তাবিদ রাজা রামমোহনের ভাই মারা যান। তার স্ত্রী নিজেকে স্বামীর সঙ্গে আগুনে দাহ্য করেন। এই বেদনাদায়ক ঘটনায় রাজা রামমোহন অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে সতীদাহ নামক এই প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের আবেদন জানান। ব্রিটিশ সরকার তার আবেদন গ্রহণ করেন। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম ব্যাঙ্ক এই প্রথাকে নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করেন।

এই আইনের ফলে ভারতে বিধবার সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে। বিশেষ করে কম বয়সে বিধবার সংখ্যাও প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। গত শতাব্দীর একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ৫ বছরের কম বয়সী বিধবার সংখ্যা ১৩,৭৭৮ জন। আর ১০ বছরের কম বয়সী বিধবার সংখ্যা ৬,৪৪,০৪০ জন। এ দুটি সংখ্যা থেকে পাঠক বুঝে নিন, দশের অধিক বয়স্ক বিধবার সংখ্যা ঠিক কত হতে পারে।

বেঁচে থাকা এসব বিধবারা অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশার মাঝে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হন।

---

[৯০] ঋগবেদ, মণ্ডল : ৮, সূক্ত : ১০৫, শ্লোক : ১, মণ্ডল : ২, সূক্ত : ৩৩, শ্লোক : ১০।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে উপাসনালয় ও পুরোহিতদের সেবার জন্য উপঢৌকন হিসেবে পেশ করা হয়। ভারতীয় পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত মন্দিরের অভ্যন্তরে এসব নারীদের নিগ্রহের কাহিনি প্রচারিত হয়। এদিকে যারা গৃহে অবস্থান করেন, তাদের জন্যও রয়েছে কঠিন থেকে কঠিন বিধি-নিষেধ।

মনু বলেন, 'বিধবার জন্য শাকসবজির ওপর জীবনধারণ করা কর্তব্য। সে নিজের দেহকে দুর্বল করে ফেলবে এবং অন্য কোনো স্বামী গ্রহণের চিন্তাও করবে না।'[৯১]

এমনকি যে মেয়েটির স্বামীর সঙ্গে সহবাসের পূর্বেই বিধবা হয়েছে, তার জন্যও অন্য কোনো স্বামী গ্রহণ করা বৈধ নয়। বিশেষ করে মেয়েটি যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য শ্রেণির হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে পুরুষের জন্য প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ।[৯২] তবে দয়ানন্দ এটাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি পুরুষের জন্যও পুনরায় বিবাহকে অবৈধ বলেছেন।[৯৩]

বৈবাহিক সূত্রে নিষিদ্ধতা

মনু বলেন, 'ঐ নারীকে বিবাহ করবে যার সঙ্গে পিতা কিংবা মাতার দিক থেকে পূর্ববর্তী সাত পুরুষের মাঝে কোনো আত্মীয়তা ছিল না।' [৯৪]

কম বয়সে বিবাহ তথা বাল্যবিবাহ

'যেসব পিতা কিংবা বড় ভাই দশ বছর (প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সীমা) বয়সী মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করবে না, তারা নরকে যাবে।' [৯৫]

অপরদিকে মনু বিবাহের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।[৯৬]

---

[৯১] মনুস্মৃতি : ৫/১৫৭।
[৯২] মনুস্মৃতি : ৫/১৬৫।
[৯৩] যথার্থ প্রকাশ, অধ্যায় : ৪, পৃষ্ঠা : ১৬৫।
[৯৪] মনুস্মৃতি : ৩/৫।
[৯৫] ব্রিশারি, লক্ষ্য অধ্যায় : ৬/৭।
[৯৬] মনুস্মৃতি : ৯/৯০।

বিবাহবহির্ভূত ভোগ

স্বামী দয়ানন্দ দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ করলেও বিধবা ও অন্যান্যদের জন্য বিবাহবহির্ভূত ভোগের বৈধতা দিয়েছেন। এটাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'নিয়োগ'। তিনি বলেন, 'বিধবা নারীর জন্য একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে সহবাসপূর্বক দুইবার ও চারজন পুরুষের সঙ্গে সহবাসপূর্বক চারবার গর্ভধারণ করা বৈধ। একইভাবে বিপত্নীক পুরুষের জন্য একজন বিবাহিতা নারীর সঙ্গে সহবাসপূর্বক দুইবার পিতা হওয়া এবং চারজন নারীর সঙ্গে সহবাসপূর্বক চারবার পিতা হওয়া বৈধ। ঋগ্বেদের বেশ কিছু শ্লোক থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়।[৯৭]

'হে ইন্দ্র, এসব বিবাহিতা রমণী ও বিধবাদের সঙ্গে সহবাস করো। যাতে এদের মাধ্যমে তোমাকে বলবান সন্তান দান করা হয়। অতঃপর এক বিবাহিতা নারীর দশ সন্তান হলো। তদ্রূপ হে বিবাহিতা রমণী, তুমি এসব পুরুষের সঙ্গে সহবাস করো, যাতে তোমার গর্ভে তাদের দশ সন্তান জন্ম নেয়।'[৯৮]

পর্দা

হিন্দু নারী প্রচলিত কোনো পর্দা করে না। তার জন্য বিভিন্ন উপলক্ষ্যে পুরুষদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা বৈধ। যেমন বিবাহ অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণ প্রভৃতি। একইভাবে তাদের জন্য মূর্তির সামনে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নৃত্য প্রদর্শন করাও বৈধ।

ঋতুস্রাবের সময় আলাদা থাকা

মনু বলেন, 'পুরুষের জন্য ঋতুমতী নারী থেকে সতর্ক থাকা কর্তব্য। এ সময় পুরুষ তার সঙ্গে ঘুমাবে না, সহবাস করবে না। যদি করে, তাহলে সে দৈহিক দুর্বলতা, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি ও যৌন দুর্বলতায় আক্রান্ত হবে। পাশাপাশি তার আয়ুও কমে যাবে।' [৯৯]

---

[৯৭] ১০/৮৫/৪৫।

[৯৮] যথার্থ প্রকাশ, অধ্যায় : ৪, পৃষ্ঠা : ১৬৪-১৬৫।

[৯৯] মনুস্মৃতি : ৪/৪০-৪১।

হিন্দুদের বিভিন্ন উপদল

হিন্দুদের বেশকিছু উপদল রয়েছে। এখানে আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রসিদ্ধ দুটি উপদল সম্পর্কে আলোচনা করব। দল দুটি হলো—

- বিষ্ণু সম্প্রদায়
- শিব সম্প্রদায়

বিষ্ণু সম্প্রদায়

বিষ্ণু হিন্দুদের একজন দেবতার নাম। বেদে তার নাম উল্লিখিত হয়েছে। সম্প্রদায়টি তাকে জগতের সবকিছু সম্পর্কে অবগত বলে অভিহিত করে থাকে এবং ব্রহ্মার সকল গুণ তার মধ্যেও বিদ্যমান বলে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে, বিষ্ণু তাদেরকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন।

এ সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব হলো, তারা বিষ্ণুর পূজাকে সর্বোত্তম কাজ বিবেচনা করে থাকে। কালপরিক্রমায় সম্প্রদায়টি কৃষ্ণের পূজা করতে শুরু করে। তারা বিশ্বাস করতে থাকে, কৃষ্ণ হলেন বিষ্ণুর অবতার। কেননা, বিষ্ণু তার বান্দাদের সাহায্য করার জন্য মানবাকৃতিতে বারবার পৃথিবীতে আগমন করেন। তারা বলে থাকে, বিষ্ণু এখন পর্যন্ত দশজন অবতার বেছে নিয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাম ও কৃষ্ণ। সম্প্রদায়টি দুটি উৎসব পালন করে থাকে। একটি হলো 'দশেরা'। অপরটি হলো 'জন্মাষ্টমী'।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই সম্প্রদায়ের বেশ কিছু উপাসনালয় রয়েছে। উপাসনালয়গুলোতে তারা পূজার জন্য বিষ্ণুর মূর্তি স্থাপন করে।

বিষ্ণুর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

১. ঈশ্বরের ইচ্ছাই সবকিছুর ওপর প্রাধান্য।

২. তৃতীয় কিংবা চতুর্থ স্তরে প্রবেশ না করেও দ্বিতীয় স্তর তথা গার্হস্থ আশ্রমেই মোক্ষ লাভ করা সম্ভব।

৩. যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে অপরকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৪. একটি মাত্র আত্মা সকল সৃষ্টির মাঝে পরিভ্রমণ করে।

শিব সম্প্রদায়

সিন্ধুতে এই সম্প্রদায়টি প্রসিদ্ধ ছিল। ঋগ্বেদে সম্প্রদায়টির উল্লেখ পাওয়া যায়। শিব মূলত রুদ্র। পরবর্তী সময় তিনি শিব নাম ধারণ করেন। তার রয়েছে বিধ্বংসী শক্তি। যদ্দরুন তাকে মহাদেব উপাধি দেওয়া হয়। কেননা, তিনি স্বীয় শক্তিবলে অন্যান্য দেবতাদের ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন। আর জ্ঞান দ্বারা বিজয় লাভ করেছেন পূজারি ও পুরোহিতদের ওপর।

এই সম্প্রদায়টির অন্যতম বিশ্বাস হলো, তারা শিবের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব কোনোটাতেই বিশ্বাস স্থাপন করে না। তিনি সবকিছুর পরিবেষ্টনকারী।

এই সম্প্রদায়টির কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম হলো, তারা পেটপুরে খাওয়ার চেয়ে ভুখা থাকাকে প্রাধান্য দেয়। খাবারের প্রয়োজন হলে খুলি ব্যবহার করে। ভীষণ একাকিত্বের সঙ্গে মানিয়ে নেয়। একইভাবে শ্মশানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করে।

ভারতে এই সম্প্রদায়টি অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে ব্যাপক বিস্তৃত। এদেরও নির্দিষ্ট উপাসনাগৃহ রয়েছে। এসব উপাসনাগৃহের কোনো কোনোটি খ্রিষ্টপূর্ব-কালে নির্মিত।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন শাং ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি দেখেছিলেন ভারতের সকল অঞ্চলে অন্যান্য দেবতার চেয়ে শিবের পূজা বেশি হয়। একইভাবে আমরা সে সময়ের হিন্দু ইতিহাসবিদদেরকে দেখি, তারাও অন্যান্য দেবতার চেয়ে শিবকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। এরপর আলবেরুনির বর্ণনায় দেখা যায়, শিবের অর্চনা ধীরে ধীরে শক্তি, সূর্য, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি ও কুবেরের পূজায় পরিবর্তিত হয়।

মূর্তিপূজা

ভারতে ঠিক কখন মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল, তা নির্ণয় করা যায় না। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ির পর বিশালসংখ্যক মূর্তির দেখা পাওয়া যায়। এদের বেশির ভাগ মূর্তি উলঙ্গ। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষ পার্থিবজীবনে থাকাকালীন যতদিন আরাম-আয়েশ ও পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি আগ্রহী থাকবে, ততদিন মোক্ষ লাভ করতে পারবে না।

এর বিপরীতে এমনকিছু মূর্তিও পাওয়া গেছে, যেগুলো নানা রং, বিভিন্ন প্রকার অলংকার ও পোশাকে সজ্জিত। সন্দেহ নেই এই মূর্তিগুলো বিষ্ণু সম্প্রদায়ের গড়া। তারা লোকদেরকে নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বাহ্যিক বেশভূষাকে প্রাধান্য দিতো।

একইভাবে ভারতে 'লিঙ্গ' ও 'যোনি' পূজার ধারাও প্রচলিত ছিল। কেননা, শিব ও তার স্ত্রী পার্বতী পুরুষাঙ্গ ও যোনিদ্বার-এর প্রতীক। এ দুটির সঙ্গমেই জগতের সৃষ্টি হয়েছিল।

তাই স্বভাবতই ভারতীয় হিন্দুরা পুরুষাঙ্গ ও যোনিদ্বারের পূজা করবেই। কেননা, এগুলো হলো সৃষ্টির উৎস ও পৃথিবীর বুকে প্রাণের অস্তিত্বের রক্ষাকবচ। তাছাড়া মহেঞ্জোদারোতে অনেকগুলো পাথর পাওয়া গেছে, যেগুলো লিঙ্গ কিংবা যোনি আকৃতির।

একজন ঐতিহাসিক বলেন, প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুরা তাদের প্রাকৃতিক দেবতাদের তালাশ করতো। এ সময় লিঙ্গ ও যোনি আকৃতির পাথর তাদের হস্তগত হয়। এসব হিন্দুরা মানুষ ও ষাঁড় প্রভৃতির আকৃতিতে ঈশ্বরের পূজা করতো। তাদের জন্য লিঙ্গ ও যোনির পূজা করা অসম্ভব কিছু নয়। প্রাকৃতিক অন্যান্য শক্তির ন্যায় এসবের পূজা করা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ কিছু নয়।[১০০]

আর্যগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদে লিঙ্গপূজার উল্লেখ ও তার সমালোচনা করতে বাদ রাখেনি। যেমন ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, 'তিনি ইন্দ্র। চমৎকার কৌশলে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তার শত্রু ও শত্রুদেবীর কাছ থেকে তিনি বহু সম্পদ লাভ করেন। যদিও এই সম্পদগুলো

[১০০] RELLEGION OF INDIA, Page no : 261

রক্ষিত হতো শত দরজার মাঝে এবং তিনি অপবিত্র আত্মাকে দূর করলেন, যা লিঙ্গপূজা করে।[১০১] একইভাবে রামায়ণেও লিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। লঙ্কান রাজা রাবণ সর্বদা নিজের সঙ্গে স্বর্ণের লিঙ্গ বহন করতো।

সার্জেন্ট মার্শাল বলেন, লিঙ্গ আকৃতির এসব পাথর পরিমাপ ও বিষয়বস্তুতে অত্যন্ত নিপুণভাবে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।[১০২] ভারতে পূজিত মূর্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম আরেকটি মূর্ত হর মাতৃদেবী অর্থাৎ মাতৃভূমির মূর্তি।

বেলুচিস্তানে মাতৃদেবীর কিছু মূর্তি পাওয়া যায়। বেদভূমি নামে এই দেবীর মহিমা বর্ণনা করেছে। কেননা, ভূমি হলো প্রথম ক্রোড়, যা প্রথম একজন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়। এরপর মানুষ তার পুরো জীবন অতিবাহিত করার জন্য এই ভূমিকেই গ্রহণ করে। সুতরাং এটা একেবারেই স্বভাবসিদ্ধ যে, ভারতীয়রা তাদের নিয়ম অনুযায়ী মাতৃদেবীর নামে মূর্তি গ্রহণ করবে।

মহেঞ্জোদারোতে খোঁড়াখুঁড়ির পর শিবের বেশ কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। তার তিনটি মাথা। উভয় হাত হাঁটুর ওপর রাখা। একটি কাঠের চৌকিতে যোগাসনে উপবিষ্ট। ধ্যানমগ্ন। তার চতুষ্পার্শ্বে বিভিন্ন প্রকারের জন্তুর মূর্তি। কোনো কোনো শিবমূর্তির ওপর অজগর খোদিত। অজগরটি অনেকটা তার গলার হারের মতো জড়ানো। হিন্দুরা তাকে পশু সমাজের দেবতা মনে করে।

ধর্মতত্ত্ববিদগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, আর্যদের মাঝে মূর্তিপূজা ছিল না। ভারতীয়দের সংমিশ্রণে এসে তারা দেবতাদের মূর্তি খোদাই করতে শুরু করে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার মিশ্রণে নতুন এক সভ্যতার আবির্ভাব ঘটে। আর এই নতুন মিশ্র সভ্যতাই হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হয়ে উঠে। তাই আমরা কখনোবা ভারতীয় দেবতা বিষ্ণু ও শিব প্রমুখদের ওপর আর্য দেবতা ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রমুখদের প্রাধান্য দেখতে পাই। আবার কখনো ভারতীয় দেবতাদের প্রাধান্য দেখতে পাই। এভাবে চলতে চলতে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর স্বামীর আগমন ঘটে। তারা উভয়ে হিন্দুধর্মে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন। ফলে, হিন্দুধর্ম একটি মিশ্র ধর্মে পরিণত হয়। যেখানে রয়েছে আর্যদের আকিদা-বিশ্বাস, ভারতীয়দের কুসংস্কার, বুদ্ধের শিক্ষা ও মহাবীরের রীতি-রেওয়াজ।

---

[১০১] ঋগবেদ, মণ্ডল : ৯, সূক্ত : ৫, শ্লোক : ২১।

[১০২] MOHON JODOR IN INDIAN CIVILISATION.

গো-উপাসনা

হিন্দুধর্মে গাভি অত্যন্ত উঁচু স্তরের মর্যাদা লাভ করে। কেননা, গাভি ছিল আর্যদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাই গাভির প্রতি তাদের এক ধরনের দুর্বলতা ও গাভির লালনপালনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই গাভি তাদের বহু উপকারে আসতো। তাই গাভির কীর্তনে তারা তাদের ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থগুলোতে অনেকগুলো শ্লোক রচনা করে। যেমন ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, 'যিনি রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যের ভগিনী, অমৃতের আবাসস্থান; হে জলগণ, সেই নির্দোষ অদিতি গোদেবীকে হিংসা করিয়ো না। এই কথা চেতনাবিশিষ্ট জনগণকে বলিয়াছিলাম। বাক্য প্রদায়িনী, বাক্য উচ্চারণকারিণী, সমস্ত বাক্যের সহিত উপস্থিতা, দ্যোতমান, দেবগণের জন্য আমার পরিচয় বিশিষ্টা গোদেবীকে অল্প বুদ্ধি মনুষ্য পরিবর্জন করে।'[১০৩]

'যে গোদেবীকে পা দ্বারা আঘাত করবে, সে শাস্তির উপযুক্ত হবে।'[১০৪]

'আমরা গোদেবীকে জ্ঞানের উৎস বানালাম। গোদেবীগণ ইন্দ্রের সেবা করে।'[১০৫]

এভাবে চতুর্বেদের বিভিন্ন শ্লোকে গো-দেবীর মহত্ত্বের কীর্তন পাওয়া যায়। তাই হিন্দুরা তার পূজা করে। তার গোবরকে পবিত্রজ্ঞান করে। তাদের একজন বীর কৃষ্ণ গাভির প্রতি আসক্ত ছিলেন। তাই তার উপাধি দেওয়া হয় 'গোপাল' অর্থাৎ গাভি পালনকারী।

হিন্দুদের কাছে সর্বোত্তম দান হলো গরু দান করা। বরং বিভিন্ন ধর্মীয় উপলক্ষ্য ও বিবাহ অনুষ্ঠানে এটাকে সবচেয়ে পবিত্র দান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১০৬]

করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন গোপূজা ও মুসলিমদেরকে গোহত্যা থেকে বিরত থাকার প্রতি আহ্বানকারী। তিনি এ বিষয়ে হিন্দুদের চেতনা জাগ্রত করতে গিয়ে বলেন, 'হিন্দুধর্ম পৃথিবীর বুকে ততদিন টিকে থাকবে, যতদিন তারা গো-সংরক্ষণে নিয়োজিত থাকবে।'

কিন্তু যদি গান্ধীকে বলা হয়, আপনি কি আর্যদের মতো গরুর চামড়াকে বিছানা এবং গরুর অস্থিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে রাজি আছেন? [১০৭] আমার ধারণা তিনি রাজি হবেন না। কেননা, তিনি গাভিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার প্রকৃত মায়ের চেয়ে উত্তম বিবেচনা করে এসেছেন।

---

[১০৩] ঋগবেদ, মণ্ডল : ৮, সূক্ত : ১০১, শ্লোক : ১৫-১৬।

[১০৪] অথর্ববেদ : ৪৬/৯/১৩।

[১০৫] ঋগবেদ, মণ্ডল : ১, সূক্ত : ১৭৩, শ্লোক : ১।

[১০৬] ঋগবেদ, মণ্ডল : ৬, সূক্ত : ৭৫, শ্লোক : ১১, মণ্ডল : ৯, সূক্ত : ১২১, শ্লোক : ১, মণ্ডল : ৬, সূক্ত : ৪৭, শ্লোক : ২৬।

[১০৭] ঋগবেদ, মণ্ডল : ৬, সূক্ত : ৭৫, শ্লোক : ১১, মণ্ডল : ১, সূক্ত : ১২১, শ্লোক : ৯, মণ্ডল : ৬, সূক্ত : ৪৭, শ্লোক : ২৬।

হিন্দুধর্মে উপাসনা

প্রার্থনা

হিন্দুধর্মে প্রার্থনা দুই ধরনের।

প্রথমত, যজ্ঞ : এর পদ্ধতিটি হলো নির্দিষ্ট স্থানে আগুন প্রজ্বলিত করা। অতঃপর দেবতাদের সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে বেদ-উপনিষদ থেকে মন্ত্র পাঠ করে ক্ষমা প্রার্থনা করা। যজ্ঞের বিভিন্ন ধরন ও উপলক্ষ্য রয়েছে। যেমন ক্ষমতার ভিত স্থায়ীকরণ, দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন প্রভৃতি। কালপরিক্রমায় যজ্ঞের ধরনের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যজ্ঞ কোনো না কোনো ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হতে হয়। কেননা, ব্রাহ্মণ হলো স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সেতুবন্ধন।

এভাবে ধনাঢ্য শ্রেণি ও রাজা-বাদশাদের কাছে যজ্ঞ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। ব্রাহ্মণরা দীর্ঘ সময় যজ্ঞের পেছনে ব্যয় করে। তারা এর পদ্ধতি নিয়ে বহু গ্রন্থও রচনা করে।[১০৮]

দ্বিতীয়, পূজা : পূজা হলো দেবতাদের অর্চনা ও তাদের উদ্দেশ্যে ফুল, ফল ও জাফরান মিশ্রিত পানির নৈবেদ্য প্রদান করাকে বোঝায়। প্রত্যেক দেবদেবীর পূজার সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ বিশেষ নিয়ম রয়েছে। কোনো কোনো দেবদেবীর পূজায় অঞ্জলি ভরে পানি ছিটানো হয়। আবার কোনো কোনো পূজায় পানি ছিটাতে বড় আকারের শঙ্খের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[১০৯]

এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ অনেক দীর্ঘ।

---

[১০৮] শাহরাস্তানি তার গ্রন্থ *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল* এ যজ্ঞের কিছু ধরন উল্লেখ করেছেন। দেখুন খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৬১।

[১০৯] *আলকামুসুল হিন্দি*, পৃষ্ঠা : ৪১২।

উপবাস

হিন্দু পণ্ডিতগণ উপলব্ধি করলেন যে, আত্মার নিয়ন্ত্রণ ও দমন, জৈবিক কামনা নিবৃত্তকরণ ও শারীরিক শক্তিকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে উপবাস সর্বোত্তম মাধ্যম। তাই তারা ধর্মগুরু ও পূজারিদের ওপর উপবাস যাপন বাধ্য করে দিয়েছেন। তাদের এই উপবাসের নানা নিয়ম রয়েছে। যেমন শুধু দানাদার খাবার থেকে বেঁচে থাকা। তবে প্রয়োজন অনুসারে দুধ ও পানি পান করা যাবে। আরেক ধরনের উপবাস হলো, শুধু দ্বিপ্রহরে আহার গ্রহণ করা। আরেক প্রকার উপবাস রয়েছে, শুধু সন্ধ্যায় একবার মাত্র আহার গ্রহণ করা।

হিমালয় পর্বত ও বিভিন্ন বনজঙ্গলে হিন্দু সন্ন্যাসী ও পূজারিদের একদল এমনও পাওয়া যায়, যারা লাগাতার উপবাস করে কোনো কিছুই ভক্ষণ করে না। শুধু একটি বিশেষ উদ্ভিদের রস নিংড়ে গিলে নেয়। এভাবেই তারা মৃতপ্রায় হয়ে জীবনযাপন করতে থাকে। এমনকি এ অবস্থাতেই তারা মৃত্যুবরণ করে।[১১০]

---

[১১০] এভাবেই যোগ (YOGA)-এর ভূমিকা সম্পাদিত হয়। যোগী তার মানসিক চর্চায় পার্থিব উপকরণের ওপর প্রাধান্য লাভ করে। অতঃপর প্রত্যক্ষদর্শীদের হতবুদ্ধি করে দেয়। তারা যোগীকে স্থির পানির ওপর অবস্থান করতে দেখে। সে ভাঙা কাচের ওপর ঘুমায় কিন্তু কাচের কোনো ধরনের খোঁচা তাকে আঘাত করতে পারে না। মানুষের জন্য এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। কেননা, যোগ একটি ধর্মীয় আকিদাসংক্রান্ত বিষয় এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে আত্মিক উন্নতির মাধ্যম। এই শিক্ষা বেদ থেকে ধারণ করা হয়েছে। যদি এই বক্তব্য বেদে না আসতো এবং সন্ন্যাসী ও পূজারিদের অভিজ্ঞতার দিকে সম্বোধিত হতো, তাহলে এর বিভিন্ন দিকে পূর্ণতা আসতো এবং অনেক সুফলও পাওয়া যেতো।

কিন্তু এর ধারণা বৈদিক যুগগুলোতে সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। কেননা ধর্মগুরুগণ বেদের রহস্য উন্মোচনের নিমিত্তে এই যোগ-সাধনা করতেন। সুতরাং যোগ-সাধনার ধারণাটি সম্পূর্ণ হিন্দু ধর্মীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারণা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা। যোগ শিক্ষা তাদেরকে এ কাজে সহায়তা করে।

আমি আন্তর্জাতিক কিছু জার্নালে পড়েছি, চন্দ্রস্বামী ঘোষণা দিয়েছেন, অনেক রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তারা সকলে তার গোলামের মতো। তিনি তাদেরকে নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেন। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে যোগ-সাধনার মাধ্যমে। আধুনিক যুগে যোগ-সাধনা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দুজন বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাদের একজন হলেন আচার্য রাজেশ। অপরজন হলেন মহেশ যোগী।

প্রথমজন তথা রাজেশ ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে। কয়েক বছর আগে সে মৃত্যুবরণ করে। লোকটি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো না। কোনো ধরনের আসমানি কিতাবেও বিশ্বাস করতো না। জান্নাত-জাহান্নামের মতো অদৃশ্য জগৎকে অস্বীকার করতো। সে মনে করতো, মানুষের নিজস্ব একটি ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সে বিস্ময়কর কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম। তার প্রচারণা শুধু যোগ শিক্ষা দেওয়া এবং সুফিয়ানা পদ্ধতিতে আত্মিক ধ্যানের মাঝে সীমিত ছিল। সে সুফিবাবা ফরিদের প্রশংসা করতো। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সে দাবি করে তার পূর্ণজ্ঞান অর্জিত হয়েছে। পূর্ণজ্ঞান হলো আত্মা ও দেহের সম্পর্কের জ্ঞান। সুতরাং এখন সে এই বিস্তৃত জগতের সঙ্গে একীভূত হতে সক্ষম।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সে পুনে নগরীতে রাজেশ আশ্রম নামে তার কার্যালয় স্থাপন করে। সেখানে সে নিয়মিত যোগ শিক্ষা দিত। এরপর ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সে যুক্তরাষ্ট্রে যায়। সেখানেও সে অনেকগুলো যোগ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে।

অপরদিকে সাধারণ মানুষের জন্য উপবাসের দিন খুবই সীমিত। যেমন, কেউ নিজের ওপর আবশ্যক করে নিলো যে, প্রতি চান্দ্রমাসের অমুক দিন বা অমুক তারিখে সে উপবাস থাকবে কিংবা এভাবে আবশ্যক করে নিলো যে, কৃষ্ণ কিংবা রামের জন্মদিনে বা সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সময় উপবাস থাকবে অথবা শত্রুর ওপর বিজয় লাভের দিন উপবাস থাকবে; যেমন রাবণের ওপর রামের বিজয়ের দিনে। সাধারণ হিন্দুদের ওপর কোনো ধরনের আবশ্যিক উপবাস নেই। তাদের উপবাস ঐচ্ছিক।

তীর্থযাত্রা

হিন্দুরা পবিত্র স্থান কিংবা বড় ব্যক্তিত্বের দর্শনে যাত্রা করে। এটাই হলো তীর্থযাত্রা। যাত্রা শব্দের অর্থ হলো নদী পাড়ি দেওয়া।

বড় বড় ব্যক্তিবর্গের দর্শনে যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো, তাদের মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করা এবং তাদের সান্নিধ্য উপভোগ করা।

আর পবিত্র স্থান দর্শনের উদ্দেশ্য হলো, সেসব স্থানের মূর্তিগুলোর পূজা করা। এ ধরনের চারটি স্থান প্রসিদ্ধ। স্থানগুলো হলো—

১. দ্বারকাধাম
২. জগন্নাথপুরী
৩. বদ্যিনাথ আশ্রম
৪. রামেশ্বর

হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে তার কয়েকশ বই-পুস্তক ও আর্টিকেল প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যোগ ও ধ্যান। রাজেশের অনুসারীরা তার মৃত্যুকে বিশ্বাস করেনি। তারা বিশ্বাস করে, সে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছে এবং অবিনশ্বর জগতের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছে। আর এটাই হলো বেদের শিক্ষা।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তথা মহেশ যোগী। আমার যতটুকু মনে পড়ে চল্লিশের দশকে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে যায়। সে লোকদের সামনে নিজেকে সাধু-সন্ন্যাসী হিসেবে প্রকাশ করতো। একই সময়ে সে সম্পদের পাহাড় গড়ার প্রতিও ছিল ভীষণ লালায়িত। সে মানুষকে যোগ শিক্ষা দিতো এবং মহর্ষি আন্দোলনের প্রতি আহ্বান করতো। সে দাবি করেছিল, ঈশ্বর তাকে প্রেরণ করেছেন লোকদেরকে ধ্বংস ও ভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধার করে অবিনশ্বর জীবন প্রদান করতে। যোগ সাধনার ফলে মানুষ যুগ যুগ ধরে সানন্দে বসবাস করতে পারবে। সবশেষে মানুষ নির্বাণ লাভ করবে। চল্লিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তার চতুষ্পার্শ্বে হাজার হাজার আমেরিকান জড়ো হয়। সকলেই ছিল তার কার্যক্রমের চেতনায় উজ্জীবিত।

শেষের দিকে লোকটির দুরভিসন্ধি জনসম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ে। দেখা যায় সে মূলত একজন চোর। ফলে সে আমেরিকা থেকে বিতাড়িত হয়। আমেরিকান সরকার তার অঢেল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। সে ভারতে চলে যায়। এবং লোকলজ্জা থেকে বাঁচতে বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে থাকে।

একইভাবে হিন্দুরা একটি পবিত্র নদীর উদ্দেশ্যেও তীর্থযাত্রা করে। সেখানে তারা স্নান সারে। যেমন বারাণসী ও এলাহাবাদের গঙ্গা ও যমুনা।

তীর্থযাত্রার শিষ্টাচার

১. তীর্থযাত্রীকে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করে যাত্রা করতে হবে। দর্শনকালে তাদের সঙ্গে কোনোরূপ যোগাযোগ করা যাবে না এবং তাদের চিন্তাও করা যাবে না।

২. নির্দিষ্ট স্থান তথা ঘর হতে এক কিলোমিটার দূরত্বে গিয়ে স্বীয় পোশাক ত্যাগ করে তীর্থযাত্রার নির্ধারিত পোশাক পরিধান করবে। পোশাক হলো হলুদ রঙের লম্বা জামা ও লুঙ্গি। হাতে থাকবে বাঁশের লাঠি। লাঠিতে ঝোলানো থাকবে বিশেষ ধরনের পানির পাত্র। যাত্রাপথে নির্দিষ্ট জপ করতে থাকবে—

'হরে কৃষ্ণ... হরে রাম...'

উত্তম হলো পদব্রজে যাওয়া। ব্রাহ্মণের জন্য পদব্রজে যাওয়া আবশ্যক। অন্যদের জন্য এটা ঐচ্ছিক।

হিন্দুধর্মের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা-বিশ্বাস

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, হিন্দুধর্ম মৌলিক কোনো আকিদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। এতদ্সত্ত্বেও কতগুলো বিষয় সকল হিন্দুদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। এই প্রচলিত বিষয়গুলোর মাঝে পারস্পরিক বৈপরীত্য থাকলেও এগুলোর ওপর মোটামুটি সকল হিন্দুই একমত। দলমত নির্বিশেষে প্রায় সকল হিন্দুই এগুলো কিংবা এর কাছাকাছি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস করে থাকে। এখানে আমরা এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করছি—

১. হিন্দু চিন্তাধারায় জগতের সৃষ্টি।
২. অবতারবাদ।
৩. আগমন বা পুনর্জন্মবাদ।
৪. কর্মবাদ।
৫. নির্বাণ।

এক. হিন্দু চিন্তাধারায় জগতের সৃষ্টি

মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায় জগৎ সৃষ্টির আলোচনা সংশ্লিষ্ট। সেখানে মনু বলেন—

'বিশ্বসংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল। তা ছিল সম্পর্কের অতীত এবং তাতে পৌঁছারও কোনো উপায় ছিল না। অতঃপর অব্যাহত সৃষ্টি-সামর্থ্য-সম্পন্ন পরমেশ্বর স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হলেন। তিনি আপন দেহ হতে বিবিধ জগৎ সৃষ্টি করার ইচ্ছায় প্রথমে জল সৃষ্টি করলেন এবং তাতে আপন বীর্য প্রক্ষিপ্ত করলেন। সেই বীর্য একটি অণ্ডে পরিণত হলো। অতঃপর সেই অণ্ড থেকে ব্রহ্মা বের হয়ে এলেন। তিনি অণ্ডটিকে দুভাগে ভাগ করলেন। একভাগ দিয়ে সৃষ্টি করলেন স্বর্গ। অপর ভাগ দিয়ে সৃষ্টি করলেন পৃথিবী, আকাশ, অষ্টদিক, তরঙ্গায়িত সমুদ্র। অতঃপর সৃষ্টি করলেন তার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ শ্রেণি, বাহু থেকে ক্ষত্রিয় শ্রেণি, ঊরু থেকে বৈশ্য শ্রেণি এবং পা থেকে শূদ্র শ্রেণি। ব্রহ্মা যতদিন জেগে থাকবেন, ততদিন বিশ্বসংসার অবশিষ্ট থাকবে। তিনি নিদ্রিত

হলে এই জগৎ প্রলয়প্রাপ্ত হবে। (মনু বলেন,) এভাবেই প্রজাপতি সমুদয় জগতকে ও আমাকে সৃষ্টি করলেন। তিনি প্রলয়ান্তরে পুনপুন এই কাজ করেন। তিনি জাগ্রত হলে জগৎ সৃষ্টি হয়। আর তিনি নিদ্রিত হলে জগৎ প্রলয়প্রাপ্ত হয়। এটাই বিশ্বসংসারে ঈশ্বরের নিয়ম।'[১১১]

হিন্দুদের এই রূপকথার ওপর অনেকগুলো আপত্তি উত্থাপিত হয়। আপত্তিগুলো হলো—

১. ব্রহ্মা মাখলুক অর্থাৎ সৃষ্ট। তাকে পরমেশ্বর সৃষ্টিপদার্থ থেকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ হিন্দুদের ধর্মমতে, ঈশ্বরের আত্মা অনাদি ও অবিনশ্বর। পরবর্তী সকল আত্মা তাতে মিলিত হয়।

২. এই মাখলুকে পরিবর্তন ঘটে খালিক তথা তিনি সৃষ্টিকর্তায় রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তিনি স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ এবং মধ্যবর্তী সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করেন।

৩. এরপর এই খালিকে পরিণত হওয়া মাখলুক শ্রেণিচতুষ্টয় সৃষ্টি করলেন। ফলে আমরা জানতে পারছি না যে, অবশিষ্ট মানবগোষ্ঠীকে কে সৃষ্টি করেছেন?

৪. এই ব্রহ্মাই পুরো জগৎ পরিচালনা করেন। তাহলে ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের কাজ কী, তা আমাদের অজানা।

৫. এই জগৎ সৃষ্টি হয়ে প্রলয়প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অতঃপর প্রলয়প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় সৃষ্টি হবে। সৃষ্টি-প্রলয়ের এইধারা অব্যাহত থাকলে এর শেষ কোথায় তা আমাদের অজানা। এ বিষয়ে মনুর বক্তব্য হলো, 'আমরা সৃষ্টির সপ্তম স্তরে অবস্থান করছি। এর আগে ছয়জন মনু অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তারা সকলে নিজেদের স্তর সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সময়কালে জগতকে পরিচালনা করেছেন।

   এরপর মনু দিনরাত্রির বিভাজন করলেন। চক্ষুর পলকের নাম নিমেষ। আঠারো নিমেষে এক কাষ্ঠা। আশি কাষ্ঠায় এক কালা। ত্রিশ কালায় এক মুহূর্ত। ত্রিশ মুহূর্তে এক দিবারাত্রি। সূর্য হলো দিবারাত্রির বিভাজনকারী। রাত নিদ্রার জন্য। আর দিন কর্মের জন্য।[১১২]

---

[১১১] মনুস্মৃতি : ১/১-৫২।
[১১২] মনুস্মৃতি : ১/৬১-৬৫।

এরপর মনু বলেন, এখন শোনো, ব্রহ্মার দিনরাত্রি। চার হাজার দিবারাত্রিতে এক সত্যযুগ। চার হাজার সত্যযুগে এক সন্ধ্যাযুগ। চার হাজার সন্ধ্যাযুগে এক সন্ধ্যানিশি যুগ।[১১৩]

অর্থাৎ ৪০০০×৪০০০×৪০০০×৩০×৩০×৩০×১৮

এই দিনরাত্রি হলো সৃষ্টিজগতের এক স্তর। এখানে মনুস্মৃতিতে দিনরাত্রির আরও কিছু হিসেব-নিকেশ আছে। তবে গাণিতিক সংখ্যা এটা ব্যক্ত করতে অক্ষম।

জগতের সৃষ্টিসংক্রান্ত আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। তা হলো, 'জাগতিক আত্মা মানবাকৃতি ধারণ করে। অতঃপর তার চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু সেখানে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। অতঃপর মানবাকৃতির সেই আত্মা 'এই তো আমি' বলে চিৎকার দেয়। সেখান থেকেই 'আমি' কথাটির সৃষ্টি। তাই মানুষ নিজের কথা বলার সময় 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করে। আর অনুভব করে এই জাগতিক আত্মাকে। অথবা প্রথম মানবের একাকিত্বের ভয়কে অনুভব করে। তাই এখন পর্যন্ত মানুষ একা থাকতে ভয় করে। কিন্তু মানবাকৃতির সেই আত্মা নিজেকে প্রশ্ন করলেন, কেন আমি ভয় পাচ্ছি? আমি ছাড়া তো আর কারও অস্তিত্ব নেই। মানুষ অন্যকে ভয় করতে পারে। সেই মানবাকৃতির আত্মা কোনো ধরনের সৌভাগ্য অনুভব করলো না। তাই মানুষও একাকী থাকলে কোনো ধরনের সৌভাগ্য অনুভব করে না। সেই মানব তার সঙ্গীর অস্তিত্ব প্রদানে আগ্রহী হলেন। তাই নিজেকে দুই ভাগ করলেন। একভাগ আপন আকৃতিতে রয়ে গেল। অপর ভাগ নারীতে রূপান্তরিত হলো। এই রূপান্তরিত নারী হলেন তার স্ত্রী। তখন থেকেই মানবসৃষ্টির ধারাবাহিকতা শুরু হলো।'[১১৪]

সৃষ্টির সূচনা-সংক্রান্ত হিন্দুধর্মের আরেকটি বর্ণনা হলো, বিষ্ণু হিন্দু বিশাল ক্ষমতার অধিকারী। তার স্ত্রী লক্ষ্মী হলেন তার শক্তির প্রতীক। লক্ষ্মী তার মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেন যেভাবে চাঁদের মধ্যে আলো থাকে। তার দুটি দিক রয়েছে।

প্রথম দিক হলো : তিনি বিষ্ণুর ঐচ্ছিক অস্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব করেন।

দ্বিতীয় দিক হলো : তিনি জগতের অস্তিত্বের নিয়ামক। জগতের সৃষ্টি তার থেকেই শুরু হয়। অজানা সময়ব্যাপী ঘুমানোর পর বিষ্ণু জেগে ওঠেন। অতঃপর লক্ষ্মীকে ডেকে তোলেন। এই স্তরে বিষ্ণু ছয়টি সত্তাগত গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হন। গুণগুলো হলো : জ্ঞান, ক্ষমতা, দিগন্তবিস্তৃতি, জীবন, শক্তি ও মহত্ত্ব।

---

[১১৩] মনুস্মৃতি : ১/৭৬-৮৬।

[১১৪] এই অংশটুকু আমি ড. আহমদ শালবির *মুকারানাতুল আদইয়ান* গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করেছি। কেননা, মূল গ্রন্থ আমি হাতের নাগালে পাইনি। গ্রন্থটি হলো *আলআসাতিরুল হিন্দিয়া আনিল কওনি ওয়া খালকিহি*।

এই গুণগুলোর সমষ্টিতে তৈরি হয় বাসুদেব। বাসুদেবের উৎসর্গের মাধ্যমে তিনটি সত্তার প্রকাশ ঘটে। সত্তাগুলো হলো শংকর, যিনি জ্ঞান ও দিগন্তবিস্তৃতির প্রতিনিধিত্ব করেন। বরুণ ক্ষমতা ও শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন। অনিরুদ্ধ জীবন ও মহত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই হলো জগৎ পরিচালনার নিমিত্তে তিনটি সত্তা।[১১৫]

এ পর্যায়ে আমি জগতের সৃষ্টিসংক্রান্ত বর্ণনায় হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থগুলোর বিরোধ তুলে ধরছি।

প্রসিদ্ধ হিন্দু দার্শনিক ড. তারা চাঁদ তার *INFLUENCE OF ISLAM ON INDIAN CULTER* নামক গ্রন্থে নিম্নোক্ত কথাগুলো ব্যক্ত করেন—

বৈদিক চিন্তাধারায় জগতের সৃষ্টি

পশু উৎসর্গ করা জগতের কার্যকারিতার লক্ষণ। এটিই সৃষ্টিকর্তার শক্তির মাধ্যম। কেননা, সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করতে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন। তার শক্তি খর্ব হয়। তখন স্বর্গীয় দূতগণ এই শক্তিকে ফিরিয়ে আনতে পশু উৎসর্গ করেন। অতঃপর বৃষ্টি হয়, সূর্য ওঠে, তুফান আসে। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে পূর্ণতা দেওয়ার এটাই একমাত্র মাধ্যম।[১১৬]

তিনি বিষ্ণুর চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তিনি দ্বিতীয় ঈশ্বর। আসমান-জমিন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সবকিছুকে সংরক্ষণ করেন। সবদিকে তার চক্ষু রয়েছে। এমনকি চেহারাও রয়েছে তার সর্বদিকে। আরও রয়েছে অনেক হাত ও পা। তিনি একক ও অদ্বিতীয়।[১১৭]

আর তিনি একক সত্তা, যাকে বলা হয় 'পরমপুরুষ'। তার রয়েছে হাজার হাজার মস্তক, চক্ষু ও পা। তিনি সকল জগতকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তবে তিনি জগৎ থেকে পৃথক। যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে, সবকিছুই তার পক্ষ থেকে। তিনি চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী। তার কোনো কাজের কারণে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয় না। কেননা, তার সকল কাজই কল্যাণময়।

---

[১১৫] খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ ও হিন্দুদের এই ত্রিত্বের মাঝে পাঠক তুলনা করে দেখতে পারেন।

[১১৬] পৃষ্ঠা : ৩০।

[১১৭] ঋগ্বেদ, মণ্ডল : ১০, সূক্ত : ৮১, শ্লোক : ২-৪।

বৈদান্তিক চিন্তাধারা

হিন্দু পণ্ডিত বিবেকানন্দ[১১৮] বলেন, 'সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় এই জগৎ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে। পদার্থ, আত্মা ও সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেকেই অবিনশ্বর। এর কোনোটির ওপর কালের কোনো প্রভাব নেই। এর কোনোটিই ধ্বংস হবে না। সৃষ্টিকর্তা যতদিন থাকবেন, জীবনও ততদিন থাকবে। একইভাবে সৃষ্টিও ততদিন চলতে থাকবে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় তাতে পরিবর্তন আসবে। সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক কালে প্রত্যেক স্থানে অস্তিত্বশীল। সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। তার কোনো অনুভব করার মতো আকৃতি নেই। কেউ তার মর্যাদায় পৌঁছতে পারে না। কেউ যদি নিজেকে ঈশ্বর দাবি করে, সে যেন তাকে অস্বীকার করলো।[১১৯]

পৌরাণিক চিন্তাধারা

পুরাণকে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ বিবেচনা করা হয়। এর পুস্তক সংখ্যা অগণিত। কিন্তু এর প্রত্যেকটি বেদব্যাসের দিকে সম্বন্ধিত। পুরাণের রচয়িতাগণ জগৎসৃষ্টির বর্ণনায় পারস্পরিক বিরোধমূলক বর্ণনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে তারা অনেক অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বর্ণনাও দিয়েছেন। এখানে পাঠক সমীপে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো।

দেবী ভগবত পুরাণের বর্ণনায় বলা হয়েছে, এই জগতের সৃষ্টিকর্তা হলেন শ্রীপুরের একজন নারী। তার নাম শ্রী। শ্রী নামক এই নারী হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তিন দেবতা তথা ব্রহ্মা (জীবনের স্রষ্টা), বিষ্ণু (রুজি দানকারী) ও মহেশ (আত্মা সংহারক)-কে সৃষ্টি করেছেন। যখন এই নারীজগৎ সৃষ্টি করতে মনস্থ করলেন, তখন স্বীয় হস্তদ্বয় একটির ওপর অপরটি স্থাপন করলেন। অতঃপর সেখান থেকে ব্রহ্মা বের হলেন। তখন শ্রী ব্রহ্মাকে নির্দেশ দিলেন তাকে বিয়ে করতে। কিন্তু ব্রহ্মা অস্বীকার করলেন। কেননা, ব্রহ্মা নিজেকে তার সন্তান মনে করতেন। এতে শ্রী প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হন এবং ব্রহ্মাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিলেন। এরপর শ্রী পূর্ব কর্মের (এক হাতের ওপর অন্য হাত স্থাপন করা) পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। এবারে সেখান থেকে বিষ্ণু বের হলেন। তিনি বিষ্ণুকেও নির্দেশ দিলেন তাকে বিয়ে করতে। কিন্তু বিষ্ণুও তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলেন। তাই তিনি বিষ্ণুকেও পুড়িয়ে ভস্ম করে দিলেন। এরপর শ্রী তার পূর্বকর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। এবারে সেখান থেকে মহেশ বের হলেন। তিনি মহেশকেও নির্দেশ দিলেন

---

[১১৮] বিবেকানন্দকে রামকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শিষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে তিনি আমেরিকাতে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি মনে করতেন, ধর্ম শুধু বিবেক ও বর্ণনার ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বরং সেখানে আত্মিক সাধনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি ওয়াহদাতুল উজুদকে অস্বীকার করতেন।

[১১৯] HINDUISM, Page no. 61-64

তাকে বিয়ে করতে। মহেশ শর্তসাপেক্ষে বিয়ে করতে রাজি হন। কিন্তু শর্ত দিলেন শ্রীর সুরত পরিবর্তন করতে হবে। শ্রী তা-ই করলেন। এরপর মহেশ দাবি করলেন তার দুই ভাইকে (ব্রহ্মা ও বিষ্ণু) জীবিত করে দিতে হবে। শ্রী এই দাবিও মেনে নিলেন। তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। এরপর মহেশ দাবি করলেন আরও দুজন নারী সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তার ভ্রাতাদ্বয়ও বিবাহ করতে পারে। শ্রী এই দাবিও মেনে নিয়ে দুজন নারী সৃষ্টি করলেন। এরপর তারা সকলে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এই হচ্ছে তিন দেবতা, যারা জগৎ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর এই জগৎ পরিচালনা করছেন।[১২০]

হিন্দুরা তাদের পবিত্র গ্রন্থাদিতে তাদের প্রতিপালকের দিকে এমন সব গুণ ও কর্মকাণ্ড আরোপ করে, যা একজন সাধারণ মানবের ওপর আরোপ করাও লজ্জাজনক। মহান আল্লাহ তাআলা তাদের এহেন বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্র।

দুই. অবতারবাদ

সংস্কৃত ভাষায় অবতার অর্থ হলো অবতরণ করা। হিন্দুদের পরিভাষায় অবতার বলা হয়, 'মানব সংশোধনের নিমিত্তে স্বয়ং ঈশ্বর মানবাকৃতিতে পৃথিবীতে নেমে আসা।' এটি গীতায় প্রদত্ত সংজ্ঞা।

কৃষ্ণ বলেন, সৎলোকদের উদ্ধার করতে, দুষ্ট লোকদের দমন করতে এবং ধর্মের বিধান পুনপ্রতিষ্ঠা করতে আমি নিজেই বারংবার নেমে আসবো।

তিনি আরও বলেন, যেখানেই ধর্মপালনে বিকৃতি দেখা দেবে, অধর্ম বেড়ে যাবে, আমি নিজেই নেমে আসবো।[১২১]

তিনি আরও বলেন, যখন অসত্যের সামনে সত্য প্রকম্পিত হবে, দুষ্ট লোকেরা সৎলোকদের ওপর প্রাধান্য পাবে, তখনই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও সৎলোকদের রক্ষা করতে ভগবান পৃথিবীতে নেমে আসবেন।

অবতারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীদয়াল গোবিন্দ বলেন, অবতার অর্থ হলো গোপন জগৎ থেকে দৃশ্যমান জগতে প্রকাশিত হওয়া।

ভগবত গীতায় অবতারের চারটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। যথা :

ক. সন্ন্যাসী ও পূজারিদেরকে পাপিষ্ঠদের ওপর বিজয়ী করা।

খ. মিথ্যুকদের ধ্বংস করার পর পৃথিবীতে সফলতা অর্জন করা।

---

[১২০] যথার্থ প্রকাশ, অধ্যায় : ১১।
[১২১] গীতা, শ্লোক : ৭।

গ. পৃথিবীকে পাপের ভার থেকে মুক্তি দেওয়া।

ঘ. সকলের জন্য উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করা।

অবতারের প্রকারভেদ

অবতার চার প্রকার। যথা :

ক. পূর্ণাবতার

এ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণ অবতরণ। পূর্ণ অবতার হওয়ার জন্য শর্ত হলো, প্রেরিত অবতার ব্রহ্মার মতো অসীম শক্তিসম্পন্ন হওয়া। যেমন রাম, কৃষ্ণ প্রমুখ। কেননা, তাদের উৎস হলো স্বয়ং ঈশ্বর। অবাধ্য ও পাপিষ্ঠদের দমন করতে ঈশ্বর তাদের রূপে অবতরণ করেছেন।

ইতিপূর্বে রামায়ণ গ্রন্থের আলোচনার সময় আমরা রামের ঘটনার বিবরণ দিয়েছি। এখানে আমরা হিন্দু ধর্মগ্রন্থের আলোকে কৃষ্ণের ঘটনা বিবৃত করছি।

হাজার হাজার বছর আগের কথা। মথুরা অঞ্চলে কংস নামক এক অত্যাচারী রাজত্ব করতো। তার বোনের নাম ছিল দেবকি। দেবকির সঙ্গে বিবাহ হয় বাসুদেব নামক এক ব্যক্তির। গণকগণ কংসকে জানায় যে, তার তার বোনের অষ্টম পুত্র তাকে হত্যা করবে। তার রাজত্ব দখল করবে। তখন কংস তার বোন ও ভগ্নীপতিকে বন্দি করে রাখে।

জেলখানায় তাদের ছয় সন্তান জন্ম নেয়। কংস তাদের প্রত্যেককে হত্যা করে। সপ্তম সন্তান কৌশলে রক্ষা পায়। অতঃপর অষ্টম সন্তান কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলে তার পিতা সন্তানের জীবনরক্ষার উপায় খুঁজতে থাকে। কেননা, গণকদের ভবিষদ্বাণী অনুযায়ী এই সন্তান তাকে রক্ষা করবে। তাই তিনি রাতের অন্ধকারে গোপনে জেল থেকে বের হন। এ সময় কৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পায়। সে রাতে জেলের দরজা খোলাই থাকে এবং প্রহরীরাও ঘুমিয়ে পড়ে। পিতা কৃষ্ণকে নিয়ে যমুনার অপর পাড়ে গোকুল রাজ্যে যান। সেখানে তার এক বন্ধু ছিল নন্দ নামে। সে রাতে নন্দের একটি কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করে। উভয় বন্ধু সন্তান অদল-বদল করেন। বাসুদেব বন্ধুর কন্যাকে নিয়ে জেলখানায় ফিরে আসেন।

ভোরে কংসকে কন্যা সন্তান জন্মানোর খবর জানানো হয়। তখন কংস গণকদের ওপর রাগান্বিত হন এবং তাদেরকে তিরস্কার করেন। কেননা, তারা বলেছিল পুত্রসন্তান জন্ম

নেবে এবং তাকে হত্যা করবে। কংস কন্যাসন্তানটিকে নিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তখন বাচ্চাটির মুখ থেকে আওয়াজ বের হয়, 'তোমার হন্তারক জীবিত আছে। মারা যায়নি।'

কৃষ্ণ নন্দের কাছেই বেড়ে উঠতে থাকেন। তিনি যুবতীদের সঙ্গে খেলাধুলা করতেন, গরুর রাখালি করতেন আর তাদের দুধপান করতেন। এই হলেন ব্রহ্মার অবতার কৃষ্ণ, যিনি পরবর্তী সময়ে অত্যাচারী কংসকে হত্যা করে পৃথিবীবাসীকে তার অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন।

খ. অংশাবতার

অর্থাৎ যাকে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অংশাবতার প্রথম প্রকার অবতারের চেয়ে নিম্ন স্তরের হয়ে থাকেন। যেমন, নৃসিংহ। ইনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শুধু হিরণ্যকশিপু নামক দানবকে দমন করার জন্য এসেছিলেন।

অবতার নৃসিংহ-সংক্রান্ত রূপকথার বর্ণনাটি হলো, হিরণ্যকশিপু ছিলেন একজন দৈত্যরাজ। তার প্রহ্লাদ নামক এক সন্তান জন্ম লাভ করে। এই শিশুটি বিষ্ণুর পূজা করতো। তার পিতা হিরণ্যকশিপু ঈশ্বরকে অস্বীকার করতেন এবং নিজেকে ঈশ্বর দাবি করতেন। তাই পুত্র কর্তৃক বিষ্ণুর পূজা করায় তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। তিনি নানা কৌশলে পুত্রকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। যেমন সমুদ্রে নিক্ষেপ করা, হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করা এবং সর্বশেষ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু দেবতা বিষ্ণু তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন। ফলে সবগুলো ক্ষেত্রেই তিনি নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এতে করে বিষ্ণুর প্রতি তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। তিনি সকাল-সন্ধ্যা বিষ্ণুর কীর্তন করতে থাকেন। স্বীয় সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে পিতা তাকে ক্রোধান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার দেবতা বিষ্ণু কি এই স্তম্ভের মধ্যেও আছেন?' প্রহ্লাদ হ্যাঁ-সূচক জবাব দেন। তখন হিরণ্যকশিপু স্তম্ভটিকে পা দিয়ে সজোরে আঘাত করে। এতে স্তম্ভটি ভেঙে দুই টুকরা হয়ে যায়। এবং সেখান থেকে অবতার নৃসিংহের আকৃতিতে বিষ্ণু বের হয়ে আসেন। নৃসিংহ হলেন তিনি, যার শরীর মানবাকৃতির আর মাথাটা সিংহাকৃতির। নৃ তথা মানব ও সিংহের আকৃতির সমন্বয়ে গঠিত বলেই তাকে এই নামে নামকরণ করা হয়। এরপর নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে পাকড়াও করে নিজের হাঁটুর ওপর রাখে এবং স্বীয় নখর দ্বারা তার পেট চিরে ফেলে। এতে করে হিরণ্যকশিপু মারা যায়।

এভাবেই অত্যাচারী হিরণ্যকশিপুর কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে। গল্পের শেষে নৃসিংহ প্রহ্লাদকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী কিছু চাইতে নির্দেশ দেন। প্রহ্লাদ নিজেকে কামনা-বাসনা

থেকে মুক্তি দিতে বলেন এবং তার পিতাকে ক্ষমা করে দিতে বলেন। নৃসিংহ তার চাহিদা পূরণ করেন। নিজ দায়িত্ব পালনপূর্বক নৃসিংহ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান।

এই কল্পকাহিনিকে হিন্দুরা আবেগ-অনুভূতিকে নাড়া দেওয়া ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। কেননা, এই গল্প জালিম পিতার প্রতি পুত্রের সদাচারের নমুনা। পাশাপাশি এতে রয়েছে কল্যাণ-অকল্যাণ, সত্য-অসত্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিরন্তন কাহিনি, যা হিন্দু দর্শনের মৌলিক আলোচ্য বিষয়। কালের পরিক্রমায় হিন্দুগণ বিষ্ণুর এই পূজারিকে তাদের অভ্যাস অনুযায়ী দেবতা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। হিন্দুগণের অভ্যাস হলো: তারা প্রাকৃতিক ও মানবিক শক্তিসমূহকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে পূজা করতে শুরু করে।

এই গল্পটি ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।

গ. কালা অবতার

অংশাবতারের পরেই কালা অবতারের অবস্থান। যেমন মুনি কশ্যব। *মনুস্মৃতি*সহ অন্যান্য গ্রন্থে তার ঘটনা এভাবে বিবৃত হয়েছে, ব্রহ্মা স্বীয় সত্তা থেকে জগৎ সৃষ্টি করতে মনস্থ করলেন। এ লক্ষ্যে তিনি সৃষ্টিকুলের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একে একে চারজন পুত্র জন্ম দিলেন। কিন্তু কেউই মানবসৃষ্টির কারণ হতে চাইল না। অতঃপর তিনি পঞ্চমজনকে সৃষ্টি করলেন। তার নাম ছিল শংক।

এই পঞ্চমজন পাঁচ বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তার জীবন অমর হয়। অতঃপর ব্রহ্মা ষষ্ঠ পুত্র সৃষ্টি করলেন। এই পুত্রের নাম মুনি কশ্যপ। তার থেকেই জগতের সৃষ্টি।

ঘ. অধিকারী অবতার

অধিকারী অবতার হলেন সেই, যাকে ব্রহ্মার মতো শক্তি প্রদান করা হয়; অতঃপর সে শক্তি খর্ব হয়ে যায়। যেমন বেদব্যাসের ক্ষেত্রে হয়েছিল। বেদান্ত ও পুরাণ রচনার সময় তাকে সেরকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর কার্যসমাপনান্তে সে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আর তিনি অবশিষ্ট জীবন সাধারণ মানুষের মতোই যাপন করেন।

হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী অবতারের সংখ্যা ২৪ জন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ অবতারগণের আলোচনা আমি উপস্থাপন করেছি।

কোনো কোনো আধুনিক হিন্দু-গবেষক অবতারবাদ আকিদায় অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেছেন। মানবাকৃতিতে ঈশ্বরের অবতরণের বিষয়টি অসম্ভব বুঝতে পেরে তারা এটিকে ইসলাম ধর্মের নবি-রাসুলদের মতো একটি বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়াস

চালিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা বেদান্ত ও পুরাণসহ হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থাবলিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেছেন।

প্রখ্যাত পণ্ডিত সত্যপ্রকাশের কিছু আলোচনা আমি পাঠক সমীপে তুলে ধরছি। তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থে রিসালাতের আকিদা বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণাধর্মী লেখা লিখেছেন। তিনি বলেন, ঋগ্বেদের দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

'অগ্নি দ্যোতং ওরি মহি'

'আমি অগ্নিকে দূত হিসেবে চয়ন করলাম।'

অগ্নি = দূতের নাম। দ্যোতং = দূত। ওরি মহি = চয়ন করলাম। কিন্তু পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণ এই শ্লোকের দ্যোতং শব্দের অর্থ করেছেন ঈশ্বর/দেবতা। আর অগ্নিকে বলেছেন আগুনের দেবতা।

স্বয়ং বেদেই একটি শ্লোক রয়েছে যা পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের এই ব্যাখ্যাকে ভুল প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। শ্লোকটি হলো : 'মনু সহ্য কুনমং' তথা নিশ্চয় অগ্নি মানবই।

এ ধরনের বিভিন্ন শ্লোক উল্লেখপূর্বক এই পণ্ডিত প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হিন্দুধর্মে অবতারবাদ একটি বিকৃত বিশ্বাস। এটি মূলত আসমানি ধর্মগুলোর নবি-রাসুলের আকিদা।

তিন. পুনর্জন্মবাদ

পুনর্জন্ম বলতে বোঝানো হয়, আত্মার এক দেহ থেকে বের হয়ে স্বীয় কর্মফল অনুযায়ী অন্য দেহে প্রবেশ করাকে। মানবাত্মা নিজ দেহ ত্যাগ করে জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গের দেহে প্রবেশ করে। এর বিপরীতে পুরাণের শিক্ষায় বলা হয়েছে, মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য তথা ঈশ্বরের উপাসনা থেকে বিচ্যুত হলে তার আত্মা এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চতুষ্পদ জন্তু, পাখি ও কীট-পতঙ্গের দেহ ঘুরে পুনরায় মানবদেহে প্রবেশ করে।

একজন হিন্দু পণ্ডিত বলেন, পুনর্জন্মের কারণ হলো :

ক. আত্মা দেহ ত্যাগ করলেও পার্থিব জগতের সঙ্গে তার মায়া, কামনা-বাসনা সম্পৃক্ত থেকে যায়, যা সে ভোগ করতে পারেনি অর্থাৎ আত্মা অতৃপ্ত থেকে যায়।

খ. আত্মা দেহ ত্যাগ করে। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের দরুন তার অনেক দেনা থেকে যায়। এই দেনাগুলো শোধ করা তার কর্তব্য। দেনা থেকে যাওয়ায় অন্য

জীবনে তার ইহজন্মের কামনা-বাসনা পূরণ করা আর সম্ভব হবে না। এবং আত্মা তার পূর্ব জীবনের কর্মের ফল ভোগ করতে থাকবে।[১২২]

এই আকিদাটির ভিত্তি হলো হিন্দুদের ওই আকিদা, যেখানে বলা হয়: ঈশ্বর, আত্মা ও পদার্থ অবিনশ্বর। আত্মা কখনোই পূর্ণাঙ্গরূপে ধ্বংস হয় না। বরং এক দেহ থেকে বের হয়ে অন্য দেহে প্রবেশ করে। প্রলয় সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এই চক্র চলতে থাকে।

হিন্দুধর্মে প্রলয়

হিন্দুধর্ম অনুযায়ী পৃথিবীর বয়স চার স্তরে বিভক্ত। স্তরগুলো হলো—

- সত্য যুগ। সততা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার যুগ।
- ত্রেতা যুগ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ।
- দ্বাপর যুগ। বিশৃঙ্খলার যুগ।
- কলি যুগ। অন্ধকার ও অজ্ঞতার যুগ।

এই চার যুগের প্রতিটির রয়েছে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য। যেমন :

- সত্য যুগ : এই যুগে যারা শুধু ধর্মকে ভালোবাসেন, তারাই জন্মগ্রহণ করেন।
- ত্রেতা যুগ : এই যুগে যারা ধর্মের পাশাপাশি পার্থিব জগৎকেও ভালোবাসেন, তারা জন্মগ্রহণ করেন।
- দ্বাপর যুগ : এই যুগে যারা ধর্ম ও জগতের পাশাপাশি কামনা-বাসনাকেও ভালোবাসেন, তারা জন্মগ্রহণ করেন।
- কলি যুগ : এই যুগে যারা শুধু কামনা-বাসনার পেছনে ছোটাছুটি করেন, তারা জন্মগ্রহণ করেন।

প্রত্যেকটি স্তরের ব্যাপ্তি লক্ষ লক্ষ বছর। যেমন :

- সত্য যুগ : ৪৮০০ দৈব বছর।
- ত্রেতা যুগ : ৩৬০০ দৈব বছর।
- দ্বাপর যুগ : ২৪০০ দৈব বছর।
- কলি যুগ : ১২০০ দৈব বছর।

উল্লেখ্য, ১ দৈব বছর মনুষ্য ৩৬০ বছরের সমান।

---

[১২২] *সাকাফাতুল হিন্দ ওয়া বিজহাতুহার রুহিয়্যা*, পৃষ্ঠা : ৪৩।

এই কার্যক্রম পরিপূর্ণ হওয়ার পর জগতের পুনরাবৃত্তি হয়। সত্য যুগ থেকে নিয়ে কলি যুগ অতিবাহিত হয়। এভাবে কয়েক লক্ষ বার পুনরাবৃত্তির পর প্রলয় সংঘটিত হয়। আত্মা পরিভ্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। এরপর পুনরায় জগৎ সৃষ্টি হয় এবং একই কার্যক্রম চলতে থাকে। একবার, দুইবার, তিনবার—এভাবে অসীম সময়ব্যাপী চলতে থাকে।[১২৩]

এর কারণ তারা যেটা বর্ণনা করে থাকেন, তা হলো : আত্মার তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা :

ক. সত্যগুণ

এর আলামত হচ্ছে, আত্মা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হবে।

খ. তামসগুণ

এর আলামত হচ্ছে, আত্মা জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে থাকবে। তার ওপর নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে।

গ. রজুগুণ

এর আলামত হচ্ছে, আত্মা কোনো কোনো সময় কল্যাণকর কাজে আগ্রহী হবে। আবার কোনো কোনো সময় কল্যাণের প্রতি অনীহা প্রকাশ করবে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই মূলত আত্মা বারংবার ফিরে আসে। উদ্দেশ্য হলো আত্মা নিকৃষ্ট গুণ থেকে মুক্ত হয়ে উচ্চমার্গে পৌঁছায়। মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সত্যগুণে পৌঁছতে সক্ষম হয়। অন্যথায় আত্মা দেহ থেকে দেহে স্থানান্তরিত হতে থাকে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত এই পরিক্রমা চলতে থাকে।

আত্মার চিরন্তনতা বা নিত্যতার এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে হিন্দু পণ্ডিতগণ পুনর্জন্মবাদ প্রমাণের জন্য বেশ কিছু দলিল-প্রমাণ খাড়া করতে চেষ্টা করেন। এখানে তেমনই কয়েকটি দলিল-প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করছি।

---

[১২৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন *যথার্থ প্রকাশ*, অধ্যায় : ৮।

প্রথম দলিল

প্রকৃতি নিজেই এই পুনর্জন্মবাদের প্রমাণ বহন করে। কেননা, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রত্যেকেই উদিত হয় আবার অস্ত যায়। দেখা দেয় আবার চক্ষুর আড়ালে যায়। নক্ষত্রগুলো একেক সময় একেক ছায়াপথে অবস্থান করে। একইভাবে আত্মাগুলোও স্থানান্তরিত হয়।

দলিল খন্ডন

সূর্য কখনো চন্দ্র হয়ে যায়নি। চন্দ্রও কখনো সূর্য হয়ে যায়নি। একইভাবে নক্ষত্রও কখনো সমুদ্র হয়ে যায়নি। বরং সবকিছুই সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে আপন আপন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। পক্ষান্তরে তোমাদের দর্শনে আত্মা কখনো মানুষের দেহে অবস্থান করে তো আবার কখনো কুকুরের দেহে স্থান নেয়। একই আত্মা আবার কখনো শূকরের দেহেও স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং প্রকৃতি আর আত্মার মাঝে তুলনা করে দেখুন যে, তাতে কোনো ধরনের মিলমিশ খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

দ্বিতীয় দলিল

পুনর্জন্ম যদি বাস্তবসম্মত না হয়, তাহলে সকল শিশু এক রকমই জন্ম নেওয়া উচিত। কেন তাহলে কোনো শিশু অন্ধ, কোনোটি আবার বধির, আবার কোনোটি খোঁড়া হয়ে জন্মায়? এতে আত্মার কোনো প্রভাব যদি নাই থাকে, তাহলে বলতে হবে, সৃষ্টিকর্তা ইনজাস্টিস তথা বেইনসাফি করেছেন। কেননা, তিনি কোনো অপরাধ ব্যতিরেকেই শিশুটিকে শাস্তি দিলেন। সৃষ্টিকর্তা তো এমন হতে পারেন না।

দলিল খন্ডন

শিশুর জন্মের ভিন্নতা যদি আত্মার পুনর্জন্মের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে যৌবনে সুস্থ ও সুঠাম দেহের অধিকারী বার্ধক্যে গিয়ে কেন দুর্বল হয়ে পড়ে? এমনকি আরও বয়স বাড়লে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অন্ধ হয়ে যায়? জীবিত অবস্থাতেই কি তার দেহে অন্য আত্মা প্রবেশ করে? কিন্তু আপনারা তো সেটা বলেন না। আপনাদের দাবিমতে মৃত্যুর পরই আত্মার দেহ পরিবর্তন ঘটে। শিশুর বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা মূলত উত্তরাধিকার সূত্রে হয়ে থাকে, যা আপনারাও স্বীকার করে থাকেন।

তৃতীয় দলিল

তারা বলেন, পুনর্জন্মকে অস্বীকার করলে আত্মাসমূহকে অকার্যকর সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে; অথচ আত্মা অবিনশ্বর।

দলিল খণ্ডন

তাদের এই দাবি অন্য একটি ভ্রান্তবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আর তা হলো, আত্মা ও পদার্থের অবিনশ্বর হওয়া। তাদের মতে, সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করতে গিয়ে আত্মা ও পদার্থের মুখাপেক্ষী। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সৃষ্টিকর্তা সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী ও সর্বক্ষমতাময়। এমনকি হিন্দুরাও সৃষ্টিকর্তার এই সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে। তারা সৃষ্টিকর্তাকে সর্বশক্তিমান বলে থাকে।

তাদের এই তৃতীয় দলিলটি কুরআনের ওই আয়াত দিয়েও খণ্ডন করা যায়, যেখানে বলা হয়েছে—

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

বলে দিন : রুহ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত। [সুরা ইসরা, আয়াত : ৮৫]

চতুর্থ দলিল

তারা বলে থাকেন, যারা পুনর্জন্মকে অস্বীকার করে এবং সীমিত ও স্বল্প আমলের দ্বারাই চিরস্থায়ী স্বর্গ-নরকের দাবি করেন, তারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে বেইনসাফির কথাই বলে থাকেন। তাই ঈশ্বরকে জুলুমের তকমা থেকে বাঁচাতে হলে পুনর্জন্মের কথা বলতেই হবে।

দলিল খণ্ডন

শাস্তি কিংবা পুরস্কারকে শুধু সময় কিংবা স্থান দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। বরং এ ক্ষেত্রে মূল কার্যকারণ হচ্ছে, কর্মের প্রভাব, চাই সেটা ভালো হোক কিংবা খারাপ। আমাদের পার্থিব-জীবনেও আমরা তেমনটাই দেখতে পাই। কোনো প্রতিদান কিংবা উৎসাহ ব্যতিরেকে মানুষ কত বিশাল বিশাল কাজই না করে ফেলে। অপরদিকে মানবসমাজে প্রভাব বিস্তারকারী অনেক ছোট ছোট কাজের বিনিময়ে মেলে বিশাল বিশাল পুরস্কার।

অন্য দিক থেকে আমরা বলতে পারি, যারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন, তারা বলে থাকেন, মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। অতঃপর চিরস্থায়ী সুখ ভোগ করে। আর কখনোই পৃথিবীতে ফিরে আসে না। প্রশ্ন হলো, এটাও সীমিত কর্মের বিপরীতে অসীম প্রতিদান হয়ে গেল না?

এই হচ্ছে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পুনর্জন্মবাদের আকিদা।

এই আকিদা-বিশ্বাসটি ইসলাম থেকে বিচ্যুত কিছু ফিরকার মধ্যেও প্রবেশ করতে দেখা গেছে।

আবু মুহাম্মদ ইবনে হাজম বলেন, পুনর্জন্মবাদের বক্তারা দুই দলে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম দলের মতামত হলো আত্মাগুলো দেহত্যাগের পর অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয়। নতুন দেহগুলো ছেড়ে আসা দেহের অনুরূপ নাও হতে পারে।

এই দাবির সপক্ষে রয়েছেন আহমদ বিন হাবেত, তার শিষ্য আহমদ বিন নামুস, আবু মুসলিম খোরাসানি, মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আররাজি। তিনি *আল-ইলমুল ইলাহি* নামক গ্রন্থে এটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এটি কারামিতাদের বক্তব্যও। আররাজি তার কোনো কোনো গ্রন্থে বলেন, জবেহ কিংবা হত্যার মাধ্যমে যদি পশু আকৃতির দেহ থেকে আত্মাকে মানবাকৃতির দেহে রেহাই প্রদান করা না হতো, তাহলে কখনোই কোনো প্রাণীকে জবেহ করা বৈধ হতো না।

ইবনে হাজম বলেন, এই বক্তব্য নিরেট কল্পকাহিনি ও উদ্ভট দাবি বৈ কিছু নয়। তারা বলে, মূলত শাস্তি কিংবা প্রতিদানের নিমিত্তেই আত্মার স্থানান্তর ঘটে। সুতরাং মন্দাচারীর আত্মা নিকৃষ্ট জন্তুর দেহে স্থানান্তরিত হয়, যা পরে যন্ত্রণা ও বধের সম্মুখীন হয়।

কিন্তু যেসব আত্মার সবকিছুই মন্দ, এদের পরিণতি নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। তাদের কেউ কেউ বলেন, এই শ্রেণির আত্মাগুলো হলো শয়তান। আহমদ ইবনে হাবেত বলেন, এই আত্মাগুলো জাহান্নামে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে স্থায়ীভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকে।

আবার যেসব আত্মার সবকিছুই কল্যাণময়, সেসব আত্মার ব্যাপারেও তারা মতানৈক্য করেছেন। তাদের কেউ কেউ মনে করেন, এই শ্রেণির আত্মা হলেন ফেরেশতা। আহমদ ইবনে হাবেত বলেন, সন্দেহাতীতভাবে এসব আত্মা জান্নাতে স্থানান্তরিত হয় এবং স্থায়ীভাবে নিয়ামত ভোগ করতে থাকেন।

ইসলামের লেবাস ধারণকারী এই দলটি অর্থাৎ আহমদ ইবনে হাবেত ও আহমদ ইবনে নামুস পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত দিয়ে তাদের মতের সপক্ষে প্রমাণ খাড়া করতে চেষ্টা করে। আয়াতগুলো হলো—

يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ.

হে মানুষ, কীসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামতো আকৃতিতে গঠন করেছেন। [সুরা ইনফিতার, আয়াত : ৬-৮]

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ

তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। [সুরা শুরা, আয়াত ১১]

ইবনে হাজম বলেন, এই দলটি দলিল দেওয়ার চেষ্টা করে যে, আত্মার ক্ষয় নেই। একইভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জগতেরও ক্ষয় নেই। সুতরাং আত্মা সর্বদাই স্থানান্তরিত হয়। আর আত্মার এই স্থানান্তর তার নির্দিষ্ট শ্রেণিতে না হয়ে অন্য শ্রেণিতে হওয়া উত্তম।[১২৪]

এই ফিরকাগুলো যে দলিলসমূহ উপস্থাপন করেছে, তা খণ্ডন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, প্রথমত, তাদের বক্তব্য ইজমায়ে উম্মতের বিপরীত। দ্বিতীয়ত, এগুলো নিরেট হিন্দু-ব্রাহ্মণদের থেকে ধার করা বক্তব্য। এর সঙ্গে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই।

হিন্দু-সমাজে এই বিশ্বাসটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হলেও সূচনাতে এটি তাদের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এমনকি বর্তমানেও নতুন করে এই অযৌক্তিক আকিদার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তাদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

পরলোক আওর পুনর্জনম নামক গ্রন্থে লেখক গোবিন্দ পুনর্জন্মের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঘটনাটিতেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিষয়টি স্বয়ং স্বর্গীয় দূতদের মাঝেও মতবিরোধপূর্ণ।

---

[১২৪] *আল-ফসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান নিহাল*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯০-৯১।

ঘটনার বিবরণে বলা হয় : ওয়াজ সুরেশ দুধ দোহনের অনুপযুক্ত গাভি দান করতো। সে আশা করতো, এতেই তার পুণ্য মিলবে। কিন্তু তার পুত্র নচিকেতা আপত্তি করে বসলো। তখন পিতা রাগান্বিত হয়ে তাকে মৃতদের জগতে প্রেরণ করলেন। সে জগতে মৃত্যুদূত তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। এমনকি তার মতো বুদ্ধিমানের আগমনে আনন্দিত হলেন। মৃত্যুদূত তাকে নিজের ইচ্ছামতো প্রশ্ন করতে বললেন। তখন পুত্র প্রশ্ন করলো, লোকেরা মৃত্যু পরবর্তী মানুষের অবস্থা নিয়ে বিরোধ করে থাকে। তাদের কেউ কেউ বলে, মৃতদের আত্মা মৃত্যুর পরও অবশিষ্ট থেকে যায়। আবার অনেকে বিষয়টি অস্বীকার করে। এখানে বাস্তবতা আসলে কী? তখন মৃত্যুদূত বললেন, হে বুদ্ধিমান শিশু, এই বিষয়টি বোঝা অত্যন্ত কঠিন। এমনকি স্বর্গীয় দূতগণও আত্মার পরিণতি বিষয়ে কোনো হাদিস জানেন না। তুমি অন্য প্রশ্ন করো। কিন্তু ছেলেটি বারংবার প্রশ্নটি করতে লাগল। অবশেষে মৃত্যুদূত উত্তর দিলেন।

এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সূচনাতে পুনর্জন্মের বিষয়টি হিন্দু দার্শনিকদের কাছে সর্বসম্মত কোনো বিষয় ছিল না। নতুবা মৃত্যুদূত প্রথমে উত্তর দিতে গড়িমসি করতেন না। এ কথাও বলতেন না যে, স্বর্গীয় দূতগণও এই বিষয়ে অবগত নন।

আধুনিক কিছু হিন্দু পণ্ডিত পুনর্জন্মের এই আকিদাকে অস্বীকার করেছেন। তারা বেদের কিছু শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি পুনরুত্থান সংশ্লিষ্ট হিসেবে দাবি তুলেছেন।

ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, 'তোমরা সূর্যকে অর্জন করার জন্য চেষ্টা করো, যাতে তোমরা আগুনের পরিমাণ জানতে পারো। আমার দূত ভরত, ভিক্ষু ও মতর্ষি প্রত্যেকেই দুই জীবনে বিশ্বাস করে।'[১২৫] এখানে দুই জীবন বলতে পার্থিব জীবন ও পরকাল।

সেখানে আরও বলা হয়েছে, 'আমি যখন তোমাদেরকে চিরস্থায়ী খাবার গ্রহণের অনুমতি দেবো, তখন হে ইন্দ্র, তুমিও তাদের সঙ্গে থেকে যারা চিরস্থায়ী জীবন অর্জনের জন্য চেষ্টা করো।'[১২৬]

এই হলো পুনর্জন্ম-সংক্রান্ত বেদের আকিদা, যা আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা হিন্দু পণ্ডিত দয়ানন্দের সিদ্ধান্তের বিপরীত। পক্ষান্তরে দয়ানন্দ[১২৭] ও তার অনুসারীদের দাবিকে অস্বীকারকারীদের সংখ্যাও প্রচুর। তন্মধ্যে অন্যতম হলেন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন। তাকে ভারতে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আধুনিক বেদ-রচয়িতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি বলেন,

---

[১২৫] ঋগ্বেদ : ১/১১/৬০/১০।

[১২৬] ঋগ্বেদ : ১/৯/৪৪/৫।

[১২৭] জন্ম : ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু : ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।

'যারা পুনর্জন্মের কথা বলেছেন, তারা উপনিষদ যুগের মানুষ। সম্ভবত তারা জানতেন না যে, অচিরেই বিষয়টি সংশয়ের সৃষ্টি করবে। কোনো সুস্থ বিবেক এমন বিশ্বাস মেনে নেবে না।'

ড. ফরিদা চৌহান বলেন, 'হ্যাঁ, বেদ পুনর্জন্মকে সাব্যস্ত করে। কিন্তু শুধু একবারই পুনর্জন্ম হতে পারে। হাজারবার নয়।'[১২৮] এ কথা থেকে তিনি উদ্দেশ্য করেছেন মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে।

সত্যপ্রকাশ বলেন, 'যারা পুনর্জন্মের কথা বলে আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করছি এই বিশ্বাসের কথা বেদে নেই।'[১২৯]

হিন্দু পণ্ডিত দারকা শংকর, যিনি হিন্দু-মুসলিমের মাঝে দূরত্ব কমানোর উদ্দেশ্যে বেদে কুরআনিক শিক্ষা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। এমনকি তিনি স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্য অনেকটাই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তার প্রচেষ্টায় অনেক হিন্দু যুবক কুরআন অধ্যয়ন করতে শুরু করে। তিনি বলেন, যেসব আশ্চর্যজনক প্রশ্ন আমাকে করা হয়, তন্মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন হলো, বেদে কি আখিরাত দিবসের কথা বিবৃত হয়েছে? তিনি বলেন, এটি মূলত দেহের মধ্যে রুহের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করার মতো। বেদ তো আখিরাত দিবসের আলোচনায় ভরপুর।

এই হলো পুনর্জন্ম সম্পর্কে হিন্দুদের বিশ্বাস। আমি জানি না, এই আলোচনার পর তারা কী করবেন?

وَاللهُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, সরলপথ দেখিয়ে দেন। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৩]

চার. কর্মবাদ

কর্ম বা কাজ। হিন্দু ধর্মীয় পরিভাষায় কর্মবাদ বলতে উদ্দেশ্য হলো প্রতিদান-বিধি তথা মানুষ যদি তার কোনো একজন্মে সৎকাজ করে, তাহলে পরবর্তী জন্মে সে সেই ভালো কাজের প্রতিদান পাবে। একইভাবে কোনো একজন্মে যদি সে মন্দ কাজ করে, তাহলে পরবর্তী জন্মে সে তার মন্দ প্রতিদান পাবে।

---

[১২৮] *আত-তানাসুখ ওয়াল বেদ*, পৃষ্ঠা : ৯৩।
[১২৯] আগমন, পৃষ্ঠা : ১০৪।

যোগ বশিষ্ঠ গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'জগতের এমন কোনো স্থান নেই, চাই সেটা পাহাড়-পর্বত, আকাশ-সমুদ্র, এমনকি স্বর্গ হোক না কেন, মানুষ তার কর্মের প্রতিফল থেকে পালাতে পারে না। তার কর্ম পাপ কিংবা পুণ্য যাই হোক না কেন।'

কর্মবাদ হলো পুনর্জন্মবাদের ভিত্তি। কেননা, জালিম তার জুলুমের শাস্তি ভোগ করা ব্যতিরেকেই নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই হিন্দুরা পুনর্জন্মের আকিদা তৈরি করে নেয়। যাতে কোনো মানুষ কর্ম থেকে পালাতে না পারে। দ্বিতীয় জন্মে সে তা ভোগ করবে।

কর্মের তিন অবস্থা—

প্রথম অবস্থা : পরম্পরা কর্ম।

দ্বিতীয় অবস্থা : সঙ্গিতা কর্ম।

তৃতীয় অবস্থা : কিরামন কর্ম।

প্রথম অবস্থা : বর্তমান অবস্থাকে পরিচালিত করে। এবং মানুষের কর্মের প্রতিদান সুনিশ্চিত করে।

দ্বিতীয় অবস্থা : কর্মফল পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। তবে জ্ঞান দ্বারা তা দূর করা সম্ভব।

তৃতীয় অবস্থা : বর্তমানকে প্রভাবিত করে। আর তার ফল ভবিষ্যতে প্রকাশ পায়।

এতদসত্ত্বেও কোনো কোনো হিন্দু পণ্ডিত মনে করেন, কর্ম কখনো কখনো তার কার্য সম্পাদন করে না। অনেক কাজ উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব না ফেলেই শেষ হয়ে যায়।

তাই এসব পণ্ডিত নানা প্রকার উপাসনা-পদ্ধতি ও ধর্মীয় রীতি চালু করেন এবং দাবি করেন যে, এই কাজগুলো মানুষের আত্মার চক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম।

পাঁচ. নির্বাণ

হিন্দু দর্শনে কুলক্ষণ প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। তাই তাদের পণ্ডিতগণ এই কুলক্ষণ থেকে মুক্তির জন্য নির্বাণ আকিদার অবতারণা করেন। নির্বাণ অর্থ হলো মুক্তি। নির্বাণ বলা হয় আত্মার ওই অবস্থা, যেখানে বারংবার পুনর্জন্মের পর আত্মা উপযুক্ততা লাভ করে এবং নতুন করে আর পুনর্জন্মের মুখাপেক্ষী হয় না। তখনই সে আত্মা নির্বাণ লাভ করে এবং সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মিলিত হয়।

কৃষ্ণ বলেন, 'যে আমার প্রকাশের প্রকৃতি এবং আমার অলঙ্ঘনীয় কর্ম সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে, তাকে দেহত্যাগের পর এই জগতে পুনরায় জন্মাতে হবে না। বরং সে আমার চিরস্থায়ী জগতে প্রবেশ করবে।'[১৩০]

এখান থেকেই হিন্দুধর্মে 'ওয়াহদাতুল উজুদ' তথা সর্বেশ্বরবাদ আকিদার উৎপত্তি ঘটে। এই আকিদাটি প্রথম ভারতীয় সুফিদের চিন্তাধারায় প্রভাব ফেলে। অতঃপর সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ যেমন তুর্কিস্তান হয়ে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধারা থেকেই ইবনে আরাবি বলেন—

فما نظرت عيني إلى غير وجهه * وما سمعت أذني خلاف كلامه

আমার চক্ষু তাঁর চেহারা ভিন্ন অন্য কিছু দেখেনি,

আমার কর্ণ তাঁর কালাম ভিন্ন অন্য কিছু শোনেনি।

হিন্দুদের কাছে জীবনের সমুন্নত লক্ষ্য হলো কামনা-বাসনার দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা। কেননা, আত্মা দেহ থেকে দেহে স্থানান্তর হতে থাকে। এভাবে নির্বাণ লাভ করা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সুতরাং নির্বাণ হলো মূলে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ যেখান থেকে উৎপত্তি, সেখানে ফিরে যাওয়া এবং তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া। আর সেই উৎপত্তিস্থল হলেন ব্রহ্মা। এটাকেই সুফিদের পরিভাষায় 'ফানা ফিল্লাহ' বলা হয়।

দয়ানন্দ বলেন, আত্মার নির্বাণ লাভ এবং সুখভোগের পর পুনরায় দেহধারণ করে। এবং তার কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু হয়। কেননা, আত্মা অবিনশ্বর। কখনো ধ্বংস হয় না।

সন্দেহ নেই যে, সুফিবাদ ভারতীয় আকিদা-বিশ্বাস দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। হাল্লাজ, ইবনে আরাবির মতো সুফিদের 'ওয়াহদাতুল উজুদ' আকিদার উৎস হলো বেদান্ত, যা আব্বাসি খলিফা মামুনের যুগে দারুল হিকমাতে আরবিতে অনুবাদ হয়। এদিকে ইবনে আরাবি তার মাত্রভূমি আন্দালুসিয়া থেকে বের হওয়ার পর দীর্ঘ সময় প্রাচ্যে কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি প্রাচ্যের মাশায়েখ থেকে সুফিবাদের মৌলিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মক্কা মুকাররমায় তার বিখ্যাত গ্রন্থ *আলফুতুহাতুল মক্কিয়্যা* রচনা করেন। গ্রন্থটি ভারতীয় সুফিবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি দাবি করতেন, হাকিকতে মুহাম্মদি ওয়াহদাতুল উজুদেরই আরেক রূপ।

কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, 'তরিকায়ে আকবরিয়া' (ইবনে আরাবির উপাধি ছিল শাইখে আকবর। তার দিকে সম্বন্ধ করে তার তরিকাকে তরিকায়ে

---

[১৩০] গীতা, শ্লোক : ৯।

আকবরিয়া বলা হয়।) হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবির হাতে হিন্দুস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর এটি মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।[১৩১]

এটি অসম্ভব নয় যে, ইবনে আরাবি ওয়াহদাতুল উজুদে বিশ্বাসী তার শাইখ হাল্লাজের মতো হিন্দুস্তানে গিয়েছিলেন ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে। তবে এই দাবি প্রমাণ-সাপেক্ষ ব্যাপার।

গোল্ড জিহার ভারতীয় আকিদা-বিশ্বাস ও ইসলামি সুফিবাদের মতামতের মজবুত সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, সুফিদের জিকিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ধর্মীয় রিয়াজত-মুজাহাদার অনেকগুলো পদ্ধতি একইভাবে তাদের জজবায় পৌঁছে যাওয়াকে ক্রেমার ভারত থেকে উৎসারিত বলে প্রমাণ করেছেন।[১৩২]

ব্রহ্মার ফলাফল হলো ব্যক্তির নিঃশেষ হয়ে যাওয়া এবং ব্রহ্মাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া। এখান থেকেই হিন্দুদের মাঝে মৃতদেহকে পুড়িয়ে সৎকার করার নিয়ম চালু হয়েছে। যাতে জাগতিক দেহ থেকে আত্মা পুরোপুরি নিষ্কৃতি লাভ করে ঊর্ধ্বজগতে পৌঁছে যায়। আগুন হলো দেবতা অর্থাৎ অগ্নির ঈশ্বরত্বের নিদর্শন। এটি আত্মাকে পরমেশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয়।

মোটকথা, নির্বাণ হলো প্রত্যেক হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর পরম আকাঙ্ক্ষার সুমহান মর্যাদার স্তর। তখনই একজন মানুষ এ স্তরে পৌঁছতে পারে, যখন সে সকল কামনা-বাসনা, পার্থিব ও দৈহিক চাহিদার ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে এবং সর্বশেষ চাহিদাহীন সত্তায় পরিণত হবে।

---

[১৩১] তরিকায়ে আকবরিয়া নামে ড. আবু ওয়াফা আততাফতাজানি কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ দেখুন।

[১৩২] *আল-আকিদা ওয়াশ শরিয়া ফিল ইসলাম*, পৃষ্ঠা : ১৬১-১৬৪।

বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কাল্পনিক ও অবাস্তব জীবনের পথপ্রদর্শনকারী, মানুষের প্রয়োজন-নির্বাহে অক্ষম, মানবজীবনের কঠিন ও জটিল বিষয়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ ও পলায়নপর একটি আন্দোলনের নাম বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্ম মানবদর্শনের কাছাকাছি হলেও ধর্মদর্শন থেকে অনেক দূরে। কামনা-বাসনা ও দুঃখ-যাতনা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে নির্জনতা ও বৈরাগ্যবরণ বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা। তার প্রবর্তককে ঘিরে রয়েছে প্রেমাত্মক কাহিনি ও যুক্তি এবং বিবেক-বিরোধী নানা কল্পকথা।

কথিত আছে, বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা দক্ষিণ নেপালে কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী লুম্বানি[১৩৩] শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা 'শুদ্ধোধন'[১৩৪] শাক্য (বংশের) রাজা ছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন সময়ে শাক্য রাজা ছিলেন 'বোধিয়া' বা দন্দবানি'। ঐতিহাসিকগণ (শাক্য রাজা শুদ্ধোদন নাকি বোধিয়া) উক্ত বৈপরীত্য নিরসনে চরম দিশেহারা হয়ে পড়েন। বাস্তবতা বিবর্জিত অনেক ব্যাখ্যা দিয়ে মতবিরোধ নিরসনে তারা সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাদের অন্যতম ব্যাখ্যা হলো তৎকালীন শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ছিল। পার্লামেন্টের সদস্যদের সবাইকে রাজা বা বাদশা বলা হতো।

এরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে বৌদ্ধ দর্শন[১৩৫] গ্রন্থ প্রণেতাও সমাধানের চেষ্টা চালিয়েছেন। তবে ব্যাখ্যাটি যৌক্তিক না হওয়ায় গ্রহণ করা মুশকিল। কারণ, ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন ইতিহাসসম্মত নয়।

---

[১৩৩] তা 'নুতো তওয়া' রেলস্টেশনের পূর্বে প্রায় আট মাইল নিকটে।

[১৩৪] গোস্তাভ লি বোন বলেন, 'বুদ্ধ ঈসা আলাইহিস সালামের মতো কুমারী মায়ের সন্তান' (*হাদারাতুল হিন্দ* : পৃ : ৩৪৪)। এটি একটি ডাহা মিথ্যাচার। কারণ, ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ঐতিহাসিক সকলে একমত যে, তিনি মাতাপিতার স্বাভাবিক সন্তান। গোস্তাভ লি বোন থেকে ভারতীয় ধর্মের কিছু আরব ইতিহাসবিদও এই বর্ণনাটি গ্রহণ করেন।

[১৩৫] পৃষ্ঠা : ১৯। তিনি (রাহুল সাংকৃত্যায়ন) বৌদ্ধধর্মের প্রসিদ্ধ লেখকদের অগ্রগণ্য।

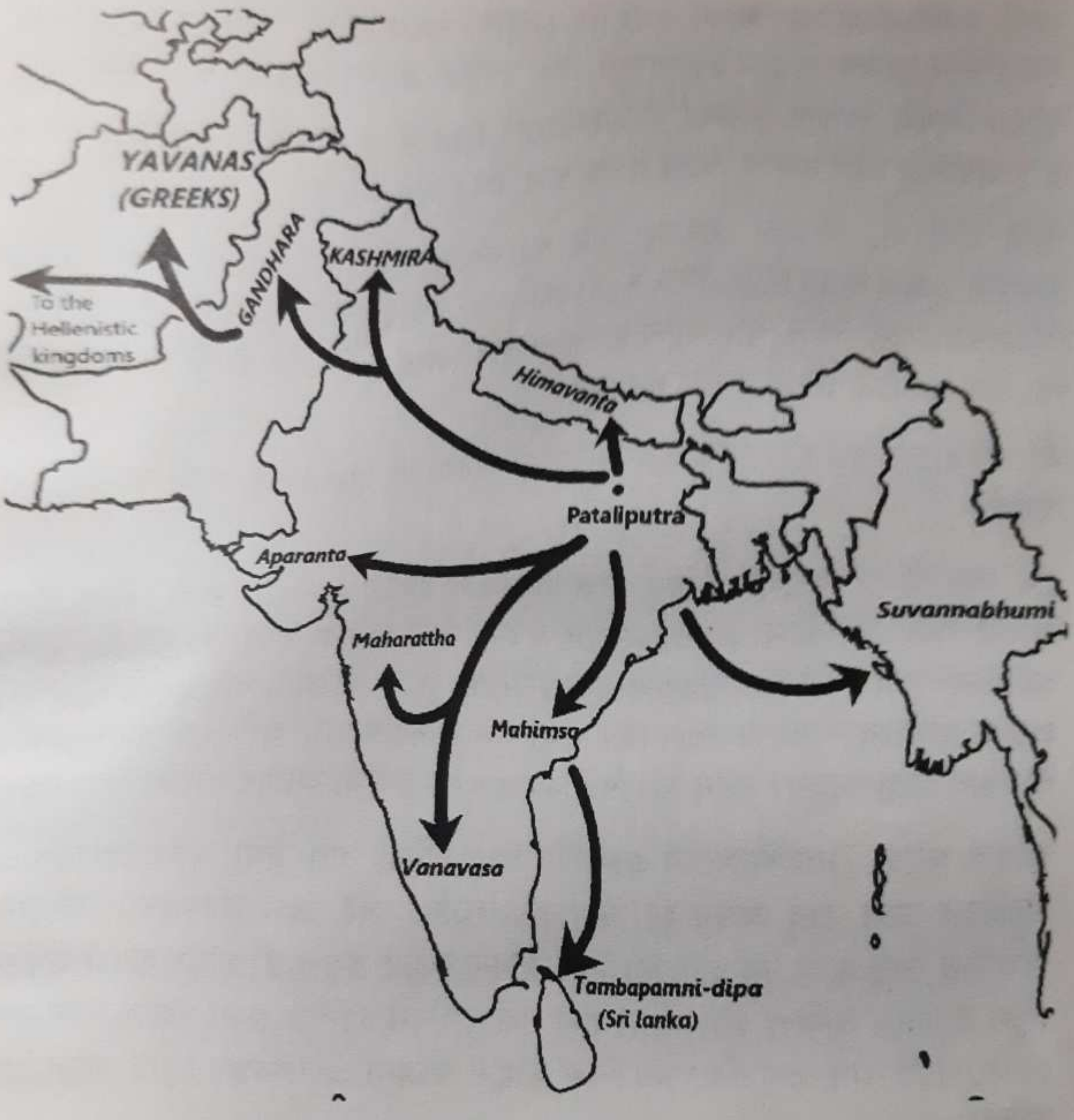
বুদ্ধ[১৩৬] ও তার ঐতিহাসিক অস্তিত্বের ব্যাপারে ইতিহাসবেত্তাদের মাঝে চরম মতদ্বৈততা রয়েছে। কারণ, তার তিরোধানের তিন শতাব্দী পর তার শিক্ষাদীক্ষা রাজা 'অশোকে'র[১৩৭] আমলে সংকলিত হয়। যিনি হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের প্রায় আড়াইশ বছর পূর্বে খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩ সনে ভারতবর্ষের রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। 'অশোক' বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম প্রচারক ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ প্রচারকদের চীন, জাপান, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা ও বার্মাসহ বহুদেশে প্রেরণ করেন। উপর্যুক্ত অন্ধকার শতাব্দীগুলোতে বৌদ্ধধর্মের প্রজ্ঞাপূর্ণ কথামালা ও শিক্ষাদীক্ষা পাথুরে ফলকে তিনি লিপিবদ্ধের নির্দেশ দেন। কালের জাদুঘরে তার অনেক কিছুই হারিয়ে যায়। আর যা অবশিষ্ট থাকে, তা-ও রাজা অশোকের যথাযথ যাচাই ও নিরীক্ষার অভাবের কারণে ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। ভারতে হিন্দুদের মাঝে একটি চিন্তাধারা প্রচলিত আছে এবং তা হলো, 'সকল উপযুক্ত দর্শনের উৎস হলো বেদান্ত[১৩৮]।' সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদের অভ্যাস হলো, ভিত্তিহীন উপদেশ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথামালা দ্বারা তারা সহসা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে।

---

[১৩৬] বুদ্ধ শব্দের মূল হলো বোধ (Budha)। অর্থাৎ জ্ঞানী। তার মূল নাম সিদ্ধার্থ (Sidharta)। তার জন্মতারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ আছে। সকলে ধারণা করে বলেন, ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের পাঁচ শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছিল।

[১৩৭] বুদ্ধের শিক্ষাসংবলিত প্রাচীন তথ্য হলো পালি ভাষায় রচিত 'বেতাকাত'। তার অর্থ কানুন বা নিয়ম। এই তথ্যাদি প্রস্তুত করা হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ২৪১ সনে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে পেশ করার জন্য। সঙ্গীতি বা সম্মেলনটি একমত হয় যে, প্রামাণ্য তথ্যাদিতে যা ছিল, সবই বুদ্ধের শিক্ষা। তন্মধ্য থেকে কিছু আরবিতে *ইঞ্জিল বুজা* শীর্ষক গ্রন্থে অনূদিত হয়।

[১৩৮] হিন্দুদের কাছে পবিত্র গ্রন্থ। তার আলোচনা হিন্দুধর্ম পর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।



রাজা অশোকের শাসনামলে বৌদ্ধ মিশনের মানচিত্র।

বৌদ্ধদর্শন তাদেরকে (সন্ন্যাসীদের) যুক্তি ও ধর্মীয় প্রমাণশূন্য বহু বিষয়ে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। বুদ্ধ সন্ন্যাসীরা শহর-নগর ও গ্রামগঞ্জে বুদ্ধের শিক্ষা প্রচার করে ঘুরে বেড়াতেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তককে নিয়ে বহুল আলোচিত একটি উপকথা আছে। কথিত আছে যে, তিনি যখন পরিণত বয়স্ক হন, একদিন তার প্রাসাদ থেকে বের হয়ে এক বয়োবৃদ্ধকে দেখেন। দ্বিতীয় দিন বের হলে এক রুগ্ণ ব্যক্তিকে দেখেন। তৃতীয় দিন বের হলে খাটিয়ার ওপর এক মৃত ব্যক্তিকে দেখেন। তার দেহরক্ষীকে বয়োবৃদ্ধ ও বার্ধক্যের কারণ, রোগ ও রোগের কারণ এবং মৃত্যু ও মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে জানতে চান। দেহরক্ষী জানায়, প্রত্যেক জন্ম নেওয়া প্রাণীর শেষাবস্থা বৃদ্ধাপনা (জরা), ব্যাধি অতঃপর (বিনাশ) মৃত্যু। তার উত্তর শুনে বুদ্ধ পার্থিব জগৎ ও তথায় বেঁচে থাকা অপছন্দ করেন

এবং একরাতে বার্ধক্য, ব্যাধি ও বিনাশ (মৃত্যুর) থেকে মুক্তির সন্ধানে প্রাসাদ ছেড়ে মরুভূমি ও বনজঙ্গলে বের হয়ে পড়েন। উক্ত কাহিনি বৌদ্ধদর্শন গ্রন্থপ্রণেতা উল্লেখ করে বুদ্ধের দিকেই সম্পৃক্ত করেন।[১৩৯] বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থগুলোতে কাহিনিটি বহুল আলোচিত ও ধারাবাহিকভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বর্ণিত হয়ে আসছে।

আমি বুঝি না, কীভাবে লোকেরা এই ধরনের কাহিনিগুলো বর্ণনা করে তা তাদের পূজনীয় মহান প্রভুর দিকে সম্বন্ধ করে। যিনি ৩০ বছরে উপনীত হয়েও বার্ধক্য, ব্যাধি ও বিনাশের অর্থ জানে না। এমনকি দেহরক্ষীর কাছে জেনে নিয়ে দুনিয়া থেকে মুক্তি লাভের সন্ধানে দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়?

তা কীভাবে সম্ভব? প্রাকৃতিক নিয়মাবলি রোধ করা মানবজাতির পক্ষে আদৌ কি সম্ভব?

বুদ্ধ-সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদের সঙ্গে ছয় বছরের সাহচর্যে পানাহার ত্যাগ, শীত-গ্রীষ্মে দৈহিক কষ্ট, অবস্থান ও প্রস্থানকালে যাতনা-শিকার ও এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অবিরাম ঘুরে বার্ধক্য, ব্যাধি ও মৃত্যু (বিনাশ) থেকে আত্মার পরিত্রাণের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। অবশেষে তিনি লক্ষ্য অর্জনে নিরাশ হন। অধিক কষ্টের ফলে তিনি শীর্ণকায় হয়ে পড়েন। নতুন আয়েশি জীবন শুরু করার জন্য আবার রাজ্যে ফিরে যান।

কথিত আছে, নৈরাশ্যকালের একপর্যায়ে সমগ্র দুনিয়া তার জন্য আলোকোজ্জ্বল হয়। সবকিছুর জ্ঞান তার অর্জন হয়। তিনি দাবি করেন, সেই জ্ঞান ঈশ্বরপ্রদত্ত। জলস্থলের অমানিশা তার জন্য দূর হয়। তার নিকট জীবন-মৃত্যুর স্বরূপ উন্মোচিত হয়। ফলে তিনি নতুন উদ্যোগে উদ্দীপ্ত হয়ে নিজের জন্য সন্ন্যাসজীবন চাপিয়ে নেন। সন্ন্যাস-যাপন করে লোকদেরকে তার প্রবর্তিত ধর্মের দিকে আহ্বান করেন। এমতাবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

তার সর্বশেষ শিক্ষা ছিল, যে বৌদ্ধ দীক্ষা, দল ও ধর্মকে বিশ্বাস করবে, তার নির্বাণ অর্জিত হবে। তার বিশ্বস্ত শিষ্য আনন্দ তার মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসতে দেখে কাঁদতে শুরু করে। বুদ্ধ তাকে বলেন, 'হে আনন্দ, আমার জীবদ্দশায় বা তিরোধানের পর যে নিজের জন্য পথপ্রদর্শক আলো, নিজের জন্য ঠাঁইরূপ আশ্রয়স্থল হয়, তাদের সকল ব্যক্তি কখনো অন্যের কাছ থেকে আশ্রয়স্থল খুঁজবে না এবং যে সত্যকে আলোকবর্তিকা-স্বরূপ আঁকড়ে ধরবে, সে অন্য কারও কাছে ঠাঁই তলব করবে না। এরূপ ব্যক্তিবর্গই উন্নত শিখরে পৌঁছতে পারবে। তবে তাদের জ্ঞানের প্রতি চরমাগ্রহ অবিরাম থাকা চাই।'

[১৩৯] তিনি সন্ন্যাসীদের সম্বোধন করে বলেন, আমার আয়েশি ও বিলাসী জীবন সম্পর্কে তোমরা জানতে। আমি নিজকে বলি, একজন মূর্খ লোক সহসা প্রৌঢ় হবেন। যেরূপ বৃদ্ধ লোকটি প্রৌঢ় হয়েছেন। আর সে বার্ধক্য থেকে দূরে নয়...। তিনি আরও বলেন, অতঃপর আমি উচ্চ প্রশান্তি ও নির্বাণের প্রশান্তি-সন্ধান করতে আরম্ভ করি।

তিনি তাকে বলেন, 'তুমি কেঁদো না। কারণ, প্রত্যেক অস্তিত্বশীল বস্তুর শেষাবস্থা বা পরিণতি হলো ফানা বা বিনাশ। তোমার কর্তব্য হলো মনের সঙ্গে সংগ্রাম করে যাওয়া এবং পাপ থেকে মনকে দূরে রেখে নির্বাণ অর্জন করা। আমি প্রথম ও শেষ বুদ্ধ নই। যতদিন আমার শিষ্যরা অবশ্যপালনীয় বিধান মান্য করবে, ততদিন এই ধর্ম প্রসার লাভ করবে। যখন সত্যের দীপ্তি নিভু হবে, তখন আমার ধর্ম সংস্কারকারী অপর বুদ্ধ আগমন করবেন। তার নাম হবে 'মাতারা'। তোমাদের কেউ যেন ধারণা না করে, আমার পরে তার কোনো পথপ্রদর্শক বা গুরু আসবেন না। মনে রেখো, দলের নিয়মবিধি হলো তার গুরু ও পথপ্রদর্শক।'

তার শেষ কথাটি ছিল, প্রত্যেক অস্তিত্বশীল বস্তুর পরিণতি হলো বিনাশ ও ধ্বংস। হে শিষ্যকুল, তোমরা নির্বাণ অর্জনের লক্ষ্যে একনিষ্ঠ পরিশ্রমীর মতোই মনের সঙ্গে সংগ্রাম করো। এরপর বুদ্ধ খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮৩ সালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।[১৪০]

সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, বুদ্ধ তার মৃত্যুর পূর্বে জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি ঈমান আনেননি এবং তার অনুসারী ভিক্ষুদেরও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য অন্তিম উপদেশ দেননি। তাই একদল বিশেষজ্ঞ বর্ণনা করেছেন, বুদ্ধ কাফির ও নাস্তিক ছিলেন। কুফরির ওপরই তার মৃত্যু হয়। তদুপরি ভারতবাসীর তাকে প্রেরিত পুরুষ বা নবি আখ্যা দেওয়া বিস্ময়ের বিষয়।

বুদ্ধ কর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আর হিন্দু রীতিনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। তবে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এ সংগ্রামে অনড় থাকতে পারেননি। হিন্দুদের কাছে বৌদ্ধ মত গৃহীত না হওয়ায় বুদ্ধ যে রীতিনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তারা (ভিক্ষুরা) সেদিকেই সহসা ফিরে গিয়েছিলেন।

বুদ্ধের শিক্ষাসমূহ

বুদ্ধ তার জীবদ্দশায় কোনো শাস্ত্র রচনা করে যাননি। বরং তিনি শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা ও উপদেশ দিতেন। তারা তার দেওয়া উপদেশমালা সংকলনের প্রতি গুরুত্বও দেননি। তথাপি বৌদ্ধশাস্ত্রের সুস্পষ্ট কিছু বিবৃতি মতে, বুদ্ধ তার পাঠগুলো/শিক্ষাগুলো লিপিবদ্ধ করতে তার অনুসারী ভিক্ষুদের বারণ করতেন। এগুলোর মৌখিক চর্চা ও বর্ণনা হতো। ইতিহাসবেত্তাগণ বুদ্ধের আলাপচারিতার ভাষা সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করতে পারেননি।

---

[১৪০] বিশ্ব ধর্ম দর্শন, পৃষ্ঠা : ১৫১-১৫২, *কিসসাতুল হাদারা* : খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৯-৯০।

তাই তো কয়েক শতাব্দী তার শিক্ষাগুলো অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার অধিকাংশ শিক্ষায় বিকৃতি ঘটে। তবে কিছু ক্ষেত্রে তাদের সকল দল একমত আছে বলে দাবি করেন বৌদ্ধরা। যদিও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রচুর মতদ্বৈততা থাকে। তাদের চার পবিত্র আর্যসত্যের বিষয়ে তাদের মাঝে তেমন কোনো বিরোধ নেই। চার আর্যসত্যের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

প্রথম আর্যসত্য : দুঃখের অস্তিত্ব

বুদ্ধ বলেন, 'জন্ম দুঃখ। প্রৌঢ়তা দুঃখ। রোগাক্রান্ত হওয়া দুঃখ। মৃত্যুও দুঃখ। প্রিয়ের কাছে না পৌঁছাও দুঃখ।'

আমাদের অভিমত হলো, বুদ্ধ বাস্তবতা থেকে চোখ বুজে চলতে চান। তিনি চান মরুভূমিতে স্নিগ্ধ জীবনযাপন করতে। জন্ম, প্রৌঢ়তা, ব্যাধি ও মৃত্যু যদি দুঃখের হয়, মানবজাতি কি এগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারবে? এসব কি তাদের ইচ্ছাধীন নাকি প্রাকৃতিক নিয়মভুক্ত?

> فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
>
> আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। [সুরা রুম, আয়াত : ৩০]

বৌদ্ধদর্শন হলো প্রকৃতিবিরোধী। বুদ্ধও চেয়েছিলেন প্রৌঢ়তা, ব্যাধি ও মৃত্যু থেকে আত্মাকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য। কিন্তু তা কি কখনো সম্ভব হয়েছিল?

দ্বিতীয় আর্যসত্য : দুঃখের কারণ

তিনি বলেন, দুঃখের কারণ হলো মিথ্যা আশা ও ধ্বংসাত্মক বাসনা, যা মানুষকে পুনর্জন্মে পৌঁছিয়ে দেয়।

তৃতীয় আর্যসত্য : দুঃখ ও কষ্টের অবসান

তিনি বলেন, দুঃখের অবসান ঘটবে, যখন কামনা-বাসনাকে বধ (দাফন) করতে পারবে। আর অতিরিক্ত চাহিদা (প্রয়োজন) বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হবে। পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করতে সচেষ্ট হবে ও পূর্ণ নির্জনতা গ্রহণ করবে।

আমাদের অভিমত : এসব আলোচনার মাধ্যমেও বুদ্ধ প্রবৃত্তি বধ করার (দাফনের) আড়ালে জীবন-বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়া থেকে পলায়ন করতে চেষ্টা করেছেন। কল্যাণ ও সৌভাগ্যময় কর্মের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে সকল কামনা-বাসনা নির্মূল করার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। এ কারণে অধিকাংশ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভিক্ষুরা সম্পূর্ণরূপে কাম-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তাদের বিশেষ অঙ্গগুলো কেটে খোজা হয়ে জীবনযাপন করে। আমি জানি না, যদি সমগ্র মানবজাতির মাঝে এই প্রবণতা (খোজা হওয়া ও সংসারত্যাগ) চলতে থাকে, কীভাবে এ দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী টিকে থাকবে? সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়, বুদ্ধ কাম-বাসনার অর্থ ও স্বরূপ বুঝতেন না। যদি বুঝতেন, কখনো অপ্রাকৃতিক ও মানবের অসম্ভব কোনো বিষয়ের প্রতি আহ্বান করতেন না। রাতের অন্ধকারে বৌদ্ধ আশ্রমগুলোতে ও ডেরার আন্ডারগ্রাউন্ডে চলমান ঘৃণ্য কাণ্ডগুলো ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। মানবীয় স্বভাববিরোধী, প্রাকৃতিক নিয়মবহির্ভূত ও বৈশ্বিক আইন বিবর্জিত, অপ্রাকৃতিক পন্থায় মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে বুদ্ধের যুক্তি-দর্শনের দীনতা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

চতুর্থ আর্যসত্য : দুঃখ-কষ্ট অবসানের সহায়ক কর্মকাণ্ড

বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বলেন, দুঃখ নিরোধের সহায়ক কর্ম (অষ্টাঙ্গিক মার্গ) আটটি।

১. সৎ বিশ্বাস (সম্যক দৃষ্টি)

তারা সৎ বিশ্বাস দ্বারা উপরোক্ত চার আর্যসত্যকে বোঝায়।

২. সৎ সংকল্প

তারা এর দ্বারা জাত তথা সত্তার অস্বীকৃতি ও সৃষ্টির উপকারে সচেষ্ট থাকাকে বোঝায়।

নিম্নোক্ত তিনটি পন্থায় সৎ সংকল্প অর্জিত হয়।

ক. দুনিয়া ও দুনিয়ার স্বাদ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে।

খ. শত্রুতা পরিহার করার মাধ্যমে।

গ. যুদ্ধ-সংঘাত পরিহার করার মাধ্যমে।

৩. সৎবাক

অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করা এবং উপকারী কাজে ব্যস্ত থাকা সৎবাকের উদ্দেশ্য।

৪. সৎকর্ম

অপবিত্র অংশ দিয়ে গঠিত দেহের দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা সৎকর্মের উদ্দেশ্য।

৫. সৎ জীবিকা

(সৎ উপায়ে জীবিকা উপার্জন ও ভোগ করা।) কোত্থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ এই মূলনীতি যুক্ত করেছে, জানা যায় না। কারণ, ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাপন করে। তাদের ওপর জীবিকা নির্বাহ করা নিষিদ্ধ। তারা ন্যূনতম এক দিনের খাবারকে যথেষ্ট পরিমাণ জীবিকা উপার্জন বোঝায়।

৬. সৎ প্রচেষ্টা

উপকারী কাজ করা সৎ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

৭. সৎ স্মৃতি

সৎস্মৃতি বলতে বোঝায় বুদ্ধের অবস্থাদি ও তার জীবনচরিত স্মরণ ও বর্ণনা করাকে।

৮. সৎ সমাধি

বুদ্ধের ধ্যান, স্মরণ, হৃদয়ে তাকে আসীন করা ও চোখে তার ভাস্কর্য প্রতিবিম্ব করা সৎসমাধি দ্বারা উদ্দেশ্য।

এগুলো হলো, (অষ্টাঙ্গিক মার্গ) যা দুঃখ ও কষ্ট নিরোধের সহায়তা করে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের ভিত্তিতে সন্ন্যাসীদের কাছে প্রসিদ্ধ দশ মূলনীতি সাজানো হয়েছে।

(নির্বাণ লাভে সহায়ক) মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ :

১. প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ।

২. চুরি করা নিষিদ্ধ।

৩. মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ।

৪. মদপান নিষিদ্ধ।

৫. দুপুরের পর খাদ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ।

৬. গান করা নিষিদ্ধ।

৭. বাদ্য করা নিষিদ্ধ।

৮. সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৯. সড়ক ও উঁচু স্থানে বসা নিষিদ্ধ।

১০. সোনা ও রুপার তৈরি উপঢৌকন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

এগুলো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে ১০ অকুশল বা নিষিদ্ধ কর্ম বলে জ্ঞাত।

বুদ্ধের অন্যতম শিক্ষা হলো, বুদ্ধ হিন্দুধর্মের শ্রেণিবৈষম্যকে সায় দেয়নি। বরং তিনি সাম্যবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

বুদ্ধের কাছে হিন্দুদের শ্রেণিবৈষম্যের কোনো ভিত্তি নেই। বরং ব্যক্তির সততা ও অতীত জীবনের কর্ম মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল ভিত্তি। পাশাপাশি নিম্ন শ্রেণির ব্যক্তিরও মুক্তি অর্জন হয়, সে যদি ভালোবাসা, ভক্তি ও ধ্যান করে চলে।

বুদ্ধের এই শিক্ষা হিন্দু শ্রেণিবৈষম্যের নির্যাতিত ও উপেক্ষিত লোকেদের বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করার জন্য বড়ই উৎসাহব্যঞ্জক হয়।

কষ্ট ও বিপদের কারণ

বুদ্ধ বলেন, দুঃখ-দুর্দশা আরম্ভ হয়, যখন কোনো ব্যক্তি নিজেকে অন্যের থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। কারণ, বিশ্বজগতের সবকিছু অবিচ্ছেদ্য এককের সঙ্গে সংযুক্ত। কোনো ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হলে তার পক্ষে পৃথিবী পরিবর্তন সম্ভব নয় এবং মানবজাতি সংগ্রাম-সাধনা করতে পারে। তবে পৃথিবীর পরিবর্তন সাধন তার পক্ষে অসম্ভব। ফলে তার জন্য বিপদাপদের দ্বারগুলো উন্মুক্ত হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, এই নান্দনিক পৃথিবীতে মূর্খের সমস্যা ক্ষমাযোগ্য নয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, বুদ্ধের আকিদা-বিশ্বাস হলো, ভোগের চেয়ে কষ্টই বেশি/ভোগের চেয়ে কষ্টের পাল্লা ভারী। তাই বুদ্ধের মতে, মানবজাতির জন্য জন্ম না হওয়াটাই শ্রেয়। একদল বিশেষজ্ঞ বুদ্ধের শিক্ষার তাৎপর্য অনুধাবন করে বলেন, বুদ্ধ আত্মহত্যার বৈধতা দেন। কারণ, তার মতে বেঁচে থাকা কষ্টের কারণ।

বৌদ্ধরা বংশবিস্তারে আগ্রহী নয়। তাই ভিক্ষু সন্ন্যাসীদের ওপর বিবাহ নিষিদ্ধ। যাতে তারা জন্মের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

সম্ভবত আরবি কবি আবুল আলা মাআররিও বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি তার একটি কবিতায় বলেন—

هذا ما جناه أبي علي- وما جنيت على أحد

এটি (আমার জন্ম) হচ্ছে আমার ওপর আমার বাবার কৃত অপরাধ; আর আমি কারও ওপর অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিই না।

একজন বৌদ্ধের শারীরিক কাম-প্রবৃত্তির পূর্ণ বিসর্জনের মধ্য দিয়েই নির্বাণ অর্জিত হবে। তারা বলেন, নির্বাণ লাভের উপকরণ হলো—

ক. আত্মার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।

খ. সত্যের সন্ধান।

গ. তৎপরতা।

ঘ. নীরবতা বা নির্জনতা।

ঙ. ঈর্ষা।

চ. নিবিষ্টতা।

ছ. সমুন্নত আত্মা প্রভৃতি।[১৪১]

---

[১৪১] *কিসসাতুল হাদারা*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৫।

বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

বুদ্ধ দ্বন্দ্বে জড়ানো ও মানুষকে দিশাগ্রস্ত করার ভয়ে ঈশ্বরের আলোচনা হতে বিরত থাকতেন। আমি বুঝি না কীভাবে বুদ্ধ দাবি করেন, তার নির্বাণ ও প্রভুপ্রদত্ত জ্ঞান অর্জন হয়েছে। অথচ তিনি তার প্রভু, তার স্রষ্টা, তার উপাস্যকেই চিনেন না। তিনি আবার নাকি মানবজাতিকে দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের নাগপাশ থেকে পরিত্রাণের জন্য তার ধর্মের দিকে আহ্বান করে থাকেন। সেদিক বিবেচনায় বৌদ্ধ মতাদর্শ কোনো ধর্ম কিনা তা লোকদেরকে খুব ভাবিয়ে তোলে। কারণ, পৃথিবীর সকল ধর্ম ও মতাদর্শের প্রধান ভিত্তি হলো, প্রভু ও স্রষ্টার জ্ঞান। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, বৌদ্ধধর্ম কোনো ধর্মই নয়। বরং হিন্দুধর্মের কল্পকাহিনি, নতুন রীতিনীতি, বিশেষত হিন্দুধর্মে প্রসিদ্ধ শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া একটি বিরোধী দল বা আন্দোলনের নাম বৌদ্ধ মতাদর্শ। বুদ্ধ উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীকে তার দলে আকৃষ্ট করতে চান। বস্তুত ভারতে অবহেলিত ও উপেক্ষিত শ্রেণির মাঝে বৌদ্ধধর্ম অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশি প্রসার লাভ করে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ সকল দুর্বল ও অসহায়দের প্রভু ও স্রষ্টাকে চেনা এবং অন্তরের প্রশান্তির জন্য প্রভুর ধ্যানজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি অর্জিত হয়েছে?

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, উক্ত প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচকই হবে। কারণ, ভারতে এ সকল উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা সামান্য বৃদ্ধি পেলেও সঠিক দিশা ও সত্যের পথ তাদের জীবনকে আলোকিত করেনি।

ইসলাম ইহ-পরলৌকিক জীবন-সংবলিত সমুন্নত শিক্ষার মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূর্ণ করতে সক্ষম। ইসলাম শ্রেণিবৈষম্য সমর্থন করে না। বরং জাতি-বর্ণ-গোত্রের প্রতি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিও প্রকাশ করে না। ইসলামের বিশ্বাস মতে, সকল মানবজাতি মাটির তৈরি এবং সর্বোত্তম মানব হলো, যে সবচেয়ে খোদাভীরু বা সর্বোচ্চ তাকওয়াবান।

বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের পূর্বোক্ত আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে তুমুল মতবিরোধ রয়েছে। তারা দুই দলে বিভক্ত। একদল মনে

করেন, বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। অপর দল মনে করেন, বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের প্রমাণ সমালোচনার মানদণ্ডে মূল্যহীন। এতদসত্ত্বেও আমি বিষয়টি স্পষ্ট করার লক্ষ্যে উভয় দলের প্রমাণাদি তুলে ধরছি।

প্রথম দলের প্রমাণাদি

তারা বলেন, বুদ্ধ সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্য বিশ্বাস করতেন না। অনুসারীদেরকে উপাস্য সন্ধান থেকে বারণ করতেন। বুদ্ধ থেকে বর্ণিত আছে, হিন্দু দুই সন্ন্যাসী বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। তারা ব্রহ্মার অবতারবাদ সম্পর্কে জানতে চান। ব্রহ্মার অবতারের পদ্ধতি নিরূপণে উভয়ের মাঝে তুমুল ঝগড়াও হয়। পরিশেষে বুদ্ধের কাছে তারা নালিশ করেন। বুদ্ধ বললেন, তোমরা কি ব্রহ্মার নিবাস চিনো?

তারা বললেন : না।

বুদ্ধ বললেন : তোমরা কি ব্রহ্মাকে দেখেছ?

তারা বললেন : না।

বুদ্ধ বললেন : তোমরা কি ব্রহ্মার প্রকৃতি জানো?

তারা বললেন : না।

বুদ্ধ বললেন : তোমরা কি সূর্যের সঙ্গে একাকার হতে চাও?

তারা বললেন : না। কারণ, সূর্য আমাদের চেয়ে বহু দূরে এবং তা এক জ্বলন্ত পদার্থ।

বুদ্ধ বললেন : যদি তোমরা সূর্যের সঙ্গে একাকার হতে না পারো, তবে জ্বলন্ত সূর্যের স্রষ্টার সঙ্গে কী অবস্থা হবে?

এবং তিনি তাদেরকে বললেন, ব্রহ্মা কি হিংসুটে ও অহংকারী?

তারা বললেন : না।

বুদ্ধ বললেন : তোমাদের মাঝে কি হিংসা, দ্বেষ ও অহংকার পাওয়া যায়?

তারা বললেন : হ্যাঁ।

বুদ্ধ বললেন : তবে ব্রহ্মার সঙ্গে তোমাদের একাকার কীভাবে সম্ভব? তোমাদের স্বভাব আর ব্রহ্মার স্বভাব ভিন্ন।[১৪২]

---

[১৪২] বুদ্ধ দর্শন, পৃষ্ঠা : ১১৪।

বুদ্ধ ও বশিষ্ঠ নামক হিন্দু এক পণ্ডিতের মাঝে একদা আলাপচারিতা হয়। বুদ্ধ বললেন, তুমি কি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখেছ? তোমার পূর্ববর্তী কেউ কি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখেছে? হিন্দু পণ্ডিতটি উত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন।

তারা আরও বলেন, বুদ্ধ ঈশ্বরকে অস্বীকারের বিষয়ে নিম্নোক্ত পণ্ডিতদের ঐকমত্য রয়েছে। তারা হলেন—

১. তান সেন খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০।

২. নাগা অর্জুন ১৭৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৩. আসঙ্ক ৩৬০ খ্রিষ্টাব্দ।

৪. বাসুয়ান্দ ৪০০ খ্রিষ্টাব্দ।

৫. দাজনাজ ৪২০ খ্রিষ্টাব্দ।

৬. শান্ত ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ।

৭. শাক্য শারি বদর ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ প্রমুখ।

তারা আরও বলেন, বৌদ্ধধর্মে পবিত্র চার আর্যসত্য উপাস্যের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ নেই। তার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে অন্তিম উপদেশও দেননি। তাকে কেবল নিজের পক্ষ থেকে আশ্রয়স্থল বানানোর অন্তিম উপদেশ দেন।

এগুলোই হলো বিরুদ্ধবাদীদের দলিল। যে এর চেয়ে অধিক বিশ্লেষণ চায়, সে যেন 'বৌদ্ধদর্শন' শীর্ষক রাহুলের গ্রন্থটি পড়ে নেয়।[১৪৩]

দ্বিতীয় দল তথা স্বপক্ষবাদীদের প্রমাণাদি

বৌদ্ধ বড় খোদাকে বিশ্বাস করতেন। তবে তাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন না। ভারতীয় সমাজে বড় খোদার প্রতি ঈমান আনা জ্ঞাত বিষয় হওয়ার কারণে তিনি এতে খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন না।

তাদের দলিল নিম্নে প্রদত্ত হলো—

প্রথম প্রমাণ

তারা যুক্তি ও উদ্ধৃতি দুটি দিয়েই প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

---

[১৪৩] বৌদ্ধ দর্শন, পৃষ্ঠা : ১, ৪১, ৫৩, ১৭১।

ক. যুক্তিনির্ভর প্রমাণ

প্রভুকে বিশ্বাস না করে ধর্মের কল্পনাই করা যায় না। কারণ, প্রভু সকল ধর্মে বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি। তাই বিরুদ্ধবাদীরা বৌদ্ধধর্মকে ধর্ম আখ্যা দিতে নারাজ।

খ. উদ্ধৃতিনির্ভর প্রমাণ

অঙ্গুত্তর নিকায়[১৪৪] ও *মঝঝিম নিকায়*[১৪৫] গ্রন্থদ্বয়ে ঈশ্বর শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর

গুণবিহীন প্রভুর অর্থ উদ্দেশ্যবিহীন দর্শন মাত্র। কারণ, বুদ্ধ এমন কোনো গুণকীর্তন করেননি, যদ্দ্বারা ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয় প্রমাণ

বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের মতো ব্রহ্মাকে প্রভু হিসেবে বিশ্বাস করে না। বরং তারা বুদ্ধকে ব্রহ্মার চেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়ে থাকে।

বুদ্ধের প্রতি তাদের এই সম্মান প্রদর্শন তাদের স্বপক্ষে দলিল না হয়ে বিরোধীদের শক্তিশালী হাতিয়ার হয়। কেননা, তারা বুদ্ধকে ঈশ্বরের আসনে বসায় এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে বুদ্ধের উপাসনা করে। অথচ বুদ্ধ তাদের মতোই একজন মাখলুক মাত্র।

স্বপক্ষবাদীরা বলে, বিষয়টি নিয়ে নিম্নোক্ত বেশ কয়েকটি কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

১. সিদ্ধার্থ হলেন বুদ্ধ দাবিদার সাতজনের একজন। সেই সাতজন হলেন, ‘সাক্ষ্য বুদ্ধ’, ‘বাছা বুদ্ধ’, ‘বিশাদ বুদ্ধ’, ‘কৌসংক বুদ্ধ’, ‘করণাকুনা বুদ্ধ’ ও ‘সাবা বুদ্ধ’।

বিষয়টি সংমিশ্রণ হয়ে যাওয়াতে তারা একজনকে অন্যজনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে।

২. বুদ্ধ ব্রহ্মার বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং ‘বেদে’র শিক্ষাকে অশ্রদ্ধা জানান। ফলে হিন্দুরা তাকে নাস্তিক অপবাদ দেয়। তারা ভারতীয় সমাজে এই কথা ছড়িয়ে দেয়। বুদ্ধকে ‘ফাসেক’ (সত্যত্যাগী) ও কাফির (অবিশ্বাসী) আখ্যা দিয়ে বুদ্ধধর্মকে স্বদেশে ও নিজ মাতৃভূমিতে একঘরে করে দেওয়ার চেষ্টা করে।

৩. বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাগুলো কীভাবে প্রকৃতি-বহির্ভূত বিষয়মুক্ত হওয়ার কল্পনা করা হয়? অথচ তারা শিরকের সাগরে ও নতুন রীতিনীতিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে। বৌদ্ধরা আল্লাহ ছাড়া বৌদ্ধের পূজা করতে থাকে।[১৪৬]

---

[১৪৪] অধ্যায় : ৪১।

[১৪৫] অধ্যায় : ১০১। (এগুলো বৌদ্ধধর্মের মৌলিক উৎস)

যাই হোক, মৌলিক এই বিরোধ (ঈশ্বরের ধারণার উপস্থিতি-অনুপস্থিতি) এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের কিছু রাষ্ট্রে প্রসারিত এই ধর্মের ভিতে বিনাশ ঘটায়। কারণ, আল্লাহর উপস্থিতি ও তাঁর গুণাবলি বিষয়ে কঠিন মতদ্বৈততাপূর্ণ কোনো ধর্মকে কখনো ধর্মপ্রাণ মানুষ গ্রহণ করবে না। কীভাবে আকিদা ও ঈমানসম্পন্ন মানুষ বিপদাপদ ও কষ্ট-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বৌদ্ধের মতাদর্শ গ্রহণ করবে? অথচ সে পরিত্রাণের কোনো পর্যায়ে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর কুদরতকে স্বীকার করে না। সে আরও দাবি করে যে, তার নির্বাণ অর্জিত হয়েছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রই উক্ত দুটি বিষয়ের মাঝে স্ববিরোধিতা ও মতদ্বৈততা দেখতে পাবেন। এই বৈপরীতে বৌদ্ধধর্ম স্বীয় জন্মভূমি ও উৎপত্তিস্থলে ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। কারণ, ভারতবাসী বৌদ্ধ চিন্তাদর্শনে তুষ্ট হতে পারেনি। যেভাবে ইসলামের সুমহান শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েছে। প্রভু-প্রদত্ত শিক্ষাদীক্ষা থেকে দূরবর্তী ইউরোপের দেশগুলোতেও এটি ঘটেছে, যখন খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকরা ইউরোপে পৌঁছে। কারণ, বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধিত হওয়ার পর তাকে গ্রহণ করেছে। অথচ ঈসা আলাইহিস সালাম বৌদ্ধের পাঁচ শতাব্দী পরে আগমন করেছেন। সেসময় খ্রিষ্টধর্ম ইউরোপে প্রসার লাভ করেনি। অধুনাকালে ইউরোপীয়রা যুক্তিনির্ভর স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং ঈসা ও তাঁর রবের মাঝে পার্থক্যকারী ধর্মের পুনর্বার অনুসন্ধান করছে। সন্দেহ নেই যে, ইসালম ওই ভ্রষ্টতা-বিচ্যুতি, পরিবর্তন ও বিকৃতিমুক্ত, কেবল মাত্র স্বচ্ছ শিক্ষাদীক্ষাই উক্ত শূন্যতা পূরণ করতে পারে।

যেভাবে আফগানিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার (বৌদ্ধ চিন্তাদর্শনের বিস্তৃত লীলাভূমি) মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রাচীনকালে ইসলাম কালজয়ী ভূমিকা রেখেছে। ফলে অধিকাংশ লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। বর্তমান ইউরোপেও ইসলাম এই ভূমিকা রাখতে পারে।

বৌদ্ধধর্ম যদিও তার অনাড়ম্বর শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে মানুষকে বিমোহিত করে/চমক দেখায়; যখন মানুষ তার নেশা ও জাদু থেকে সংবিৎ ফিরে পাবে, সে তখনই বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য টের পাবে।

---

[১৪৬] বৌদ্ধদের কাছে প্রমাণিত যে, বুদ্ধের দীর্ঘ জীবন যখন সমাপ্তির কাছাকাছি হয়, তার অনুসারীবৃন্দ তাকে ঈশ্বরতুল্য জ্ঞান করে। তারা তার মৃত্যুর অপেক্ষাও করেনি।

বৌদ্ধদের চার সঙ্গীতি (সম্মেলন)

প্রথম সঙ্গীতি

বুদ্ধের মৃত্যুর পরক্ষণে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে তার বিখ্যাত শিষ্য 'আনন্দকে' বুদ্ধের আকিদা-বিশ্বাস সংগ্রহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যদেরকে সন্ন্যাসীদের জীবননীতি প্রণয়নের আদেশ দেওয়া হয়।।

দ্বিতীয় সঙ্গীতি

দ্বিতীয় সভাটি বুদ্ধের মৃত্যুর ১০০ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বৌদ্ধদের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বুদ্ধের দিকনির্দেশনাসমূহ যাচাই-বাছাই করা।

তৃতীয় সঙ্গীতি

এই সভাটি রাজা 'অশোকের' রাজত্বকালে খ্রিষ্টপূর্ব দুইশত ছাব্বিশ সনে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল, বৌদ্ধদের নানা মতবিরোধ দূর করা।

চতুর্থ সঙ্গীতি

চতুর্থ সঙ্গীতি খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে রাজা 'কনশক'র শাসনামলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীতির উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের শিক্ষাগুলোকে ভুল ব্যাখ্যা থেকে পরিশুদ্ধকরণ।

বৌদ্ধ দল-উপদল

রাজা 'অশোকে'র শাসনামল না আসতেই বৌদ্ধরা আট দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারমধ্যে দুটি দল প্রসিদ্ধ।

১. হীনযান।

২. মহাযান।

প্রথম দল : হীনযান

এই দল ঈশ্বর, আত্মা ও অন্তর্দৃষ্টি বা অন্তঃকরণ অস্বীকার করে। অনুরূপ এই দল বুদ্ধের মানবপ্রকৃতিতে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে, বুদ্ধ মাতাপিতা থেকে জন্ম নেওয়া একজন

মানব মাত্র। অন্যদের মতোই জীবনযাপন করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন (মহানির্বাণ)।

তবে কিছু মহান গুণাবলি অর্জন করে তিনি পূতপবিত্র মর্যাদায় উন্নীত হন। 'আচার্য মানশ' উপাধিতে ভূষিত হওয়ার উপযুক্ত হন। এই দল বুদ্ধের নিম্নোক্ত কথাকে গ্রহণ করেছে।

'তুমি অন্যের কাছে আশ্রয় সন্ধান করো না।' বুদ্ধের উক্ত বাণীকে নির্বাণ অর্জনের জন্য মূলনীতি বানিয়েছে। দলটি (হীনযান) তৃতীয় সঙ্গীতি বা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ওপরেই নির্ভর করে। হীনযান দক্ষিণ ভারত ও শীলান উপদ্বীপে বিস্তৃতি লাভ করে। হীনযানের গ্রন্থাদি পালি ভাষায় রচিত হয়। তাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ত্রিপিটক'। সেটি তিন গ্রন্থের সমষ্টি। এই গ্রন্থগুলোর সংকলন, বৌদ্ধের প্রায় চার শতাব্দী পর সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় দল : মহাযান

এরা বিশ্বাস করে, যারা এই দলের আকিদায় যুক্ত হয় এবং ভিক্ষু দলের সঙ্গে মহাযানে আরোহণ করে, তারা নির্বাণ লাভ করতে পারে। এই দল বিশ্বাস করে, বুদ্ধের কোনো দেহ বা দৈহিক রূপ নেই। বরং তিনি দৈহিক দীপ্তি এবং দুনিয়াতে উদ্ভাসিত ছায়া। তিনি চিরন্তন ও মহান খোদা। এই দল শিরকের সাগরে নিমজ্জিত থাকে। তারা প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং বহু রীতিনীতিও আবিষ্কার করে এবং উপাসনা ও নাজাতের পন্থায় দার্শনিক বক্তব্য দেয়। ধারণা করা হয় যে, এই দলটি রাজা 'কনিশকে'র সময়কালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর চতুর্থ সঙ্গীতিতে তার বিধিমালা প্রণীত হয়।

মহাযান দলটি ভারতের উত্তরাঞ্চল তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপানে প্রসারতা লাভ করে। উক্ত দেশগুলোর বহু আকিদা-বিশ্বাস তারা গ্রহণ করে। মহাযানীদের অধিকাংশ শাস্ত্র, বইপুস্তক সংস্কৃত, চীনা, তিব্বতি ও জাপানি ভাষায় লিখিত।

প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ ডায়মন্ড সূত্র (Dimond sutra) ও লঙ্কা বাতারা সূত্র (Lonka vatara sutra)।

বৌদ্ধধর্মে উপাসনা

বৌদ্ধধর্মে উপাসনা পদ্ধতি নড়নচড়ন দ্বারা নয়।

১. তাদের ধারণা অনুযায়ী বুদ্ধের শোভা-সৌন্দর্য ও পূর্ণতার জন্য অধিক হারে প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা।

২. তার স্মরণে স্বাদাস্বাদন, নির্জনতা ও লোকালয়ে তার কল্পনা করা এবং আত্মা পুনর্জন্মে তার মতো রূপান্তরিত হওয়ার প্রার্থনা করা। বুদ্ধের নাম জপ ও তার কল্পনা করা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের উপাসনা।

এই আকিদা সন্ন্যাসীদের শ্রাদ্ধ ও আরাধনা শিক্ষা দেয়। বৌদ্ধদের বিশ্বাস অনুযায়ী বইপুস্তক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা দ্বারা মুক্তি মিলে না। বরং মুক্তির জন্য কামনা-বাসনা ত্যাগ করে বুদ্ধের সমপর্যায়ের পূর্ণ সন্ন্যাসী থেকে গ্রহণ আবশ্যক। পূর্ণ সন্ন্যাসী হলো অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি ভেদ উন্মোচন করতে পারেন।[১৪৭]

দ্বিতীয় স্তরে এই উপাসনাকারী উপাস্যের স্থলাভিষিক্ত হবেন। আর বিশ্বাসী বিশ্বাসের স্থলাভিষিক্ত হবেন। সৃষ্টি স্রষ্টার স্থলাভিষিক্ত হবেন। ফলে তার মাঝে ও স্রষ্টার মাঝে ন্যূনতম ব্যবধান থাকবে না। তাই নিজে নিজের জন্য ঈশ্বর দাবি করেন। বৌদ্ধদের এই আকিদা ও সুফিবাদের পীর কল্পনার আকিদাকে আপনি তুলনা করতে পারেন। কারণ, সুফিবাদের একজন শিষ্য তার অনুপস্থিত বা মৃত পীরকে কল্পনা করেন। কলবে তার প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেন। তার সাপেক্ষে সবকিছু করেন। যেন তিনি পীরের সঙ্গে বসবাস করছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কল্পনা করেন এবং তাঁর প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেন। সর্বশেষ পর্যায়ে তিনি ইহসানের দরজায় উন্নীত হয়েছেন মর্মে দাবি করেন।

উপাসনাকলীন বৌদ্ধদের গীত

আমি পূর্ণ উপাস্য বৌদ্ধের কুর্নিশ করছি, যার জন্য সমগ্র পৃথিবী উন্মোচিত হয়েছে।

আমি পূর্ণ উপাস্য বৌদ্ধের কুর্নিশ করছি, যার জন্য সমগ্র পৃথিবী উন্মোচিত হয়েছে।

আমি পূর্ণ উপাস্য বৌদ্ধের কুর্নিশ করছি, যার জন্য সমগ্র পৃথিবী উন্মোচিত হয়েছে।

আমি ঈশ্বর বুদ্ধের কাছে আশ্রয় চাই।

আমি ধর্মের কাছে আশ্রয় চাই।

আমি ভিক্ষু দলের আশ্রয় চাই।

আমি পুনর্বার ঈশ্বর বুদ্ধের আশ্রয় চাই।

আমি পুনর্বার ধর্মের কাছে আশ্রয় চাই।

---

[১৪৭] কিছু পণ্ডিত এই অবস্থাকে Wantlessness বলে অর্থাৎ মানুষের এমন পর্যায়ে উন্নীত হওয়া, যদ্দ্বারা তিনি সৃষ্টিকুল থেকে পূর্ণ বেনিয়াজ বা অমুখাপেক্ষী হতে পারেন।

আমি পুনর্বার ভিক্ষু দলের আশ্রয় চাই।

আমি তৃতীয়বার ঈশ্বর বুদ্ধের কাছে আশ্রয় চাই।

আমি তৃতীয়বার ধর্মের কাছে আশ্রয় চাই।

আমি তৃতীয়বার ভিক্ষু দলের আশ্রয় চাই।

আমি এমন বিধান গ্রহণ করলাম, যাতে কোনো কষ্ট নেই।

আমি এমন বিধান গ্রহণ করলাম, যাতে চুরি নেই।

আমি এমন বিধান গ্রহণ করলাম, যাতে কামনা নেই।

আমি এমন বিধান গ্রহণ করলাম, যাতে মিথ্যা নেই।

আমি এমন বিধান গ্রহণ করলাম, যাতে মাতালতা নেই।

বৌদ্ধধর্মের প্রসার

বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় সমাজের সর্বোচ্চ শ্রেণির লোকদের কাছে সীমাবদ্ধ ছিল না। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হতে ইচ্ছুক সকলের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। হিন্দুধর্ম তার উল্টো। ফলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। নিম্নশ্রেণির হিন্দু জনগণও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করে। রাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন এবং ভারতের ভেতর ও বাইরে প্রচারকদের প্রেরণ করেছিলেন। তার পুত্র মাহিন্দ্রকেও ধর্মপ্রচারের জন্য দক্ষিণ ভারত ও শীলনে পাঠান।

ফলে, বৌদ্ধধর্ম পূর্ব এশিয়া ও মধ্য এশিয়াতে বিস্তার লাভ করে। বার্মা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাউস, চীনের বহু প্রদেশ, কোরিয়া ও জাপানসহ মঙ্গোলিয়া, শীলনে[১৪৮] বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। বিশাল বিস্তৃতির পেছনে প্রধান কারণ ছিল বুদ্ধের অনাড়ম্বর ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব, এইসব অঞ্চলে প্রচলিত দর্শনাদির পেছনে না পড়া এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি বিশাল বিস্তৃতির কারণ। তথাপি তদানীন্তন সময়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের মাঝে বড় কোনো বিরোধ ছিল না। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারত পরিদর্শনকারী চীনা পর্যটক ফাহিয়ান বলেন, 'ভারতবাসী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদের সমানভাবে সম্মান করে। উভয় ধর্মের উপাসনালয়গুলো পাশাপাশি নির্মিত।'

সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মধ্যে নানা বিতণ্ডা ও মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটে। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কনৌজে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিতর্ক ও

---

[১৪৮] *আলবুযিয়্যা তারিখুহা ওয়া আকাইদুহা*, পৃষ্ঠা : ৩৬১।

পর্যালোচনা সভায় ব্রাহ্মণরা বিজয়ী হয়। এরপর তারা বৌদ্ধদের ক্ষমতা খর্ব করতে থাকে। অতঃপর বেদান্তের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ও বড় হিন্দু প্রচারক শংকরাচার্য (৭৮৮-৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ) এসে বৌদ্ধ শক্তিকে ভারত উপমহাদেশ থেকে বের করে দেয়। কথিত আছে, রাজা অশোকের কর্তৃত্ববাদের চেয়ে শংকরাচার্য-এর বুদ্ধিভিত্তিক পন্থা অবলম্বন ছিল অধিক ফলপ্রসূ।

এরপর ইসলামের আলোর আগমন ঘটে আর বাকি সময় বিজয় লাভ করে। ইসলামের খোদাপ্রদত্ত আলোর সামনে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম সমানতালে সিন্ধু থেকে ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড পর্যন্ত পরাভূত হয়। ফলে, বিপুল সংখ্যক মানুষ বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

> আর বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়েই থাকে। [সুরা ইসরা, আয়াত ৮১]

জৈনধর্ম

ভারতের ধর্ম-গবেষকদের জন্য আবশ্যক হলো অনুসারী সংখ্যা অল্প হলেও জৈন[১৪৯] ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা। কেননা, ভারতের অন্যান্য ধর্মের ওপর রয়েছে তার বিস্তর প্রভাব।

জৈনধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

জৈনধর্মের অনুসারীরা দাবি করে, তাদের ধর্ম পৃথিবীর মতো প্রাচীন। এ ধর্মের সর্বশেষ মূলনীতি সংস্কারক ও মতাদর্শ প্রচারকারী গুরু ছিলেন মহাবীর স্বামী (৫৪০-৪৮৬ খ্রিষ্টপূর্ব)। তিনি গৌতম বুদ্ধের সামসময়িক ছিলেন।[১৫০] উভয়ের মাঝে অনেক দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়। গৌতম বুদ্ধ তার বহু বক্তব্য ও উপদেশে মহাবীর স্বামীর সমালোচনাও করেন। মহাবীর স্বামীর পূর্বে আরও ২৩ জন তীর্থঙ্কর (জৈনরা যাদের ঈশ্বররূপে বিশ্বাস করেন) গত হন। মহাবীর স্বামী তাদেরই শেষজন। তাদের প্রত্যেক দুজন তীর্থঙ্কর আবির্ভাবের মধ্যবর্তীকালের ব্যবধান ছিল লক্ষ লক্ষ বছর। গণিতবিদরাও যার হিসাব কষতে অক্ষম হয়ে পড়েন।

লালা দিওয়ান জুনদ তার *জৈনধর্ম কি শাশ্বত?* শীর্ষক গ্রন্থে লেখেন, 'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনাদি ও অনন্ত। যার নেই শুরু ও শেষ। অনুরূপ জৈনধর্মও অনাদি-অনন্ত।'

জৈনধর্ম সম্পর্কে যথাযোগ্য মন্তব্য হলো, জৈনধর্মের আদিঅন্ত কিছুই জানা যায় না। তার কোনো ধরনের ইতিহাসও সংরক্ষিত নেই।

---

[১৪৯] ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে পরিসংখ্যান মতে জৈনধর্মের অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ১৬১৮৪০৫। সুস্পষ্ট নাস্তিকতা ও অশ্লীল জীবনব্যবস্থার কারণে এ ধর্মটি ভারতের বাইরে তো নয়ই, বরং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেও প্রসার লাভ করতে পারেনি। জৈনরা গুজরাট প্রদেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং গুজরাটে তাদের বিস্ময়কর বিশাল বিশাল উপাসনালয় রয়েছে। জৈন শব্দের অর্থ বিজয়ী তথা যিনি কাম-প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন।

[১৫০] ড. মোহনলাল ধারণা করেন, গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর স্বামী যদিও সামসময়িক কিন্তু কখনো উভয়ের সাক্ষাৎ হয়নি। (জৈন ধর্মদর্শন, পৃষ্ঠা নং : ৮।)

জৈনধর্ম বড় দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তা হলো—

- দিগম্বর।[১৫১]
- শ্বেতাম্বর।[১৫২]

আবার প্রতিটি দল দুটি করে উপদলে বিভক্ত। একদল মূর্তিপূজা করে। অপরটি মূর্তিপূজা অবৈধ ঘোষণা করে। দিগম্বর দলের মূর্তিপূজা অবৈধ ঘোষণাকারী উপদলের নাম 'তারান বান্তাহসার'। শ্বেতাম্বরী দলের মূর্তিপূজা অবৈধ ঘোষণাকারী উপদলের নাম 'দাস'।

মন্তব্য

এই বিভক্তি ধর্মের মূল ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়। কারণ, বিভক্তি মতাদর্শের ভিত্তিভূমিকে বিদীর্ণ করে দেয়।

মহাবীর স্বামীর জ্ঞান-বিজ্ঞান সংকলন

মহাবীর স্বামীর মৃত্যুর পর ধর্মরক্ষক ও সন্ন্যাসীরা তাদের মুখস্থ বিদ্যাসমূহ হতে মানুষদের দ্বাদশাঙ্গ[১৫৩] শেখায়, তাদের যুগ তাদের গুরুর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে। কিন্তু সাত শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর, তাদের পূর্ণ মুখস্থকারীগণের সংখ্যা ফুরিয়ে যায়। তাদের মাঝে কিয়দংশ মুখস্থকারীগণই অবশিষ্ট ছিল। তাদের এই দুর্বলতা উপলব্ধি করেন কনদ স্বামী[১৫৪] তিনি অবশিষ্ট মুখস্থবিদ্যা সংকলন করতে মনস্থ করেন। তিনি কিছু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অতঃপর তার শিষ্য উমা স্বামী এসে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা জৈনদের কাছে তাওরাত-ইনজিলের মর্যাদা পায়। অধুনাকালে তা তাতওয়ার্থ শাস্ত্র (TATWARTH SOTRA) নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত শাস্ত্র বর্তমানে মহাবীর স্বামীর শিক্ষাদীক্ষার অদ্বিতীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে (এগুলো দিগম্বরী দলের বর্ণনা)।

পক্ষান্তরে শ্বেতাম্বরী দলের মতে, যেমনটি জৈনশাস্ত্র গ্রন্থের লেখক বলেন, দিওয়ার্দী প্রায় দশ শতাব্দী পরে ৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে বালবাহী নগরে প্রায় পাঁচশ জৈন বিদ্বানের সমাবেশ ঘটিয়ে তাদের অবশিষ্ট মুখস্থ বিদ্যাগুলো একটি গ্রন্থে সংকলনের নির্দেশ প্রদান করেন।

---

[১৫১] দিগম্বর থেকে উদ্দেশ্য হলো আসমান তাদের পোশাক। অর্থাৎ তারা নগ্ন থাকাকে প্রাধান্য দেয়।
[১৫২] তার অর্থ হলো, যারা সাদা পোশাক পছন্দ করে। জৈন ধর্মদর্শন, পৃষ্ঠা নং ১৯।
[১৫৩] জৈনদের ধারণা অনুযায়ী এসবই মহাবীর স্বামীর শিক্ষাদীক্ষা।
[১৫৪] এটি প্রায় ১৫৬ খ্রিষ্টাব্দের কথা।

ঐতিহাসিক সমালোচনা

উপরি-উক্ত বর্ণনা দুটি অবতারণার পর আমরা সহজে বলতে পারি, মহাবীর স্বামীর শিক্ষাগুলো আমাদের কাছে অবিকৃতরূপে পৌঁছায়নি। বরং কালের আবর্তে একটি বড় অংশ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর অবশিষ্টাংশের ঐতিহাসিক বিশুদ্ধতায় আমরা আস্থা রাখতে পারি না। যেহেতু দিওয়াদী দিগ্বিদিক থেকে ছুটে আসা এ সকল সন্ন্যাসী ও মুখস্থকারী দলের সত্যতায় আস্থাশীল হতে পারেননি। কারণ, দিওয়াদী তাদের মুখনিঃসৃত সব কথাই শ্রবণ করতেন এবং লেখকদের লেখার নির্দেশ দিতেন। এই সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, কীভাবে কোনো সুস্থ-সজ্ঞান ব্যক্তি দিওয়াদীর দিকে সম্পর্কিত উক্ত পুস্তকের বর্ণনার ধারায় আস্থা রাখবেন? অথচ উক্ত পুস্তক কোনো নির্ভরযোগ্য বা ঐতিহাসিক সূত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সকল গল্প, উপাখ্যান ও বর্ণনাগুলোতে যারা বিশ্বাস করেন, তাদের জন্য বড়ই আক্ষেপ।

বড় দল দুটিতে মৌলিক বিরোধ

উভয় দলে ৮৪টি বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে তার অধিকাংশই চিন্তাপ্রসূত খণ্ড খণ্ড বিষয়। অতএব, আমরা এগুলোর বর্ণনা থেকে বিরত থাকছি। তদুপরি জৈনধর্ম মৌলিক তিনটি মতবিরোধ-পূর্ণ বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমত : পার্থিব সম্পর্ক

দিগম্বরী দলের মতে, পূর্ণজ্ঞান ও চিরস্থায়ী মুক্তি মিলবে তখনই, যখন মানুষ পূর্ণরূপে পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে। যেমন, বস্ত্র বিসর্জন করে নগ্ন থাকা। তাই দিগম্বরী দলের অনুসারীদের দেখা যায়, তারা নগ্নভাবে জীবনযাপন করে। পক্ষান্তরে শ্বেতাম্বরী দল বস্ত্র, বিছানা ও লাঠিসহ দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি গ্রহণ করে থাকে।

দিগম্বরী দলের অনুসারীরা তিনটি জিনিসকে যথেষ্ট ভাবে। তা হলো : ১) শাস্ত্র (তাদের পবিত্র গ্রন্থ)। ২) ভূমি ঝাড়ু দিয়ে পবিত্র রাখার জন্য ময়ূরের পালক। ৩) শৌচকার্যের জন্য বদনা।

ধর্মীয় পুস্তাকাদিতে, সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে, বিমানবন্দরে, স্টেশনে, পূজার স্থানে ও অনুষ্ঠানে—যত নগ্ন চিত্র দেখা যায়, সবগুলোই দিগম্বরী দলের পরিচয়।

শ্বেতাম্বর দলের অনুসারীরা কথা বলার সময় এবং যাত্রাকালে চেহারায় কাপড় টেনে দেয়। অন্যদিকে, দিগম্বরী দলের অনুসারীরা বিবস্ত্র থাকে। একদম কাপড়ই পরিধান করে না। পুরো দিনে একবারই খাবার খায়। এমনকি তারা পাত্র ব্যবহার করে না, হাতে রেখেই খাবার খায়। শ্বেতাম্বরীরা পুরো দিনে পাত্রে রেখে দুবার খাবার খায়।

পার্থিব জীবন ও দুনিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটিই মৌলিক পার্থক্য।

দ্বিতীয়ত : মহিলাদের মোক্ষ লাভ বিষয়ে বিরোধ

মহিলা সম্পর্কে শ্বেতাম্বরীদের মতামত হলো, মহিলাদের মোক্ষ লাভ হবে মহিলার শরীরেই। (ভিন্ন কোনো লিঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে মহিলার মুক্তি মিলবে এরূপ বিশ্বাস করে না।)

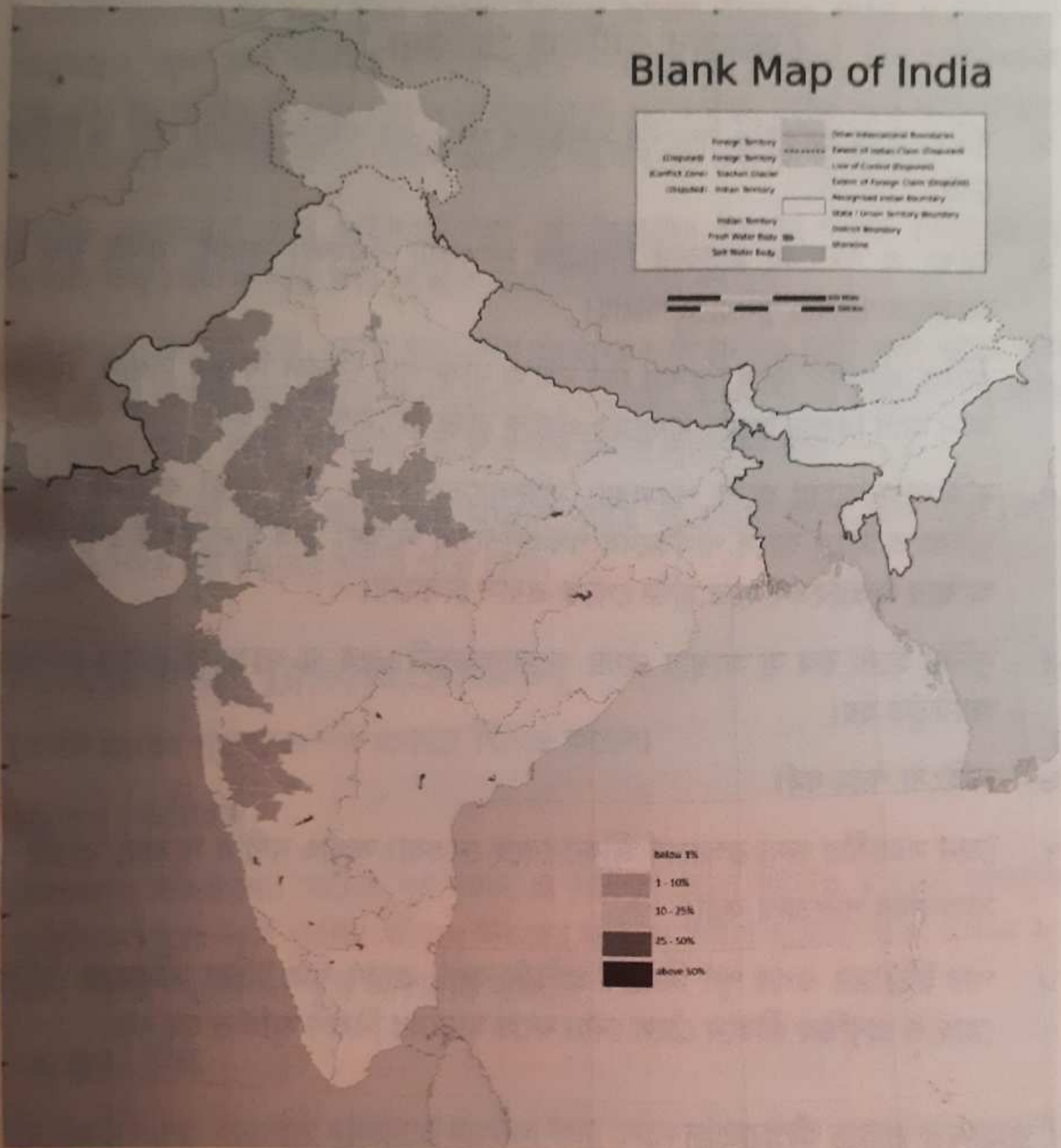
দিগম্বরীদের মতে, মহিলাদের মোক্ষ মিলবে না। কেননা, তাদের বগলে ক্ষুদ্র জীবাণু থাকে। যা বগল নাড়ালে মারা যায়।

দ্বিতীয় কারণ, প্রতি মাসে তাদের ঋতুস্রাব হয়। তাই তারা কাপড় পরিধান করলেও পূর্ণ তপস্যা করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং পুরুষ বেশে দ্বিতীয় জীবনে জন্ম দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে (অর্থাৎ পুনর্জন্ম)। এরকমই তাদের বিশ্বাসগুলো নানা অসারতা ও অবাস্তবতায় আকীর্ণ।

তৃতীয়ত : পূর্ণ তাপস

দিগম্বরীদের বিশ্বাস হলো, পার্থিব-জীবনে পূর্ণ সন্ন্যাসীকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও রোগব্যাধি পায় না। শ্বেতাম্বরীরা এর বিপরীত বিশ্বাস করে থাকে।

উভয় দলে উপর্যুক্ত তিনটিই মৌলিক পার্থক্য। তবে শাখাগত ও খণ্ড খণ্ড পার্থক্য বেশুমার। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার প্রয়াসে আমরা সে-সব আলোচনা থেকে বিরত থাকছি।



বর্তমানে ভারতে জৈনদের সংখ্যা খুবই কম।
চিত্রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জৈনদের জনসংখ্যার হার।

জৈনদের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস

১. দুনিয়া হলো আত্মা ও পদার্থের সমষ্টিগত ফল। এর বাইরে কোনো স্রষ্টা ও নিয়ন্তা নেই।

২. আত্মা ও পদার্থের মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্কটা কর্মফল। কারণ, কর্মই রুহ বা আত্মাকে বারবার দুনিয়াতে পাঠায়।

৩. আত্মা বারংবার ফিরে আসার চক্র থেকে মুক্তি পায় কেবল বিশুদ্ধ বিশ্বাস, বিশুদ্ধ জ্ঞান আর বিশুদ্ধ কর্মের মাধ্যমে। এটাকে মুক্তি বা মোক্ষ বলা হয়।

৪. মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মা হলো পরমাত্মা। মুক্তিলাভের পরও এই আত্মা কখনো কখনো দুনিয়াতে ফিরে আসে পথিকদের পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে। তাই মানুষের কর্তব্য হলো, আত্মার প্রত্যাবর্তন হতে মুক্তি পেতে প্রয়াস চালানো।

৫. দুনিয়া হলো রুহ বা আত্মার কেন্দ্র বা আবাসভূমি। রুহ বা আত্মা দুনিয়াতে অবিরত আবির্ভূত হয়।

৬. অহিংসা পরম ধর্ম।

৭. জৈন সন্ন্যাসীর জন্য ব্রহ্মাচার্য জীবন বেছে নেওয়া। অর্থাৎ নারীর সংস্রব, সুগন্ধি ও সাজসজ্জা পরিত্যাগ করা।

৮. পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। কারণ পঞ্চ ইন্দ্রিয় মানুষকে পার্থিব মোহ ও প্রবৃত্তির জীবনে ঠেলে দেয়। ফলে মানুষের নির্বাণ অর্জিত হয় না।

জৈনদের কাছে ঈশ্বরবাদ

(পূর্বোল্লিখিত জৈনদের) প্রথম বিশ্বাসের চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, তারা মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। বরং তাদের বিশ্বাস আত্মা ও পদার্থের মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্কগুলোর ফলই দুনিয়ার জন্ম। দুনিয়া আত্মা ও পদার্থের মতো চিরন্তন। যেহেতু দুনিয়া অনস্তিত্বশীল ছিল না। তাই তাকে কোনো অস্তিত্ব দানকারীর অস্তিত্ব দিতে হয়নি। বরং দুনিয়া ভিন্ন এক আকৃতিতে অনাদিকাল হতে অস্তিত্বশীল বা বিদ্যমান ছিল। অতঃপর রুহ ও আত্মার সম্পর্কের সংমিশ্রণেই দুনিয়া বর্তমান রূপধারণ করে।

এরই ভিত্তিতে কিছু পণ্ডিত বলেন, জৈনধর্ম ব্রাহ্মণদের কর্মের প্রতিক্রিয়া। তবে জৈনরা তা অস্বীকার করে বলে, আমরা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করি না। বরং আমরা তার সৃষ্টিগুণ ও নিয়ন্তাগুণ অস্বীকার করি। যেহেতু তাঁর অস্তিত্ব দুনিয়ার বাইরে নয়।

জৈনধর্ম বিশেষজ্ঞ বি আর কিন বলেন, জৈনরা অনাদি, চিরন্তন, সর্বত্র ও সর্বকালে বিরাজমান, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত, সর্বশক্তিমান, বিশ্ব ও জীবনের স্রষ্টা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়। বরং তারা প্রত্যাবর্তন থেকে মুক্ত, মোক্ষ লাভ করা আত্মায় বিশ্বাস করে। এই আত্মাগুলো নির্বাণ অর্জনের পর ঈশ্বরের মর্যাদায় ভূষিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, জৈনদের ঈশ্বরের সংখ্যা (আরওয়াহে নাজিহা তথা) মোক্ষ লাভ করা আত্মার সংখ্যার সমান ও বরাবর।

তাই আমরা দেখতে পাই, মোক্ষ লাভ করা আত্মাখ্যাত তীর্থঙ্করের তারা পূজা করে। আর বলে, আমি তীর্থঙ্করের সম্মুখে কুর্নিশ করছি, যিনি ঈশ্বর এবং সৃষ্টিকে নিরাপত্তা ও শান্তি দান করেন। হায়, আমি যদি তার দৃষ্টি ও কৃপায় নির্বাণ লাভ করতাম!

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র ও মহান। তারা এক প্রভু থেকে পালাতে গিয়ে বহু ঈশ্বরের খপ্পরে পড়ে গেল।

জৈনদের কাছে পুরুষদের প্রকারভেদ

জৈনরা তাদের পুরুষদের পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করেন।

১ম স্তর : অরিহন্ত

মোক্ষপ্রাপ্ত রুহগুলো। যাদের পূর্ণ জ্ঞান ও পরিপূর্ণ জানা অর্জিত হয়েছে। অতঃপর প্রাকৃতিক মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব-জীবনে ঈশ্বরের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তারা হলেন ২৪ জন। যাদের আলোচনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

২য় স্তর : সিদ্ধ

যে সকল আত্মা বারংবার দুনিয়াতে আগমন করা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাকৃতিক মৃত্যুর পর মোক্ষ লাভ করেছে। তাদের সংখ্যাও ২৪।

৩য় স্তর : আচার্য

সন্ন্যাসীদের প্রধান ও মোক্ষ লাভের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া ব্যক্তিত্ব।

৪র্থ স্তর : আবাধ্য

পথপ্রদর্শক সন্ন্যাসী, যিনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। ইনি আচার্য-এর শিষ্য হয়ে থাকেন।

৫ম স্তর : সাধু

সাধারণ সন্ন্যাসী, যিনি জৈন-জীবন শুরু করেছেন।

জৈনদের কাছে মূর্তিপূজার দর্শন

৫ম স্তরের মতে সন্ন্যাস-জীবন আরম্ভকারী প্রাথমিক জৈনরা স্থির চিন্তা, দীর্ঘ জপ ও ধ্যান করতে পারে না। যেহেতু তারা ঈশ্বরের কল্পনা অন্তরে সুদৃঢ় করতে পারে না। তাই এদের প্রকাশ্য ঈশ্বরের প্রয়োজন পড়ে। যখন জৈন বিশেষজ্ঞরা তাদের এ সমস্যার কথা অনুধাবন করলেন, কাঙ্ক্ষিত গুণধর মূর্তি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর প্রত্যেক দল নিজস্ব আকিদা অনুযায়ী ঈশ্বর নির্মাণে মনোযোগী হন।

দিগম্বরীরা তাদের প্রভুদের নগ্নমূর্তি স্থাপন করেন। যেন পার্থিবসমূহে তাদের প্রয়োজন-মুক্তির চিত্রকল্প ফুটে ওঠে। কিন্তু শ্বেতাম্বরীরা তাদের বিপরীত। এতে করে ভারতীয় ধর্মসমূহে প্রথমবারের মতো মূর্তিপূজার সূচনা হয়। কারণ, আমরা বেদ ও বুদ্ধের শিক্ষাদীক্ষায় মূর্তি ও উপাসনালয় নির্মাণের কথা খুঁজে পাই না। সুতরাং হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম দ্বারা প্রভাবিত।

বর্তমান জৈনদের নিকট মূর্তিপূজা শুভ ও অতি আবশ্যকীয় কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ, তাদের পণ্ডিতগণ মূর্তিপূজা পরিত্যাগকারী নতুন প্রজন্মের জন্য আক্ষেপ করে থাকেন। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে ইসলাম প্রথম মূর্তি নির্মাণ ও পূজা হারাম ঘোষণা করায় তারা ইসলামের দিকেও সমালোচনার তির নিক্ষেপ করে থাকেন।

এখানে সুধী পাঠক-মহল একটি প্রশ্ন করতে পারেন, জৈনরা তো আল্লাহর কোনো গুণে বিশ্বাসী নন। তাহলে কোন্ পদ্ধতিতে তারা মূর্তি নির্মাণ করেন?

উত্তরে আমরা বলবো, তারা অস্তিত্ব অস্বীকারকারী প্রভুর প্রতিকৃতি বানান না। বরং দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন হতে নাজাতপ্রাপ্ত রুহগুলোর সাধকদের জীবন প্রতিকায়িত করেন। যেমন: দেওজি, পার্শ্বনাথজি, মহাবীরজি, সোমনাথজি-সহ অন্যান্য মহাসাধকবৃন্দ। বর্তমানে এ ধরনের সাধকরাই জৈনদের নিকট বড় বড় প্রভু।

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে জৈনধর্মের প্রভাব

হিন্দুধর্ম বিধি-প্রণয়ন ও আকিদার নানা ক্ষেত্রে জৈনধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এতেই প্রমাণ হয় যে, হিন্দুধর্মে নিজস্ব মৌলিক ও প্রধান আকিদা অনুপস্থিত। যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছি। হিন্দু ও বৌদ্ধ কর্তৃক জৈন থেকে গৃহীত কিছু রীতিনীতি ও আকিদা সামনে পেশ করছি।

১. মূর্তিপূজা ও উপাসনালয় বিনির্মাণ

বৈদিক যুগে হিন্দুরা মূর্তিপূজা ও উপাসনালয় নির্মাণ কী, তা জানত না। বৌদ্ধরাও জানত না। হিন্দু ও বৌদ্ধরা জৈনদের অনুকরণে এগুলো ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে থাকে।

২. অহিংসা

বেদের সুস্পষ্ট শিক্ষা হচ্ছে, ঘোড়া, মহিষ, গরু জবাই করা যাবে। জৈনরা এসে প্রাণী জবাই ও উড়ন্ত ক্ষুদ্র কীট হত্যাও মহাপাপ আখ্যা দিয়েছে। বিজ্ঞ কবি আবুল আলা মাআরারি জৈনদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। বৌদ্ধদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন না। যেমনটি কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মতপ্রকাশ করেছেন।

হিন্দুধর্মও প্রাণী হত্যা মহাপাপ ঘোষণা দিয়েছে। বিশেষত গোহত্যা মহাপাপ। এখন তারাও জৈনদের মতো 'অহিংসা পরম ধর্ম' বলে গর্ববোধ করে।

৩. পুনর্জন্মবাদ

ইতিপূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি যে, বেদে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্বের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। জৈনরা এসে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধদের পুনর্জন্মবাদ থেকে বেরিয়ে আসা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

৪. সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য

হিন্দু ধর্মানুযায়ী মানুষের আয়ুর আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে। প্রথম দুই প্রকার পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর জৈনরা পার্থিব মোহ বর্জন ও সন্ন্যাসজীবন গ্রহণে উৎসাহিত করে। এতে হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরোহিতরা প্রভাবিত হয়ে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে বেছে নেয় সন্ন্যাস-জীবন।

৫. নগ্নতা

হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে নগ্নতার সংস্কৃতি খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি সন্দেহাতীতভাবে জৈন থেকে এসেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরোহিতরা নগ্নতার সংস্কৃতি জৈনদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। এখন তারাই প্রতি বছর নগ্ন হয়ে অনুষ্ঠান পালন করে এবং বিবস্ত্র হয়ে পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ভারত সরকার তাদেরকে গ্রামে ও শহরে এ ধরনের নগ্নতা থেকে বারণ করেছে। কঠিন বাকযুদ্ধের পর সরকার মরুভূমি ও বনে-জঙ্গলে নগ্ন হয়ে অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি প্রদান করে।

এসব হলো জৈনধর্মের আকিদা ও বিশ্বাস। আমি তা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। তার বিশদ আলোচনা হাজার হাজার পৃষ্ঠা সন্নিবেশ করবে। এসব আলোচনার প্রাপ্তি সহজ। তবে দুর্বোধ্যও বটে। পরিশেষে আমি আশা রাখি যে, জৈনধর্ম নিয়ে উপর্যুক্ত আলোচনা সত্য-অসত্য ও দুর্বল-সবলের মাঝে তুলনা করতে ও ইহ-পরকালের উপকারী বস্তুগ্রহণে অভ্যস্ত সত্যসন্ধানী ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট।

মহান আল্লাহ পূতপবিত্র। যিনি তাঁর মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সুস্পষ্ট আয়াত নাজিল করেছেন। আল কুরআন শহুরে ও গ্রাম্য সকলে বুঝতে পারেন। জ্ঞানী ও মুর্খ স্ব-স্ব প্রয়োজন-অনুপাতে উপকার লাভ করেন। আমি মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর অনুগ্রহ ও কৃপার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। আমিন।

শিখধর্ম

শিখধর্ম প্রবর্তনের সময় ভারতবর্ষের চিন্তাগত পরিবেশ

ভারতবর্ষ ইসলামের আলোতে উজ্জ্বল হয় ইসলামের ইতিহাসের ঊষালগ্নেই। তৎকালীন সময় হতে ভারত হয়ে ওঠে মুসলিম গাজি, বিজেতা, আলিম ও দাঈদের মিলনকেন্দ্র। ইসলামি শিক্ষাদীক্ষা, ভারতবর্ষের দিগ্‌বিদিকে প্রসারিত বিনম্র আদর্শ ও মুসলিম বিজেতাগণের নেতৃত্বে পরিচালিত বরকতময় সৈন্যবাহিনীর সামনে ভারতের চতুর্দিকে প্রচলিত পৌত্তলিক আকিদাগুলো নড়বড়ে হয়ে যায়। ফলে, তাদের মূর্তি ও প্রতিমাগুলো তাদের মন্দির ও ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোকে ধ্বংস ও বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারছিল না।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনরা তাদের পরিণতি ও তাদের ধর্মীয় কম্পমান অবস্থা দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়। সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদের নেতৃত্বে চিড় ধরে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতের পূর্বপ্রান্তে একদল সংস্কারপন্থি হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকের উদ্ভব ঘটে। তারা তাদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল চাঙ্গা করতে ব্রাহ্মণের ভালোবাসা, তার প্রতি কল্পনাতীত, দুর্বোধ্য, অবিনশ্বর ও অভঙ্গুর এক প্রীতি সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করে। কিন্তু হিন্দুদের স্বভাব উক্ত কাব্যিক ভাষা গ্রহণ করেনি। কারণ, হিন্দুরা পাথুরে মূর্তির পূজাতে অভ্যস্ত ছিল। মতাদর্শ দুটি ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে চলাচল শুরু করে।

ক. জ্ঞানার্জনের পথ

এই মতটি সৎকাজের প্রতি বিশ্বাস করে না। তার নিকট যা আছে, সবটুকু জ্ঞান ও ধ্যানের কারণে অর্জিত হয় বলে মনে করে। কারণ, এ মতের আকিদা হচ্ছে, এ জীবন ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য যথেষ্ট নয়। তার আরাধনা-আনুগত্য তো দূরের কথা।

ভারতীয় তাঁতি কবি কবীর দাস (১৪৪০-১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি ছিলেন রামানন্দ বিদ্যাপীঠের (১৩৬০-১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দ) অনুসারী বারোজন দূতের অন্যতম। এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় ও জনৈক মুসলিমের বাড়িতে বেড়ে ওঠায় এ মতাদর্শের বড় প্রচারক হয়। তিনি তাদের চিন্তাদর্শনে সকলের সঙ্গে বৈরিতা পোষণ করে ঈশ্বরের জাত তথা সত্তার চিন্তায় নিমগ্নতার আহ্বান করতেন। তিনি বর্ণনা করতেন, আল্লাহ বা ঈশ্বর কল্পনাতীত ও অদৃশ্য। সুতরাং এত পূজা-অর্চনা, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান বা উৎসর্গ-পরব কেন?

আমার ধারণা মতে, তিনি ভারতের ইতিহাসে *ওয়াহদাতুল আদয়ান* তথা 'সকল ধর্মের একতা'র প্রথম প্রবক্তা। শংকরাচার্যের (৭৮৮-৮২০ ঈসায়ী) পর তিনি চরমভাবে 'হুলুল ও ইত্তিহাদ (ঈশ্বরের অবতারবাদ)' আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন।

তার চিন্তাদর্শন স্পষ্ট করার লক্ষ্যে তার এক টুকরো কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি। সে বলে : ১) তুমি আমাকে খোঁজ কোথায়? আমি তো তোমারই কাছে। আমাকে পাবে না গাভি ও ছাগলে। ২) পাবে না কো মোরে চাকু আর ক্ষতে। আমি নয় প্রাণীর চামড়াতে। নয় কোনো গোশত বা খুনে-রক্তে। ৩) নয় আমি পূজা-পার্বণে। থাকি নাকো সন্ন্যাসে। আমাকে খোঁজ যবে, পলকেই পেয়ে যাবে।

কবীর দাস আরো বলেন : ক) হে সন্ন্যাসী ও পুরোহিতবৃন্দ, আমি দৌড়ি প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে। রই আমি সর্বত্রে। খ) দুনিয়া মস্ত পাগল। দুনিয়া পাথুরে মূর্তির পূজা করে। পূজা করে না পেষণ যন্ত্র যাঁতাকলের পাথরকে, যে পাথরে পিষ্ট খাবার ভক্ষণ করা হয়।

সে তপস্যা বা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বয়োবৃদ্ধ এক গুরুকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতো। কারণ, সে বিশ্বাস করতো ঈশ্বর উক্ত গুরুর মাঝে অবতরণ করেছেন বা আসীন হয়েছেন। তাই কবীর দাস উদ্ধৃত করে বলেন : 'আমি একদা আমার সম্মুখে ঈশ্বর ও গুরুকে দেখতে পাই। পরক্ষণে আমার পথপ্রদর্শক গুরুর সিজদায় লুটিয়ে পড়ি।'

কবীর দাস হিন্দুদের রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের কঠোর সমালোচনা করতেন। এবং তার অদ্ভুত চিন্তাধারাও রয়েছে। যার সবটুকু এখানে বলা সম্ভব নয়। শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক ওয়াহদাতুল আদয়ানের দর্শনে কবীর দাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরের আলোচনাতে তা সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হবে।

খ. গুরুভক্তি ও ভালোবাসার মতাদর্শ

এ মতাদর্শ প্রথমোক্ত মতাদর্শের সঙ্গে জ্ঞান ও তপস্যার্জনে এক ও অভিন্ন। তবে খুব বেশি তপস্যাকে গুরুত্ব দেয় না। বরং ভক্তি-ভালোবাসাকে খুবই প্রাধান্য দেয়। কবি

গায়েশ এই মতাদর্শের অন্যতম প্রচারক ও পথিকৃৎ। তার রয়েছে *বদমাউত* নামের একটি প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ।

গ. রামের প্রতিমায়ন

এ মতাদর্শ নিছক কল্পনাতে তুষ্ট নয়। বরং একজন প্রিয় ব্যক্তিত্বকে বাছাই করে ঈশ্বরের মর্যাদায় আসীন করে। যেন সুনিবিড়ভাবে ধ্যানমগ্ন করা যায় এবং ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। তাদের মতামত হলো, রাম উৎকৃষ্ট মডেলের মূর্ত প্রতীক। তুলসী দাস (১৫১৭-১৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) এ মতাদর্শের বড় ব্যাখ্যাকার ও মুখপাত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ, তুলসী দাসই রামের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে একজন ভদ্র সন্তান, সৌভাগ্যমণ্ডিত স্বামী, বদান্যতাময় ভাই, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ইত্যাদি গুণে। (আমরা রাম ও হিন্দুধর্মে তার ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কে পূর্বে আলোকপাত করেছি।)

ঘ. কৃষ্ণের প্রতিমায়ন

এ মতাদর্শ পূর্বোক্ত মতাদর্শের মতোই। তবে মডেল-চয়নে ভিন্নতা রয়েছে। পূর্বের মতাদর্শের মুখপাত্র তুলসী দাস মডেল হিসেবে বাছাই করেছে রামকে। আর এই মতাদর্শের মুখপাত্র সূর্যদাস (১৫০৭-১৫৮৩ খ্রি.) মডেল হিসেবে কৃষ্ণকে বাছাই করেছে এবং নানা উপকথা ও কল্পকাহিনি কৃষ্ণ নিয়ে রটনা করেছে সূর্যদাস।

শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানকের জন্মের সময় এই ছিল তৎকালীন ভারতের চিন্তাগত ও সামাজিক অবস্থা। গুরু নানক পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর জেলার অন্তর্গত এক গ্রামে একটি হিন্দু ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই গুরু নানকের মনমানস নির্জনতা ও একাকিত্ব প্রিয় ছিল। হোসাইন দরবেশ, ইসমাইল বুখারি, আলি হাজবিরি, বাবা ফরিদগঞ্জ ও জালালউদ্দিন বুখারি প্রমুখদের মতো মুসলিম সুফিদের সঙ্গে গুরু নানক ওঠাবসা বা সাহচর্য গ্রহণ করতেন। গুরু নানক সকল ধর্মের মাঝে মিশ্রিত একটি ধর্মমত প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন কবীর দাসের অন্যতম শিষ্য। গুরু নানকের দিকেই 'গুরু গ্রন্থ সাহিব',[১৫৫] সম্পর্কিত করা হয়, যা কিনা সকল শিখ ধর্মাবলম্বীর কাছে একটি পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছে। *গুরু গ্রন্থ সাহিব* স্ববিরোধী আকিদা-

[১৫৫] কির্তার সিং বলেন, অর্জুন *গুরু গ্রন্থ সাহিব* নামক গ্রন্থটি ১৬০৬-১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কির্দাস জী'র মাধ্যমে লিখিয়ে ছিলেন। বাবা ফরিদগঞ্জের ১১২টি কবিতা ও কবীর দাসের বিশাল কবিতাসমগ্র 'গুরু গ্রন্থ সাহিব'-এ স্থান পেয়েছে।

বিশ্বাস ও পরস্পর সাংঘর্ষিক বিষয়াবলিতে পরিপূর্ণ। *গুরু গ্রন্থ সাহিব*-এ ভারতের ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও নানা ধর্মের অদ্ভুত মিশ্রণ পাওয়া যায়।

গুরু গ্রন্থ সাহিব অধ্যয়ন করলে প্রতিভাত হয়, গ্রন্থকার মত-পথ নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বীর কাছে অনুসরণীয়-রূপে গৃহীত হওয়ার জন্যে নিজেকে উচ্চ মর্যাদাশীল সাব্যস্ত করার প্রয়াস চালিয়েছে উক্ত গ্রন্থে। কিন্তু শুরুতেই এ প্রচেষ্টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কারণ, শিখধর্ম ভারতে তৃতীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, যা ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে একই সময়ে যুদ্ধরত ছিল।

সামনে শিখদের কিছু আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করব। শিখরা মূলত হিন্দুধর্ম থেকে এসব বেছে নিয়েছে।

১. সকল ধর্মের ঐক্য বা একতা

হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ *ভগবদ্গীতা* সম্পর্কে গুরু নানক পূর্বে বলেছেন যে, তোমরা যে পদ্ধতিতে আমার পূজা করবে, আমি সে পদ্ধতিতে তোমাদেরকে হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করবো। লোকেরা আমার পূজা করার জন্য নানা ধরন গ্রহণ করে। সকল পদ্ধতি ও মত তোমাদেরকে আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

বেদান্তে আছে, নিশ্চয়ই বেদান্ত কোনো ধর্মদর্শন বা দার্শনিক চিন্তার বিরোধিতা করে না।

এ সকল চিন্তাধারা হিন্দুদের মন-মগজে প্রোথিত থাকে। যদ্দরুন তারা কোনোরূপ সংকীর্ণতা ও পর্যালোচনা-বিহীন সকল পরস্পর বিরোধী আকিদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে নেয়। তাই আমরা তাদের মাঝে কাউকে একত্ববাদে বিশ্বাসী পাই। আবার কাউকে ত্রিত্ববাদে। কাউকে আবার বহু ঈশ্বরবাদে। তাদের মাঝে আরও রয়েছে নাস্তিক কিংবা কোনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না অথচ তারা হিন্দুধর্মের ফাঁদে আবদ্ধ। কারণ, জন্মগ্রহণ তাদের ধর্ম-দর্শনে থাকা তাদের জন্য আবশ্যক করে দেয় এবং কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো স্তর থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব হবে তখনই, যখন প্রাণ এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয় এবং এক স্তর থেকে অন্য স্তরে রূপান্তরিত হয়। এটি হলো ভারতের ইতিহাসে (ওয়াহদাতুল আদিয়ান) সকল ধর্মের একতার মূল চাবিকাঠি বা চিন্তাধারা।

গুরু নানক 'ওয়াহদাতুল আদিয়ান'-এর দর্শনের সুযোগ নিয়ে হিন্দুদের মগজে তা পুনর্বার প্রোথিত করতে মনস্থ করেন। তিনি বেশ চাতুর্যের সঙ্গে তার দর্শনের সঙ্গে ইসলামধর্মকে সংমিশ্রণ করেন এবং সৃষ্টিজাত মানবীয় গুণাবলি সংবলিত কিছু আকিদা-

বিশ্বাস ইসলামধর্ম থেকে বাছাই করেন। সকল মতাবলম্বী ও ধর্মের অনুসারীদের আধ্যাত্মিক গুরু হওয়ার তাড়নায় তিনি এই নব্য ধর্মটির গোড়াপত্তন করে।

তার সূত্র ধরে নানক বলেন, নিশ্চয় হিন্দুদের ছয়টি বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্যাপীঠ আছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আছে প্রতিষ্ঠাতা ও কর্তৃপক্ষ। সকল প্রতিষ্ঠাতাই একই প্রস্রবণ হতে পান করে (সকলে এক ঘাটের পানি পান করে)। যদিও তাদের বাহ্যিক রূপ-রং, আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি বিভিন্ন। সুতরাং যে বিদ্যাপীঠ স্রষ্টা, তাঁর বড়ত্ব ও অপার শক্তিতে বিশ্বাস করে, তুমি তাকে গ্রহণ করে নাও। মনে করো, এ বিদ্যাপীঠটি তোমার হারানো বা হৃত সম্পদ। কারণ, এতেই উন্নতি, অগ্রগতি ও উৎকর্ষ নিহিত রয়েছে। তুমি কি দেখো না, সূর্য একটি। পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন।

ওহে নানক, নিশ্চয় ঈশ্বর এক। যদিও তার পূজা-আরাধনার রূপ আলাদা এবং তার সৃষ্টির রূপগুলো বহুরূপী।[১৫৬] শিখ নেতা গোবিন্দ সিং বলেন, মন্দির (হিন্দুদের উপাসনালয়) ও মসজিদের (মুসলিমদের ইবাদাতগৃহ) মাঝে আর হিন্দুদের পূজা ও মুসলিমদের নামাজে কোনো পার্থক্য নেই।

আমরা গুরু গোবিন্দ সিংয়ের প্রত্যুত্তরে বলবো, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে মন্দির ও মসজিদ এক নয়। এমনকি মন্দির ও মসজিদের বাহ্যিক রূপও আলাদা। কারণ, মন্দির হলো মূর্তি-প্রতিমার কেন্দ্র। মন্দিরের মেঝে পবিত্র করা হয় গাভির মলমূত্র দিয়ে। মসজিদ সম্পূর্ণ তার ভিন্ন মেরুতে। কারণ, মসজিদ নির্মিত হয় শুধু মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্যই এবং মসজিদের মেঝে পবিত্র করা হয় পানি ও মাটি দিয়ে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

> আর নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে ডেকো না। [সুরা জিন, আয়াত ১৮]

হিন্দুদের পূজা হলো নৃত্য, বাদ্য-বাজনা, গান, মূর্তিকে সেজদা করা, সন্তানের জন্যে নারীদের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা তথা লিঙ্গ পূজার মতো অশ্লীল কর্মাবলির নামই হলো হিন্দুদের পূজা। পক্ষান্তরে মুসলিমদের নামাজ ও ইবাদত সম্পূর্ণ আলাদা। প্রশান্ত হৃদয়ে, পবিত্র জবানে ও পরিচ্ছন্ন পোশাকে আল্লাহর স্মরণ (জিকির), তাঁর গুণকীর্তন বর্ণনা

---

[১৫৬] *গুরু গ্রন্থ সাহিব*, অধ্যায় : রাক আসা।

(তাসবিহ) এবং পরাক্রমশালী এক আল্লাহর কাছে একাগ্র ও অনুগত হওয়ার নামই মুসলিমদের সালাত বা নামাজ।

অতএব, গোবিন্দ সিং কীভাবে মন্দির ও মসজিদ আর হিন্দুদের পূজা এবং মুসলিমদের নামাজকে সমান ভাবলেন, তা বোধগম্য নয়। তিনি কেবল নানকের চিন্তাদর্শন নিয়েই বিভোর। নানক প্রতিটি বস্তুতেই একতা ও ঐক্যের দিবাস্বপ্ন দেখেন।

নানক বলেন, একজন ব্যক্তির প্রকৃত মুসলিম হওয়া কষ্টসাধ্য। যদি কোনো মুসলিম পাওয়া যায়, আমরা তার পথ রুদ্ধ করি না।

হে নানক, শিখ কিংবা মুসলিম কোনো ব্যক্তিকেই আপনি ছাড়বেন না, যখন তারা আপনার মতাদর্শ মেনে নেবেন।

গুরু গোবিন্দ সিং এর উদ্দেশে বলবো, একজন প্রকৃত মুসলিম যখন আপনাদের অলীক ধারণা ও অপসংস্কৃতিগুলো গ্রহণ করেন, তখন তিনি আর মুসলিম থাকেন না। কারণ, ইসলাম যেকোনোরূপে অনুপ্রবেশকারী চিন্তাদর্শনকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> যে ইসলাম ব্যতিরেকে অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা অনুসন্ধান করে, তার থেকে কিছুই কখনো গ্রহণ করা হবে না। সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৫]

হিন্দুধর্ম থেকে শিখদের সংগৃহীত বিষয়াদি

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রসারিত হিন্দুধর্মের দ্বারা শিখধর্ম খুব বেশি প্রভাবিত হয়। তবে হিন্দুধর্মের সবকিছুই শিখধর্ম গ্রহণ করেনি। বরং নতুন আদল ও মডেলে শিখধর্মকে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে পরিমার্জনের চেষ্টা চালানো হয়। হিন্দুধর্ম পূর্বের বর্ণনার মতোই মৌলিক আকিদা বা থিমশূন্য একটি ধর্ম। হিন্দুধর্ম শিখধর্মের নতুন সংযোজিত বিরল চিন্তাদর্শনকে সাংঘর্ষিক ভাবে না। বরং শিখধর্মকে হিন্দুধর্ম খুব সাদাসিধে-ভাবে গ্রহণ করে। এমনকি তার একটি অংশ বলে বিবেচনা করে।

সামনে এমন কিছু আকিদা-বিশ্বাস তুলে ধরবো, শিখরা যা হিন্দুধর্ম থেকে সংগ্রহ করেছে।

ক. জীবনের লক্ষ্য

জনসাধারণের মাঝে পরিচিত হিন্দুধর্মের জীবনের লক্ষ্য হলো নির্বাণ লাভ (অর্থাৎ ব্রহ্মার সঙ্গে আত্মার একীভূত হওয়া ও আত্মার চক্র হতে মুক্তি পাওয়া)। শিখধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে নির্বাণ আকিদা গ্রহণ করে। কিন্তু যখন শিখধর্ম ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়, আর নির্বাণের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনে জটিলতায় ভোগে, তখন নির্বাণের সঙ্গে যোগ করে বলে, 'সর্বশক্তিধর, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ইচ্ছা হলে তিনি আত্মার চক্র হতে আপন অনুগ্রহে মুক্তি দেবেন'।

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, নতুন সংযোজিত কথা পুনর্জন্মবাদ এর আকিদায় নেই। যদি থাকে, তাহলে এ থেকে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যদেরও মুক্তি পাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। যদিও এমন বক্তব্যের পক্ষে কিছু হিন্দু পণ্ডিতের সায় আছে; তথাপি অধিকাংশের আকিদা এর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থিত।

খ. সর্বেশ্বরবাদ

এই আকিদা ভারতে দীর্ঘ যুগ থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। ভারতে অভিজাত লোক ও হিন্দুদের কাছে চিন্তাশীল ব্যক্তি হলো যে 'হাকিকত' (AIR MEWADWITEA) অর্থাৎ সে অদ্বিতীয় জানে। বেদান্তের স্পষ্ট বর্ণনা মতে, এটাই হিন্দুদের সর্বোচ্চ চিন্তাধারা।

প্রথম পর্যায় : সৃষ্টিজগতের চেনার মাধ্যমে স্রষ্টাকে চেনা।

দ্বিতীয় পর্যায় : স্রষ্টা ও বিশ্বজগতের প্রকৃতির মাঝে পার্থক্য করতে পারা।

তৃতীয় পর্যায় : স্রষ্টা এবং এমন অণুর প্রকৃতির মাঝে এ কথা দর্শন করা। যে অণুর মাধ্যমে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে।

চতুর্থ পর্যায় : হিন্দুদের কাছে সর্ববৃহৎ লক্ষ্য হলো: সৃষ্টির কণা স্রষ্টার সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়া। কারণ, স্রষ্টার সত্তাই সৃষ্টিজগতের ধূলিকণা এবং তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো, যেকোনো উপায়ে একীভূত হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া। তাই তো বেদান্ত মতে, যে ঈশ্বরের সঙ্গে অপর কোনো উপাস্যকে ডাকে ও তার উপাসনা করে, সে পাপিষ্ঠ হয় না।

ভারতের দর্শন জগতে শংকরাচার্য নামক একজন দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ছিলেন বেদান্তের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার। শংকরাচার্যই এই আকিদা-বিশ্বাসকে সুধী সমাজের মাঝে প্রচলন ঘটান এবং উক্ত আকিদার পক্ষে নানা যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করেন। এই আকিদা ভারতের সর্বপ্রান্তে প্রসার লাভ করে। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনদের অনেকেই তা বিশ্বাস করেন। এখনো হিন্দু মুনি-ঋষিরা, সন্ন্যাসী ও পুরোহিতরা দেহকে নানা ধরনের কষ্ট প্রদানে অতিরঞ্জন করে থাকেন। ইচ্ছাকৃত ও বৈরাগ্য লাভের জন্য বিবিধ কষ্ট মাথা পেতে নেন এবং তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে ঈশ্বরে বিলীন হয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তাদের জীবন ফানা করে দেওয়া।

শংকরাচার্যর অপর একটি বাণী হলো, আত্মা, ব্রাহ্মণ ও সৃষ্টিজগৎ এক ও অভিন্ন বস্তু। কিন্তু আমরা তাদের স্বরূপ যথাযথভাবে না জানার কারণে তাদের মাঝে পার্থক্য বা আলাদা করে দিয়েছি। যদি আমরা আমাদের মনকে কামপ্রবৃত্তি, ক্রোধ, লোভ, অহংকার থেকে পবিত্র রেখে দিব্যজ্ঞান অর্জনে পরিশ্রম করি, তপস্যা ও সাধনাতে লিপ্ত হই, তবে আমরা অবশ্যই উক্ত ত্রিবস্তু একীভূত ও অভিন্ন দেখতে পাব।

বেদান্তের আরেক ব্যাখ্যাকার বলেন, আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই না। না বাস্তবে না সৃষ্টিজগতের মাঝে। কারণ, আমরা 'মায়া' দ্বারা পরীক্ষিত। মায়া হলো ছলনার নাম, যা চতুষ্পার্শ্বে থেকে আমাদেরকে বেষ্টন করে আছে। সেই মায়া আমাদের মাঝে 'আনানিয়্যাত' তথা আমিত্বকে জাগিয়ে তোলে। যদি আমরা এই বিভাজনকে মুছে দিতে পারি, আমাদের

অন্তরাত্মাকে ঈশ্বরের মর্জিমাফিক ও পছন্দনীয় বস্তুতে বিলীন হয়ে যেতে পারব। আমরা উপলব্ধি করতে পারব, কীভাবে বিলীন হওয়া যায় এবং সমুদ্রের গভীরে তরঙ্গরাজি বিলীন ও একাত্ম হওয়ার মতো আমরাও স্রষ্টার সত্তার মাঝে বিলীন ও একাকার হয়ে যেতে পারবো।

এসব শংকরাচার্য ও তার সহকর্মীবৃন্দের তথাকথিত অলীক ও উড়ো বাণী। যা সম্পূর্ণরূপে শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক লুফে নিয়েছেন। *গুরু গ্রন্থ সাহিব*-এ তিনি উদ্ধৃত করে বলছেন, তুমি কলম। তুমি রেখা বা লেখা। তুমি কালি। তুমিই টেবিল। নানক আরও বলেন, শুধু তুমি আর তুমি। অন্য কেউ নয়। তিনি অন্যত্র বলেন, তুমি মাছ। তুমি জাল। তুমি শিকারি। তুমি শুধু তুমি। অন্য কেউ নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সত্তার বিষয়ে শিখদের আকিদা এটি। শিখরা নিজেদেরকে ইসলামের মতো তাওহিদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাসী দাবি করে মুসলিমদের সঙ্গে প্রতারণা করে। অবতারবাদের দিকে আহ্বানকারী ভ্রান্ত ও ভ্রষ্টকারী উক্ত আকিদা থেকে স্বচ্ছ নির্মল একত্ববাদ 'তাওহিদ' বহু বহুদূর।

গ. হিন্দুদের কল্পকাহিনি

শিখরা দাবি করে যে, তারা একত্ববাদে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে না। বরং তারাই একত্ববাদের অর্থ প্রথমে উপলব্ধি করেছে বলে দাবি করে। যুক্তি প্রদান করে বলে, কারণ, তারা বিভিন্ন ধর্মের বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে বাছাই করে সন্দেহমুক্ত করেছে এবং এসবের পক্ষে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ভিত্তিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছে। যেগুলো পূর্বে কেউ করেনি। কিন্তু তাদের গ্রন্থরাজিতে দৃষ্টিপাতকারী মাত্রই (তাওহিদ) 'একত্ববাদ'-এর মূল বিধ্বংসী অপসংস্কৃতি ও উপকথাগুলো দেখলেই বিস্ময়াভিভূত হবে।

পাঠকের সামনে *গুরু গ্রন্থ সাহিব*-এ বর্ণিত নানকের কিছু বাণী তুলে ধরা হলো—

নিশ্চয় ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর নাভি থেকে বের হয় এবং বেদের শ্লোকগুলো পাঠ করতে শুরু করে। কিন্তু সে প্রতিপালককে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে ঘূর্ণনের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে যায়।

অন্যত্র নানক বলে, প্রতিপালক হলো বিষ্ণু। সে শিবা। সে ব্রাহ্ম। সে পার্বতী। সে লক্ষ্মী।[১৫৭] অতএব, যে স্রষ্টার পরিচয় প্রকাশ করতে চায়, সে স্রষ্টাকে যথাযথভাবে না

---

[১৫৭] এরা সবাই হিন্দুদের দেবতা।

চেনার ফলে নির্বাক ও মূক হয়ে যাবে। পুরাণ, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ ও সন্ন্যাসীরা এরই সাক্ষ্য দেয়। আর ধর্মদিব্য তোমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে।

এই অধ্যায়টি শিখধর্মের পবিত্র গ্রন্থ *গুরু গ্রন্থ সাহিব*-এর ভূমিকা। শিখরা যা সকাল-সন্ধ্যা জপ করে। এই অধ্যায়ে তাওহিদের (একত্ববাদের) লেশমাত্র নেই। কেবল তাতে আছে হিন্দুদের কল্পকথা এবং মূর্তির সমূহ নাম। যদি উক্ত অধ্যায়ে কোনো কিছু বোঝাও যায়, তবে বোঝাবে যে, শিখরা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে। বাস্তব একত্ববাদ ও যথার্থ তাওহিদ শিখরা আদৌ বুঝেনি। যদি তারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে অবশ্যই তারা তাদের সত্যিকার দিগ্দিশা ও অভীষ্ট লক্ষ্য খুঁজে পাবে ইসলামে।

ঘ. গান-বাজনা

মহিলা হিন্দু সন্ন্যাসীরা প্রভুভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম—নৃত্য, গান ও বাদ্য দ্বারা প্রকাশ করে। গোপী নামে পরিচিত কৃষ্ণের প্রেমাসক্ত নারীরা ও তৎপরবর্তী রমণীরা কৃষ্ণের জন্য প্রেম ও ভালোবাসা প্রকাশ করতো। মীরাবাঈ (১৫১৬-১৫৪৬ খ্রি.) নামী এক মহিলা ছিল, যে নানা মন্দির ও দরবারে সন্ন্যাসী ও মুনি-ঋষিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো। তার সুন্দর কণ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক সুর দ্বারা সন্ন্যাসীদেরকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করতো। সে করতাল নামের এক মিউজিক যন্ত্র বাজাত। কৃষ্ণের মূর্তির সামনে নৃত্য করতো। আর বৃন্দা এবং দারেকা নগরীর (কৃষ্ণের মূর্তিতে প্রসিদ্ধ দুই নগরী) মন্দিরগুলোতে যাতায়াত করতো।

এভাবে হিন্দুদের চিন্তাগঠনে গান ও বাদ্য অনুপ্রবেশ করে। হিন্দু পণ্ডিত এবং দার্শনিকরা মিউজিক বা বাদ্যকে গ্রহণ করেছে, বিশ্বজগৎ সৃষ্টি এবং তার অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বশীল হওয়ার ভাষার মাধ্যম হিসেবে। তারা বিশ্বের প্রত্যেকটি অণু-অংশে এই সুরের ঝংকার শব্দ শুনতে পায়। শিখধর্মে আদৌ বাদ্যের দর্শন ছিল না। পরবর্তী সময়ে শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নানক মিউজিককে বিস্ময়ের পর্যায়ে উন্নীত করে। তার মূলনীতি ও দর্শনগুলো প্রচারের মাধ্যম হিসেবে বাদ্যকে গ্রহণ করে। এমনকি তার শাস্ত্র *গুরু গ্রন্থ সাহিব*-কে গানের সুর লহরীর তালে সাজায়। যে সুরের সংখ্যা প্রায় ৩১টি। আমরা *গুরু গ্রন্থ সাহিব*-এর শেষে এই সুরের দীর্ঘ একটি সূচিপত্র পাই। প্রত্যেক সুরের পাঁচটি শাখা ও আটটি আওয়াজ আছে। নানক এগুলোকে পত্নী ও সন্তান দ্বারা ব্যক্ত করেছে। আর এটিই হলো শিখদের কাছে পবিত্র শাস্ত্র।

শিখ পণ্ডিত ডক্টর গোপাল সিং বলেন, অধিকাংশ শিখ গুরু[১৫৮] সুন্দর মিউজিক জানতেন। প্রথম প্রতিষ্ঠাতা নানক সুন্দর কণ্ঠে সভা-সমাবেশে গান করতেন। তার সঙ্গে একজন মুসলিম কাঠ দ্বারা তবলা বাজাতেন। নানক তার শাস্ত্রকে কবিতা ও সুরের গুঞ্জন

---

[১৫৮] এর দ্বারা শিখ ধর্মের পূর্ণতাদানকারী দশ সংস্কারক উদ্দেশ্য।

দিয়ে সাজিয়েছেন। এমনকি শিখধর্ম মিউজিক দ্বারা পরিচিতি পায়। মিউজিকের বড়ই গুরুত্ব রয়েছে তাদের উপাসনাতে ও ধর্মীয় আবশ্যকীয় কার্যাদিতে। মিউজিক শিখদের জন্য অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিখধর্ম মানুষের কাছে শোভা-সৌন্দর্যে প্রসিদ্ধ। শিখ ধর্মাবলম্বী নরনারী প্রত্যেকের শরীরে মিউজিক প্রবাহিত হয়। যেভাবে রক্ত তাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়। এভাবেই আমরা শিখধর্মকে হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখতে পাই। শিখধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে মিউজিক ও সুরের দর্শন গ্রহণ করতে দেখা যায়। হিন্দুধর্ম দর্শনের ওপর আরও কিছু অপ্রসিদ্ধ অজ্ঞাত বিষয় বৃদ্ধি করে।

উপর্যুক্ত বিষয় দ্বারা শিখধর্ম হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যে বিষয়গুলোতে শিখ ও হিন্দুধর্ম বিপরীত তার সংখ্যা অনেক। সামনে তার কিছু তুলে ধরছি।

শিখ ও হিন্দুধর্মের বৈপরীত্য

এক.

শিখধর্ম মতে কর্মমার্গের (তথা কিছু রীতিনীতি ও নৈবেদ্য প্রদান করা) মাধ্যমে মোক্ষ লাভ হয় না। একইভাবে জ্ঞানমার্গ (জ্ঞান ও তপস্যা অর্জনে নিমগ্ন থাকা) দ্বারাও মোক্ষ লাভ হয় না। বরং এক ঈশ্বরের উপাসনা ও তার তরিকা অনুসরণের মাধ্যমেই মোক্ষ লাভ হয়।

সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়ে শিখধর্ম হিন্দুধর্মের চেয়ে ইসলাম দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছে। কারণ, হিন্দুধর্ম ইবাদাতের অর্থই জানে না। বরং কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ হলো হিন্দুদের মৌলিক দুটি পন্থা। এ দুটি পন্থাই হলো মোক্ষ লাভের উপায়।[১৫৯] অথচ ইসলাম ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে আহ্বান করে। মহান আল্লাহর বাণী দেখুন—

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

> তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না। [সুরা ইসরা, আয়াত : ২৩]

আল্লাহর বাণী—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

---

[১৫৯] উক্ত দুই পন্থার সঙ্গে নির্বাণ অর্জনের তৃতীয় আরেকটি পন্থা যোগ করা হয়। তা হলো ভক্তি মার্গ তথা ধ্যান ও সাধনা।

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। [সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ

হে আমার মুমিন বান্দারা, আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো। [সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৫৬]

ইবাদতের সম-অর্থে ও সমভাষ্যে কুরআনের আরও বহু আয়াত আছে।

'ইত্তিবা' বা আনুগত্য অর্থে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ .

তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার প্রতি নাজিল করা হয়েছে, তুমি তা অনুসরণ করো এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। [সুরা আরাফ, আয়াত : ৩]

মহান আল্লাহর ইরশাদ হয়েছে—

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

অনুসরণ করো তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে। [সুরা যুমার, আয়াত : ৫৫]

এছাড়া ইত্তিবা বা আনুগত্য-বিষয়ক অনেক আয়াত কুরআন মাজিদে আছে।

দুই.

শিখধর্ম সন্ন্যাসবাদ নিষিদ্ধ করে এবং তার অনুসারীদেরকে পার্থিব উপায়-উপকরণ ছেড়ে দিতে ও পার্থিবতা থেকে পুরোপুরি বিমুখ হতে নিষেধ করে।

তবে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনরা মনে করে যে, পার্থিব উপায়-উপকরণ হলো অকল্যাণ ও অনিষ্টতার উৎস। তারই বিপরীতে শিখধর্ম মানুষকে জীবিকা নির্বাহে উৎসাহিত ও

অনুপ্রাণিত করে। তবে সন্দেহ নেই যে, এই চিন্তাধারা হিন্দুধর্মের চেয়ে ইসলামধর্মের খুবই কাছাকাছি। ইসলামধর্মও মানুষকে পার্থিব উপায়-উপকরণ অর্জনের প্রতি উৎসাহ দেয়।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের উপার্জিত সম্পদ থেকে এবং তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে ব্যয় করো এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়ত করো না, বস্তুত তোমরা তা গ্রহণ করো না, যদি না তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখো, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। [সুরা বাকারা, আয়াত ২৬৭]

আল্লাহ তাআলা কুরআনের অন্য স্থানে বলেন—

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

অতঃপর যখন নামাজ সমাপ্ত হয়, তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়ো, আর আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। [সুরা জুমুআ, আয়াত ১০]

জীবিকা উপার্জনের বিষয়ে মুমিনদের উৎসাহদানকারী বহু হাদিস রয়েছে এবং হাদিসে মুমিনদেরকে পরনির্ভরতা, অলসতা ও মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইতেও বারণ করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ একটি হাদিস, যা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

আল্লাহর কসম, কোনো ধনী ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা স্বমহিমায় ধনাঢ্য করেছেন, তার কাছে গিয়ে যাচনা করার চেয়ে একটি রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করে

(বিক্রি করে) জীবিকা অর্জন করা কিংবা (উপার্জিত সম্পদ) দান করা তার জন্য অধিক শ্রেয়। কারণ, নিচের হাতের চেয়ে ওপরের হাত উত্তম।[১৬০]

তিন.

পৃথিবীতে পুনর্জন্ম হওয়া জরুরি নয়। তবে মানুষ কখনো কখনো আল্লাহর পরম দয়া ও উদারতায় স্থানান্তরিত হওয়া থেকে মুক্তি পায়। নিঃসন্দেহে, আল্লাহর পরম দয়া ও উদারতায় মুক্তি লাভ করার বিষয়টি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের কাছে অজ্ঞাত।

চার.

শিখধর্মে পুরুষ আর নারীর মাঝে মার্জনা ও অনুগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমানাধিকার, তা হিন্দুধর্মের বিপরীত। কারণ, হিন্দুধর্মে নারীকে মন্দ ও অকল্যাণের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং জৈনধর্ম নারীর মুক্তির জন্য; নারীকে পুরুষের ধাঁচে জন্মানোকে আবশ্যক মনে করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

> হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেজগার। [সুরা হুজরাত, আয়াত ১৩]

পক্ষান্তরে ইসলাম পুরুষ ও নারীর মাঝে পার্থক্য করে না। বরং উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করে।।

পাঁচ.

শিখধর্ম সব ধরনের ভাষাকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করে, নানা ধরনের ভাষার মাঝে কোনো ভাষাকে বিশেষ মর্যাদাশীল মনে করে না। কেননা, প্রভু মানব হৃদয়ের ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাচেতনা সবই বুঝেন। পক্ষান্তরে হিন্দুধর্মে তার উলটো চিত্র দেখা যায়। হিন্দুধর্ম সংস্কৃত ভাষাকে পবিত্র মনে করে এবং সেটিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। আর এটি হলো

---

[১৬০] *সহিহুল বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*

তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদের ভাষা। এ ভাষাতেই ব্রহ্মা তার পূজারিদের সম্বোধন করে থাকেন। এই ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষার উপাসনা তিনি গ্রহণ করেন না। বর্তমানে ভারতে সেই সংস্কৃত ভাষাটি হলো, হারিয়ে যাওয়া ভাষাগুলোর একটি। যার খোঁজ পাওয়া দুঃসাধ্য। এমনকি হিন্দু পণ্ডিতগণও সংস্কৃত ভাষায় অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও যোগাযোগ করেন না।

পক্ষান্তরে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ .

আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত ৪]

এবং আল্লাহ তাআলা শেষ কিতাবটি সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় নাজিল করেছেন এবং তিনি বলেছেন—

إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

আমি একে করেছি কুরআন, আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। [সুরা জুখরুফ, আয়াত ৩]

ছয়.

প্রভু কোনো জাতি বা দলকে তফাত করেন না। বরং তার দ্বীন সকল এবং সর্বস্তরের জন্য। সুতরাং যে প্রভুর দ্বীন গ্রহণ করে নেয়, সে মুক্তি লাভের অধিকারী। অন্যদিকে হিন্দুধর্ম তা স্বীকার করে না। কারণ, তারা মনে করে যে, ব্রাহ্মণরা হলেন প্রভুর পবিত্র বান্দা। আর তারাই তার উপাসনা করেন এবং তার জন্য নৈবেদ্য প্রদান করেন।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

> হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেজগারি অর্জন করতে পারবে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২১]

প্রসিদ্ধ হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সমস্ত নবি প্রেরিত হতেন কেবল তাদের সম্প্রদায়ের জন্য, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য।[১৬১]

সাত.

শিখধর্ম অবতারবাদের বিরোধিতা করে। অবতারবাদ হলো; ঈশ্বর তার সৎ ও ধার্মিক বান্দাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য মানব আকৃতিতে পৃথিবীতে অবতরণ করা। এবং শিখধর্ম ইসলাম অনুমোদিত নবুওয়ত ও রিসালতকে সমর্থন করে থাকে।

আল্লাহর তাআলা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানুষের মাঝে ঘোষণা দিতে বলেন যে—

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًا .

> (হে নবি) বলুন, আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁর পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাঁর পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরিক না করে। [সুরা কাহাফ, আয়াত : ১১০]

তবে শিখ সংস্কারকদের মৃত্যুর পর পূর্বোল্লিখিত বিশ্বাস ও মতবাদ নিয়ে শিখরা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বরং তারা খুব শিগগিরই তাদের গুরু ও সংস্কারকদেরকে দেবতা বানিয়ে ফেলে এবং প্রভুকে বাদ দিয়ে তাদের উপাসনা শুরু করে দেয়। তারা শিরক ও কুফরিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর তাদের কাছে তাদের সংস্কারকই হলেন আদেশ ও নিষেধকারী। তিনিই বিধায়ক ও নিপুণ ভাষ্যকার। গভীর ধ্যানস্থতা ও আত্মমগ্নতায় সংস্কারককে স্মরণ করাই হলো তাদের কাছে সর্বোত্তম উপাসনা।

উপর্যুক্ত বিষয়াদিতে হিন্দুধর্ম ও শিখধর্মের মাঝে মতাদর্শগত ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা তো অবশ্যই রয়েছে।

---

[১৬১] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং : ৩৩৫ ও ৪৩৮।

ইসলামের আলো থেকে শিখধর্মের সংগৃহীত বিষয়াদি

মহান আল্লাহর গুণাবলি, ইসলামধর্মের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকা সত্ত্বেও শিখধর্ম অনেক কিছু ইসলামধর্ম থেকে গ্রহণ করে তাদের ধর্মভুক্ত করে নেয়। সেসব বিষয়াদি থেকে কয়েকটি সামনে প্রদত্ত হলো:

মহান আল্লাহর কতিপয় গুণাবলি

হিন্দুধর্ম মহান আল্লাহর কতিপয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে বহু সত্তায় বিভক্ত করে নেয়। এবং তারা ঈশ্বর, আত্মা ও পদার্থকে অবিনশ্বর বলে বিশ্বাস করে। দীর্ঘকাল থেকে হিন্দু পণ্ডিতগণ তাদের বিশ্বাস ও মতাদর্শের সপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করতে প্রয়াস চালায়। কিন্তু মুক্ত-স্বাধীন মন উক্ত ব্যাখ্যা ও প্রমাণাদি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে। অনুগত হয়নি তাদের খোঁড়া ও অসার যুক্তিতর্কের প্রতি।

শিখ সংস্কারকগণের মুসলিম আলিমগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ফলে তারা যদি ইসলামের কিছু আকিদা গ্রহণ করে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না। তবে, এ কারণে নানক প্রকাশ্যে হিন্দু ও ভেতরে ভেতরে মুসলিম ছিল এমন ধারণা করা কোনো মুসলিমের উচিত হবে না। যেরূপ ভারত ও ইউরোপে কিছু লোক বিশ্বাস করে।

প্রত্যেক মুসলিমের সূক্ষ্মভাবে বোঝা প্রয়োজন, 'আংশিক মুসলিম নীতি' ইসলাম কখনো গ্রহণ করে না। ফলে, যে ব্যক্তি ইসলামের কিছু বিধান ও অন্য ধর্মের কিছু বিধান নিয়ে গুলিয়ে ফেলে, ইসলাম তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইসলাম তা কিছুতেই সমর্থন করে না।

আমরা আমাদের পূর্বেকার বিষয়ে ফিরে আসি। আমরা বলি, শিখরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। তারা বলে, আল্লাহ অনন্ত অনাদি। তিনি সৃষ্টিকর্তা, সর্বনিয়ন্তা ও সবকিছুর হেতু। হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অসঙ্গতি ও বিভেদ থেকে তিনি পূতপবিত্র। তিনি প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর জন্য ন্যায়বান, দয়ালু এবং মহৎ এক প্রভু। তিনি মানবজাতিকে পাপের

প্রায়শ্চিত্ত দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং তাঁরই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।[১৬২]

পূর্বোক্ত কথায় আমরা ইসলামের অনেক কিছু সন্দেহাতীতভাবে অনুধাবন করতে পারি। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী—

এক.

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْـَٔاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

> তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সকল বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। [সুরা হাদিদ, আয়াত : ৩]

কুরআনে আল্লাহর জন্য চিরন্তন (আজল) ও অবিনশ্বর (কাদিম) শব্দ দুটি আসেনি। শব্দদ্বয় দার্শনিকদের ভাষায় পাওয়া যায়। এসব শব্দ ব্যবহার করার চেয়ে না করাই উত্তম।

দুই.

وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا

> আর তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতরূপে। [সুরা ফুরকান, আয়াত : ২]

তিন.

প্রসিদ্ধ হাদিসে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করে বলেন, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে একজন সেবক চাইলেন। মহানবি তাকে বললেন, আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা আমি তোমাকে দেবো। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ফিরে গেলেন। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরক্ষণে তার কাছে এসে বললেন, তুমি যা চেয়েছ তা তোমার কাছে প্রিয়, নাকি তার চেয়ে উত্তম কোনো কিছু আমি বলব? আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, তুমি বলো, না। আমি যা চেয়েছি তা আমার কাছে প্রিয় নয়। বরং তার চেয়েও উত্তম কোনো কিছু থাকলে তা আমার কাছে প্রিয়। ফাতেমা বরাবর তা-ই

---

[১৬২] *গুরু গ্রন্থ সাহিব* গ্রন্থের ভূমিকায় ড. গোপাল চাঁদ সিং এভাবেই বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন।

বললেন। তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ফাতেমা, তুমি বলো—

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

হে আল্লাহ, আপনি আকাশমণ্ডলী, জমিন ও মহান আরশের রব। আমাদের রব ও সবকিছুর পালনকর্তা। আপনি তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন অবতীর্ণকারী। হে আল্লাহ, আপনিই শুরু, আপনার আগে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই এবং আপনিই শেষ, আপনার পরে কোনো কিছু নেই। আপনিই প্রকাশ্য, আপনার উর্ধ্বে কেউ নেই। আপনিই বাতিন, আপনার অগোচরে কিছু নেই। আমাদের ঋণকে আদায় করে দিন এবং অভাব থেকে আমাদেরকে সচ্ছলতা দিন।[১৬৩]

চার.

তিনিই সকল জাতির প্রভু। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেজগারি অর্জন করতে পারবে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২১]

আর হিন্দু দেবতা ব্রহ্মা কেবল ব্রাহ্মণদেরই দেবতা, যাদেরকে তিনি স্বীয় মুখ থেকে সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মাই তাদের উপাসনা কবুল করেন। অন্যান্যদেরকে হিন্দুরা চণ্ডাল আখ্যা

[১৬৩] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং : ২৭১৩।

দেয়। তারা আরও ধারণা করে, পুনর্জন্মে ব্রাহ্মণের ঘাঁটে জন্ম না নিলে তাদের মোক্ষ লাভ হবে না।

হিন্দুধর্ম মতে প্রসব ও সৃষ্টিগতভাবেই অপবিত্রতা সাব্যস্ত হয়, যা পুরোপুরি ইসলাম ধর্মের বিপরীত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا

> মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। [সুরা তাওবা, আয়াত ২৮]

উক্ত নাপাকি বা অপবিত্রতা হলো শিরক, কুফরি ও জুলুমের নাপাকি। তুমি কি দেখো না যে, একজন মুশরিক যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনে। আর তাদের অনুগত হয়। সে মুমিনদের দলভুক্ত হয়। শিখরা ইসলাম থেকে উক্ত আকিদা গ্রহণ করে।

পাঁচ.

আলাহ তাআলার ন্যায়পরায়ণতা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

> আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোনো পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। [সুরা আনআম, আয়াত ১১৫]

ছয়.

আল্লাহ তাআলার দয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ

> আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি মহাকরুণাময় দয়ালু। [সুরা বাকারা, আয়াত ১৬৩]

সাত.

আল্লাহর মহত্ত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَاأَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

হে মানুষ, কীসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো? [সুরা ইনফিতার, আয়াত : ৬]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

অতএব, শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। [সুরা মুমিনুন, আয়াত ১১৬]

আট.

সৃষ্টির প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য :

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিনজাতি সৃষ্টি করেছি। [সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬]

পক্ষান্তরে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনরা পুনর্জন্মবাদ, কর্মবাদ প্রভৃতি মতবাদে বিশ্বাস করে। ফলে, সৃষ্টি পৃথিবীপৃষ্ঠে বিগত জীবনের ভালো-মন্দ কর্মফল নিয়েই পুনর্বার জন্ম নেবে। অতঃপর এই চলমান কারাগারে শাস্তি ভোগ করবে। অবশেষে স্রষ্টা ব্রহ্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে তার নির্বাণ অর্জন করবে।

এভাবেই আমরা দেখতে পাই, শিখধর্ম হিন্দুধর্মের চেয়েও ইসলামধর্ম দ্বারা বেশি প্রভাবিত। শিখধর্মের প্রধান শাস্ত্র *গুরু গ্রন্থ সাহিব* আল্লাহর মহৎ বাণী ও তার অতীব সুন্দর গুণাবলি দ্বারা পরিপূর্ণ। আর ভারতীয় হিন্দু ধর্মগুলোতে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ পাওয়া যায় না। আর সেই নামসমূহ আল্লাহর জাত বা সত্তার সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত নয়।

ড. গোপাল দত্ত সিং শিখদের ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

প্রভুর বিচারে সমগ্র মানবজাতি সমান। ঈশ্বর মানবজাতিকে কোনো জাতিগোষ্ঠী ও গোত্র-বর্ণে পার্থক্য করেন না। বরং প্রত্যেকেই স্বীয় কর্মের মাধ্যমে হিসেবের সম্মুখীন হবে।

গোপাল দত্ত সিং হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত শ্রেণিবৈষম্য ও শিখদের সাম্যবাদের মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বলেন, হিন্দুদের সর্বনিম্ন শ্রেণি শূদ্রগণ প্রাণী ও কীটপতঙ্গের চেয়ে হীন ও ইতর। আর সর্বোচ্চ স্তর ব্রাহ্মণ সর্বোৎকৃষ্ট। এমনকি হিন্দু ধর্মানুযায়ী ব্রাহ্মণরা উপাস্যও হয়ে থাকে। ভারতবাসী তাদের ইতিহাসে প্রথমে প্রভুর সাম্যবাদ শিখদের জবানেই শুনে। নিঃসন্দেহে শিখধর্ম উক্ত সাম্যবাদ ইসলামের আলোকোজ্জ্বল আকিদা হতেই চয়ন করেছে।

শিখগুরু নানক বলেছেন, নিশ্চয় প্রভু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত সকল বস্তুর স্রষ্টা।

আর কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

আর আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর্ম করছ, সবই সৃষ্টি করেছেন। [সুরা সাফফাত, আয়াত : ৯৬]

গুরু নানক আরও বলেছেন, সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا

তিনি বললেন, তোমার পালনকর্তা এমনটাই বলে দিয়েছেন যে, এটি আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। [সুরা মারইয়াম, আয়াত ৯]

অন্য আয়াতে বলেছেন—

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا

মানুষের ওপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। [সুরা আদ-দাহর, আয়াত ১]

আর হিন্দুদের মতে ব্রহ্মা সৃষ্টি প্রক্রিয়া আত্মা ও উপাদানের মুখাপেক্ষী।

গুরু নানক বলেছে, প্রভু ইন্দ্রিয়াতীত। তিনি ইন্দ্রিয় উপলব্ধ নন।

আর কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ। [সুরা আনআম, আয়াত ১০৩]

উপর্যুক্ত চয়নকৃত উদ্ধৃতি ও বর্ণনাতে, নানক ইসলাম দ্বারা কতটা প্রভাবিত ছিলেন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নানক শিখধর্মে পৌত্তলিক আকিদা-বিশ্বাসের মিশ্রণ ঘটানো থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। নানা ধর্ম ও মতাদর্শের মাঝে তার সামঞ্জস্যতার প্রয়াসও নিষ্ফল হয়। কারণ, শিখদের মহিমান্বিত পবিত্র শাস্ত্র *গুরু গ্রন্থ সাহিব* স্ববিরোধী চিন্তাদর্শন, নানা ধর্মাচার ও বিবিধ মতাদর্শের সংগ্রহশালায় পরিণত হয়।

আর কবীর দাস, রায় দাস, সূর্য দাস ও প্রেমানন্দ প্রমুখদের মতো হিন্দু দার্শনিকদের উড়ো কথা ও কল্পকাহিনিও তাতে পাঠক দেখতে পাবেন। তাতে আরও আছে বাবা ফরিদগঞ্জ, বাবা মারদান খান, সাঁই বাবার মতো বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলিম সুফিদের থেকে বর্ণিত কিছু মারেফত ও হাকিকত তথা মরমি সাধনা ও প্রকৃত জ্ঞান। এ সকল সুফি ও হিন্দু দার্শনিকের অভীষ্ট লক্ষ্য এক হওয়ার পরও তাদের মাঝে মত-পথ ও চিন্তাদর্শনে ঘোর বিরোধ ছিল।

তারচেয়ে বড় কথা হলো, শিখ প্রচারকরা উক্ত চিন্তা সংকলন করতে পেরে গর্বও করে। অথচ শিখধর্মের মৌলিক চিন্তাচেতনা অনুধাবনে আপতিত জটিলতা ও দুর্বোধ্যতাসহ তার মাঝে বিদ্যমান অসঙ্গতি ও বৈপরীত্যগুলোর দিকে তারা দৃষ্টিপাত করে না।

শিখদের পঞ্চভিত্তি

নিম্নোক্ত পাঁচটি ভিত্তি শিখ ধর্মাবলম্বী প্রত্যেকে সর্বত্র আবশ্যকীয়ভাবে ধারণ করে।

প্রথম : কেশ।

মাথার চুল ও দাড়িকে লম্বা রাখা। কারণ, শিখ ধর্মাবলম্বীদের জন্য মাথা ও দাড়ি মুণ্ডানো নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় : কঙ্গ।

মাথা আঁচড়ানোর পরিবর্তে মাথার ওপর বেণি পাকানো।

তৃতীয় : কাশেরা।

হাঁটুদ্বয়ে সংকীর্ণ, সুপরিসর পাজামা বাছাই করা। আর নাভীর নিচ থেকে শরীরের চারপাশ আবৃতকারী হিন্দুদের পরিহিত ছয় মিটারের 'ধুতি' শিখদের জন্য নিষিদ্ধ।

চতুর্থ : কারা।

হাতের কব্জির চারপাশে লোহার কঙ্কন রাখা। সকল প্রকার অলংকার ও মণি-মুক্তা নিষিদ্ধ।

পঞ্চম : কৃপাণ।

শিখদের সঙ্গে থাকা এক ধরনের তরবারি। তা যেন শত্রুর মোকাবেলায় তাদের প্রয়োজনে আসে।

নবুওয়ত ও রিসালতের ক্ষেত্রে শিখদের চিন্তাধারা

হিন্দুদের প্রসিদ্ধ দর্শন হলো, অবতারবাদের বিশ্বাস। (প্রভু ধরাপৃষ্ঠে মানব আকৃতিতে অবতরণ করা এ দর্শনের স্বরূপ)। আর অবতারবাদের অসারতার আলোচনা হিন্দুদের আকিদা-বিশ্বাস পর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

তথাপি 'অবতারবাদ' হিন্দুদের সুবিদিত চিন্তাধারা। তারা এখনো সকল ধর্মসংস্কারককে প্রভুরূপে বিশ্বাস করে। তবে শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এতটুকুতে তুষ্ট হননি। মানব-নবি ও রাসুল প্রেরণের ইসলামের আকিদা তথা নবুওয়ত ও রিসালত দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। উক্ত রিসালতের আকিদা শিখদের মাঝে তাদের পঞ্চম গুরু অর্জুন দাস (১৫৬৩-১৬০১ খ্রি.) পর্যন্ত বলবৎ থাকে। যখন অর্জুন দাস শিখ নেতা হিসেবে মনোনীত হন, তখন পূর্ববর্তী সকল সংস্কারককে দেবতা ঘোষণা করে শিখধর্মে অবতারবাদের প্রবর্তন করেন।

শিখ সংস্কারকদের তালিকা এখানে প্রদত্ত হলো—

এক : গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)।

দুই : আঙ্গদ (১৫০৪-১৫৫২ খ্রিষ্টাব্দ)।

তিন : আমর দাস (১৪৭৯-১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

চার : রাম দাস (১৫৩৪-১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দ)।

পাঁচ : রাজন দাস (১৫৯০-১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দ)।

ছয় : হর গোবিন্দ (১৫৯০-১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

সাত : হরে রায় (১৬৩০-১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ)।

আট : হরে কৃষ্ণ (১৬৫৬-১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

নয় : তেগ বাহাদুর (১৬২১-১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)।

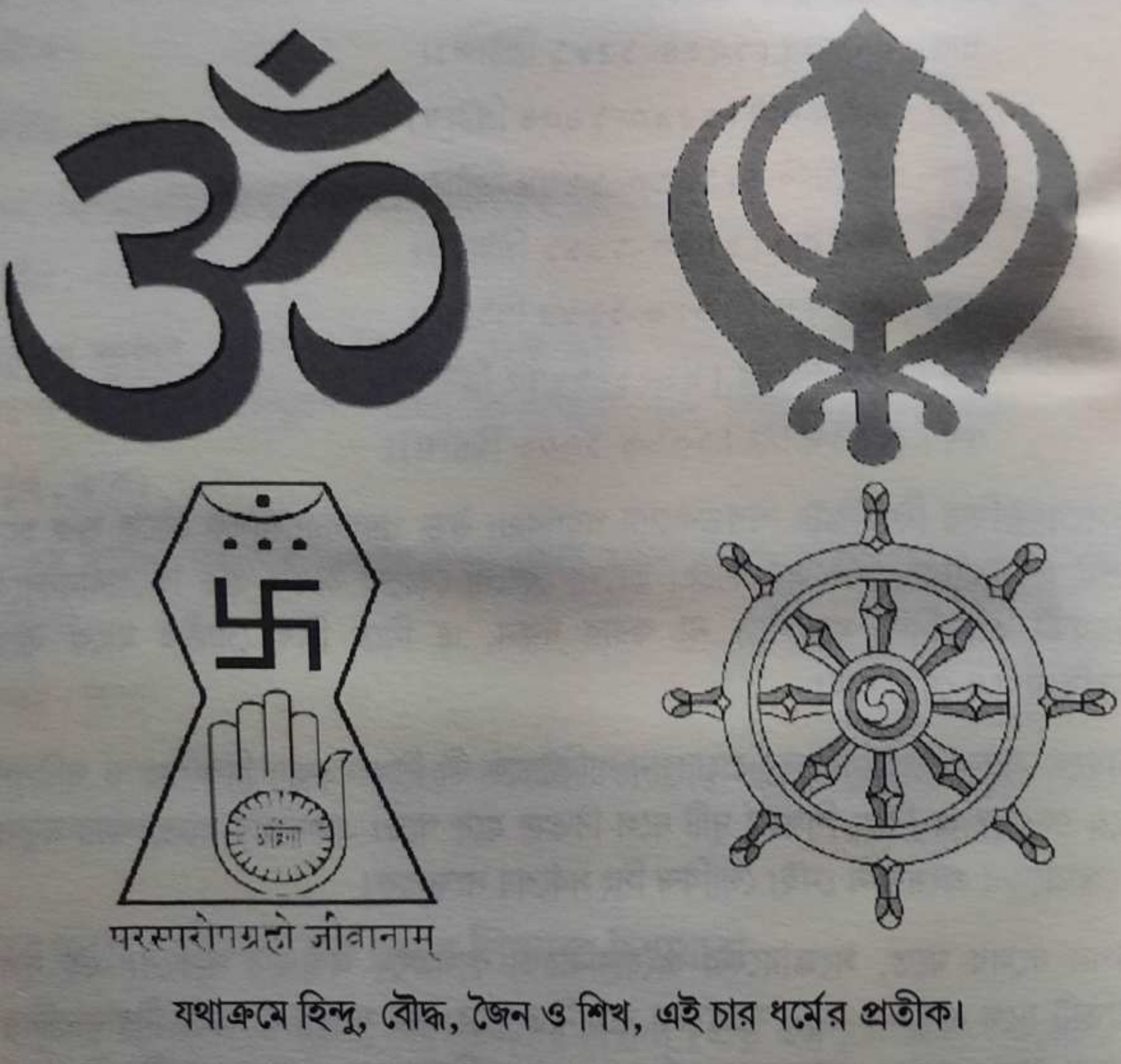
দশ : গোবিন্দ সিং (১৬৬৬-১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দ)।

উপরোল্লিখিত ফিরিস্তিটা শিখগুরুদের পরম্পরা। উক্ত পরম্পরা নানক থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় গোবিন্দ সিং-এর কাছে। তাদের কোনো কোনো অগ্রজ গুরু তিরোধানকালে পরবর্তী প্রতিনিধি মনোনীত না করার দরুন, এ নিয়ে শিখ গোষ্ঠীর মাঝে তীব্র মতবিরোধও দেখা যায়।

তাহলে নতুন সংস্কারকদের প্রয়োজন ব্যতিরেকে কী শিখ মতবাদ বিকশিত ও পরিপূর্ণ হয়ে গেছে? এ নিয়ে শিখধর্ম দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদলের মতে, আর নতুন সংস্কারকের প্রয়োজন নেই। গোবিন্দ সিং সর্বশেষ সংস্কারক।

অপর দলের মতে, সংস্কারকের প্রয়োজনীয়তা কালক্রমে অব্যাহত থাকবে। এই দল প্রতিটি যুগে একজন নতুন সংস্কারক মনোনীত করে। এই সংস্কারক ধর্মের বিধানাবলির ব্যাখ্যা প্রদান করেন, কালের আবর্তনে ও যুগের চাহিদায় তাদের সামনে শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ করেন।

পাঠক লক্ষ করলে দেখতে পাবেন, 'ওয়াহদাতুল আদয়ান' তথা সকল ধর্মের একতা ও নানা মত ও পথের মাঝে দূরত্ব হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রবর্তন হওয়া শিখ চিন্তাধারা তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। এমনকি রূপান্তরিত হয় নতুন একটি মতাদর্শ ও তৃতীয় শক্তিতে, যা একই সময়ে হিন্দু ও ইসলাম-ধর্মের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শিখ ও মুসলিমদের মাঝে ভারতের অভ্যন্তরে অনেক যুদ্ধ-সংঘাত হয়। শাইখ আহমদ ইবনু ইরফান শহিদ বেরেলভি রাহিমাহুল্লাহু ও শাহ ইসমাইল শহিদ রাহিমাহুল্লাহুর নেতৃত্বে সংঘটিত জিহাদ ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল এই শিখরাই। মুসলিমরা বালাকোট প্রান্তরে এই দলের হাতেই পরাজিত হন। মুসলিমদের পরাজয়ের মাধ্যমে দীর্ঘ আট শতাব্দী কাল মুসলিম শাসিত বিশাল ইসলামি ভূখণ্ডের রক্তিম সূর্য অস্ত যায়। অতঃপর ভারতের শাসনদণ্ড কেড়ে নেয় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ। তদানীন্তন সময় হতে অদ্যাবধি ইসলামি শাসন ভারতীয় উপমহাদেশে আর ফিরে আসেনি। মহান আল্লাহই সহায়ক।



যথাক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ, এই চার ধর্মের প্রতীক।

হিন্দুশাস্ত্রে সুসংবাদবাণী

ভারতের মুসলিম পণ্ডিতগণ হিন্দু শাস্ত্রসমূহ ঐশীগ্রন্থ স্বীকার না করার পরও হিন্দুশাস্ত্রে আলোচিত সুসংবাদ বাণী উদঘাটনে সময় ব্যয় করেছেন।

ভারতের অন্যতম বিজ্ঞ হাদিসবিশারদ শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহিম শিয়ালকোটী (মৃত্যু : ১৩৭৬ হি.) *বিশারাতে মুহাম্মাদিয়া* (মুহাম্মদের সুসংবাদমালা) নামক একটি পুস্তক রচনা করেন। ভারতের *জমিয়তে আহলে হাদিস*-এর প্রধান, বিশিষ্ট বিতার্কিক শাইখ সানাউল্লাহ অমৃতসরি (মৃত্যু : ১৩৬৭ হি.) *বিশারাতে মুহাম্মাদিয়া*-কে সংক্ষিপ্ত করে *মুহাম্মদ ঋষি* নামে একটি পুস্তিকা গ্রন্থনা করেন, যা শাইখ মুহাম্মদ দাউদ রাজ ১৩৭৭ হিজরি সালে প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ মুতিউর রহমান চতুর্বেদীও *খাতামুন নাবিয়্যিন* নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

শামস নুবায়দ উসমানির কলমে উক্ত বিষয়ে নতুন একটি গ্রন্থ প্রকাশ পায়। যাতে অন্য লেখকদের অস্বীকৃত নানা বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হয়। এ সকল লেখক তাদের স্ব-স্ব গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্র হতে প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেন।

হিন্দু ও কাদিয়ানিসহ অমুসলিম লেখকগণও এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে গ্রন্থ রচনা করেন। আবদুল হক বিদ্যার্থী কাদিয়ানি *মিসাকুন নাবিয়্যিন* নামে একটি বই লেখেন। তিনি তাতে ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জরাথ্রুস্তবাদীসহ অমুসলিমদের গ্রন্থাদিতে বর্ণিত সকল সুসংবাদ একত্র করেন। গ্রন্থটি ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিশ্বের কয়েকটি ভাষায় তা অনূদিতও হয়।

কিছু হিন্দু লেখকও এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। ড. বেদ প্রকাশ হিন্দুশাস্ত্রে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ বিষয়ক দুটি পুস্তক লেখেন। ড. রমেশ প্রসাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সালামুল্লাহ সিদ্দিকির লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন। তাতে তিনি স্বীকার করেন যে, হিন্দুশাস্ত্র অথর্ববেদে উল্লেখিত *নরাশংস* শব্দের আরবি হলো *মুহাম্মদ*

নরাশংস শব্দটি যৌগিক। *নর* অর্থ মানব। *শংস* অর্থ প্রশংসিত (Praised)। এ দুই শব্দে নরাশংস শব্দটি গঠিত। যার পূর্ণ অর্থ প্রশংসিত মানব। রামেশ প্রসাদ দাবি করে বলেন, তিনি (নরাশংস) আর কে হবেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া?

কাদিয়ানিরাও তাদের কুরআন অনুবাদ ও তাফসিরে উক্ত বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

তামিলনাড়ুতে জন্ম নেওয়া দৈনিক 'নেরুথাম' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ভারতের সুশীল সমাজে সমাদৃত লেখক সায়্যিদ আদয়ার (জন্ম : ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) তার 'আমি ইসলাম ভালোবাসি' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে রয়েছে হিন্দু পুস্তকাদির সুসংবাদ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচ্ছেদ।[১৬৪]

কিন্তু অধিকাংশ মানুষের মনে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। তা হলো হিন্দুশাস্ত্রগুলো ঐশী গ্রন্থ না হয়েও কীভাবে হিন্দুশাস্ত্রে এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুপ্রবেশ করে? আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে স্বয়ং হিন্দুদের বক্তব্য বা অবস্থান কী?

এর উত্তরে আমি বলব—

এক.

হয়তো আর্যরা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের শিক্ষা থেকে এই সুসংবাদ বাণীগুলো চয়ন করেছে। কেননা, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর থেকে একজন রাসুল প্রেরণের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন। যেমনটি কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

> হে আমাদের রব, তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যিনি তাদেরকে আপনার নিদর্শনাবলি পাঠ করে শোনাবেন এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দান করবেন ও তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়। [সুরা বাকারা, আয়াত ১২৯]

অপর দিকে ইরাক ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দাওয়াত চলাকালে আর্যদের দেশত্যাগ বা হিজরত—ইতিহাস স্বীকৃত। আর্যরা

---

[১৬৪] আমার কাছে তথ্য এসেছে যে, সায়্যিদ আদিয়ার ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

হিজরতকালে এ অঞ্চল দিয়ে সিন্ধুতে পৌঁছে। এ সময় তারা ক্যালডিয়ান ও ব্যাবিলনের চিন্তাদর্শন সিন্ধুতে নিয়ে আসে। যা সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতত্ত্বে পাওয়া শিলাতে আবিষ্কার হয়।

আমি মনে করতাম, ব্রাহ্মণরা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দিকে সম্পর্কযুক্ত। অতঃপর আবুল ফজল সাকসাকি হাম্বালি রাহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু : ৭৮৩ হিজরি) রচিত *আল বুরহান ফি মারিফাতিল আদয়ান* নামক গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতিতে আমি নিশ্চিত হই। তিনি বলেন, 'তাদেরকে ব্রাহ্মণ বলার কারণ হচ্ছে, তারা আল্লাহকে স্বীকার করে এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে ছাড়া (আল্লাহ ও উম্মতের মাঝে) মধ্যস্থ সকল রাসুলকে অস্বীকার করে। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের রিসালতকে তারা বিশ্বাস করে বলেই তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে 'বারাহিমা' বা ব্রাহ্মণ আখ্যা দেওয়া হয়।'[১৬৫]

বেনারসস্থ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পুরাণ নাথ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই ও আগস্ট মাসের *টাইমস অফ ইন্ডিয়া* (Times of India) পত্রিকায় প্রকাশিত তার এক নিবন্ধে দাবি করেন, 'ঋগ্বেদের বড় একটি অংশ তাওরাত ও ইবরাহিমের সহিফাগুলো থেকে গৃহীত।'[১৬৬]

হিন্দু এই গবেষক কোথায় ইবরাহিম আলাইহিস সালোমের সহিফাগুলোর সন্ধান পেলেন, তা বোধগম্য নয়। তবে তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সহিফা দ্বারা গ্রিক ভাষায় অনূদিত, ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত (*The Book of Abrahaman*) নামক ইবরাহিম আলাইহিস সালোমের দিকে সম্পর্কিত জেমস কর্তৃক রচিত বইটি বুঝিয়ে পারেন। অথবা হিব্রু থেকে গ্রিক ভাষায় অনূদিত (*The Testament of Abrahaman*) নামক ইংরেজিতে ভাষান্তরিত জি. এস. ফক্স কর্তৃক রচিত বইও বুঝিয়ে থাকতে পারেন।

কিন্তু উক্ত গ্রন্থগুলো ইবরাহিম আলাইহিস সালোমের দিকে সম্পর্কিত করার বিশুদ্ধতা আমি বিশ্বাস করি না। আর আল্লাহ তাআলার বাণীতে বর্ণিত সহিফাগুলোর প্রাপ্তিস্থান আমার জানা নেই। প্রবল ধারণানুযায়ী তা অস্তিত্বহীন।

দুই.

নিশ্চয়ই হিন্দুরা তাদের শাস্ত্রসমূহকে অনেকবার সংস্কার করেছে। তারা হয়তো মুসলিমদের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে মুসলিম শাসনামলে উক্ত সুসংবাদ বাণীগুলো তাদের শাস্ত্রে সংযোজন করেছে।

---

[১৬৫] *আল বুরহান ফি মারিফাতিল আদয়ান*, পৃষ্ঠা : ৭৮।
[১৬৬] *মিসাকুন নাবিয়্যিন*, পৃষ্ঠা : ৯৬।

ভারতের ধর্ম-বিষেশজ্ঞ, আজমগড়স্থ শিবলি কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক সুলতান মুবিন রাহিমাহুল্লাহু হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত সুসংবাদ বিষয়ে আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ২৫ শে জুন ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে আমার কাছে প্রেরিত একটি চিঠিতে বলেন, 'নিঃসন্দেহে তা (সুসংবাদগুলো) বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এসব হিন্দুরা পরবর্তীকালে তাদের শাস্ত্রে সংযোজন করেছে। তারা মুসলিম যুগে অনেক গ্রন্থ রচনা করে পবিত্র ও ঐশীগ্রন্থ বলেও প্রচার করেছে। যেমন: ভবিষ্য পুরাণ ও কালকি পুরাণ।'

এ মতের একটা বিশেষ কারণও আছে। তা হলো, হিন্দুদের অধিকাংশ গ্রন্থের আরবি অনুবাদ খলিফা মামুন ইবনে রশিদের জামানায় বাগদাদের *দারুল হিকমায়* সম্পন্ন হয়। আমি আরবি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলোতে এ সকল সুসংবাদের উপস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করতে পূর্ববর্তী কোনো লেখককে দেখিনি। সংস্কৃত ভাষার বিজ্ঞ পণ্ডিত আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল বিরুনির কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গ্রন্থ দুটি আরবিতে অনুবাদ করেন। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *তাহকিকু মা লিল হিন্দ মিন মকুলাতিন মকবুলাতিন আও মরজুলা* নামক পুস্তকাটিতে এ সকল সুসংবাদের উপস্থিতির ইঙ্গিত দেননি। তাই এ সকল সুসংবাদ গ্রহণে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন অপরিহার্য।

এ সকল সুসংবাদের বিষয়ে হিন্দু পণ্ডিতদের মন্তব্যগুলো নিরীক্ষা করার পরে আমার কাছে সামনের বিষয়গুলো প্রতিভাত হয়েছে।—

১. একদল এই সুসংবাদগুলো তাদের নেতা ও গুরুদের ওপর প্রয়োগ করেছেন।

২. আর কেউ শেষ জামানায় এ সকল সুসংবাদের ব্যক্তির আবির্ভাবের অপেক্ষা করছে।

৩. কিছু হিন্দু পণ্ডিত যেমন দয়ানন্দ ও তার অনুসারীদের মতো এইসব সুসংবাদ-বাণীকে বানোয়াট বলে আখ্যা দেয়।

৪. কিছু হিন্দু পণ্ডিত তার সত্যতা স্বীকার করলেও ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন : ডক্টর বেদ প্রকাশ এবং ড. রামেশ প্রসাদ।

৫. কেউ কেউ উক্ত সুসংবাদের সত্যতা স্বীকার করেছেন এবং মুসলিম হতেও চেয়েছেন। কিন্তু নিজের প্রাণের ভয় বা নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কায় আর ইসলাম তার কপালে জুটেনি। আর যারা ইসলামকে পছন্দ করে মুসলিম হয়েছে এবং ইসলামের ঘোষণা দিয়েছে, তারা নানা প্রকার শাস্তি, প্রহার, গালমন্দ ও নিগৃহের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা হিন্দুদের হাত থেকে পলায়ন করতে পেরেছে,

তারা মুক্তি পেয়েছে। আর যারা হিন্দুদের কবলে থেকে গিয়েছিল, তাদের পরিণতি আল্লাহই ভালো জানেন।

৬. কেউ কেউ নীরবতা পালন করেছেন। আমি ভারতের কিছু লোকের কাছে সুসংবাদপত্র পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, যেন তারা এ পত্রগুলো হিন্দু বিশ্ববিদ্যালগুলোর অধ্যাপকদেরকে দেয়। প্রাপক আমাকে উত্তর দেয় যে, যে সকল অধ্যাপকদের কাছে পত্রগুলো পেশ করা হয়েছে, তারা নীরবতা পালন করেছে। অতঃপর আমি নিজেকে সান্ত্বনার লক্ষ্যে আল্লাহর সত্যবাণী উচ্চারণ করি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

অতএব, আল্লাহ যাকে হিদায়েত করতে চান, ইসলামের জন্য তার অন্তঃকরণ উন্মুক্ত করে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তিনি তার অন্তঃকরণ সংকুচিত করে দেন—খুবই সংকুচিত করে দেন, এমনভাবে সংকুচিত করেন যেন মনে হয় সে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবেই যারা ঈমান আনে না, তাদেরকে আল্লাহ কলুষিত করে থাকেন। [সুরা আনআম, আয়াত ১২৫]

আমার কথা হলো, এটি স্বয়ং হিন্দুদের বিষয়। তাদের শাস্ত্রে উক্ত সুসংবাদমালা আছে বিধায় তারা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তাই তাদের অবস্থান স্পষ্ট করা তাদের কর্তব্য।

উপরোক্ত ভূমিকার পর হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া কিছু সুসংবাদবাণী উল্লেখ করে মহানবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর প্রয়োগের প্রয়াস চালাব। যদিও কিছু ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য দুষ্কর। মহান আল্লাহই সহায়ক।

আমি আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালামের কাহিনি দিয়ে শুরু করবো। তার সঙ্গে আরও থাকবে হিন্দুশাস্ত্রের বর্ণনা মতে নবিদের প্রেরণের উদ্দেশ্য।

আদম ও হাওয়ার উপস্থিতির কাহিনি

'আদামু' নামক এক সুপুরুষ ও 'হাইয়ুতি' নামক
এক মহিলাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১৬৭]

ভবিষ্য পুরাণ এ আদামু শব্দখানা এসেছে। অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রে 'আদামু' শব্দটি পাওয়া যায় না। 'আদম' হিব্রু শব্দ। যার অর্থ মানব। আশুরি মূলে 'আদামূ' শব্দটি এসেছে। তার অর্থ 'সে কাজ ও উপার্জন করে'।

ইহুদি-খ্রিষ্টান ও ইসলামধর্ম একমত যে, আল্লাহ তাআলার সৃজিত প্রথম মানবের নাম আদম। যাত্রাপুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, মহান প্রভু আদমকে পৃথিবীর মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন। তার নাসিক্যে প্রাণ ফুঁকে দেন। ফলে, আদম একজন জীবন্ত প্রাণে পরিণত হয়।[১৬৮]

আল-কুরআনুল কারিম একাধিক আয়াতে আদম সৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়—

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ .

স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রুহ সঞ্চার করব; তখন তোমরা তার প্রতি সেজদাবনত হও। ফেরেশতাগণ সবাই একত্রে সেজদা করলো কিন্তু ইবলিস করলো না। সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো। [সুরা হিজর, আয়াত : ২৮-৩১]

---

[১৬৭] ভবিষ্য পুরাণ : ৪/১৮-১৯।
[১৬৮] যাত্রাপুস্তক : ২/৬।

কুরআন মাজিদে আদম শব্দটি ২৪ জায়গায় এসেছে। *হাইয়ুতি* শব্দটি 'হাউওয়া',[১৬৯] থেকে উদগত। যার অর্থ হায়াত বা জীবন। তিনি হলেন আদমের পত্নী। প্রত্যেক জীবন্ত মানুষের মা হওয়ার কারণে হাওয়াকে হাওয়া বলে আখ্যা দেওয়া হয়। আল্লাহই সম্যক অবগত।

আদমের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন

'বরদান' গ্রামের পূর্বপ্রান্তে এবং উক্ত গ্রামে আল্লাহ তাআলার গড়া নান্দনিক বাগানে আদম তার পত্নীকে দেখার জন্য যান। পাপ বৃক্ষের তলায় আল্লাহর হুকুমে শয়তান অজগরের সুরতে উপস্থিত হয়। অতঃপর আদমপত্নী বৃক্ষ থেকে ফল খায়। তা খাওয়ার দরুন আদম ও হাওয়া জান্নাত থেকে পৃথিবীতে বহিষ্কৃত হয়।[১৭০]

আদম কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের বিষয়টি কুরআন মাজিদে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ.

এবং আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান করো এবং তা হতে যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার করো; কিন্তু ওই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে সেখান হতে বিচ্যুত করলো, অতঃপর তারা উভয়ে যেখানে ছিল, সেখান হতে তাদেরকে বের করলো; এবং আমি বললাম, তোমরা নিচে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; এবং পৃথিবীতেই রয়েছে তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্ট কালের অবস্থিতি ও ভোগ সম্পদ। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৩৫-৩৬]

---

[১৬৯] হাওয়ার আলোচনা হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে (হাদিস নং : ৩৩৩০) *সহিহুল বুখারিতে* সংকলিত হয়েছে।

[১৭০] ভবিষ্য পুরাণ : ৪/৩১-৩৩।

নবি ও রাসুলদের প্রেরণ

কৃষ্ণ বলেন, ওহে অর্জুন, পুণ্যবানদের পরিত্রাণ, পাপিষ্ঠদের বিনাশ ও ধর্ম পুনপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি বারবার নিজেই অবতরণ করি।[১৭১]

কৃষ্ণ হলো হিন্দুদের এক মহারথীর নাম। তারা তাকে ঈশ্বর হিসেবে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে তিনি ঈশ্বরের বাহ্যিক রূপ। আর নিজেই পৃথিবীপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে। এটি হলো নবুওয়ত ও রিসালাতের বিকৃত আকিদা বা বিশ্বাস। খ্রিষ্টানরা কৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বাহ্যিক ঈশ্বর সাব্যস্ত করে। আর বলে, মাসিহ আলাইহিস সালাম মানবাকৃতিতে এক শরীরী ঈশ্বর। এ আকিদা হিন্দুদের মাঝে অবতারবাদ নামে পরিচিত। অবতার সংস্কৃত শব্দ। অর্থ হলো অবতরণ করা।

হিন্দু পরিভাষায় অবতার অর্থ হলো, স্রষ্টা ধরাধামে মানবাকৃতিতে বিশেষ সংবাদ দেওয়ার জন্য অবতরণ করা। তার ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

হিন্দুদের কাছে অবতারবাদ আকিদা নবুওয়ত ও রিসালতের বিকৃত রূপ। কুরআনুল কারিম এ দিকে ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উম্মতের কাছে একজন নবি ও রাসুল প্রেরণ করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদ দানকারী ও সাবধানকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। এবং এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। [সুরা ফাতির, আয়াত ২৪]

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

প্রত্যেক উম্মতের জন্য রাসুল রয়েছে, যখন তাদের সেই রাসুল (বিচার দিবসে) এসে পড়বে, (তখন) তাদের মীমাংসা করা হবে ন্যায়সঙ্গতভাবে, আর তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। [সুরা ইউনুস, আয়াত ৪৭]

[১৭১] গীতা : ৪/৮।

তার সূত্র ধরে মুসলিমরা তাদের ইতিহাসের ঊষালগ্নে অন্যান্য ধর্ম নিয়ে গবেষণা শুরু করে দেয়। ইসলামপূর্ব সকল ধর্মেই পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের ব্যাপারে তারা সকলে পূর্ব থেকেই সম্যক অবগত ছিলেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেন—

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ.

তাদের জন্য আক্ষেপ, যারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে, যারা বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে সমাগত! এর দ্বারা তারা সামান্য মূল্য অর্জন করছে, তাদের হস্ত যা লিপিবদ্ধ করেছে তজ্জন্য তাদের প্রতি আক্ষেপ! এবং তারা যা উপার্জন করছে, তজ্জন্যও তাদের প্রতি আক্ষেপ! [সুরা বাকারা, আয়াত ৭৯]

নিশ্চয়ই ইসলাম সর্বশেষ জীবনবিধান ও আল্লাহর কাছে সত্যধর্ম। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلَامُ

নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র (মনোনীত) ধর্ম। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯]

হিন্দুশাস্ত্রগুলোতে ২৪জন দূত (রাসুল) প্রেরণের কথা স্পষ্ট রয়েছে। দূত ছাড়া বাকি সবারই আবির্ভাব ঘটেছে। তারা ২৪তম দূতের আবির্ভাবের এখনো অপেক্ষার প্রহর গোনে। প্রতীক্ষিত এ দূতের নাম একাধিক দেওয়া হয়েছে।

এক.

কালকি অর্থাৎ যে মানবজাতিকে পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করবে।

দুই.

নরাশংস অর্থাৎ প্রশংসিত মানব।

তিন.

জগৎগুরু অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের দীক্ষাগুরু বা শিক্ষক।

তারা প্রতীক্ষিত নবির আবির্ভাবের কাল নির্ধারণ করেছে *কলিযুগে*। এ ভিত্তিতে বলা যায়, শেষ জামানাতেই প্রতীক্ষিত নবির আবির্ভাব হবে। শেষ জামানা হলো কলিযুগ, যা হাজার হাজার বছর পূর্বে আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ঈসা আলাইহিস সাল্লামের পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত নবি ও পরিত্রাণকারী হতে পারে এমন কেউ আবির্ভূত হননি। ১৪ শত বছর পূর্বে আবির্ভূত নবির ব্যাপারে হিন্দু পণ্ডিতদের নতুন চিন্তার সময় এসেছে।

হিন্দুশাস্ত্রের সুসংবাদগুলো কিছুটা দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট। আর কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট, যা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। অথচ সুনিশ্চিত যে, হিন্দুধর্মের ইতিহাস অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার কারণে তাদের শাস্ত্রে পাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী মর্যাদাপূর্ণ হয় না। উক্ত বিষয়ে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্য হলো তাদের শাস্ত্র দিয়ে তাদের বিপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা। কেননা, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদের নবুওয়ত প্রমাণ করতে হিন্দুশাস্ত্রের কোনো প্রয়োজন হয় না। যেহেতু তাঁর নবুওয়ত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত সংবাদগুলো উদ্ধৃত করে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আমি ব্যাখ্যা করব। যদি পাঠক এতদুভয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য বা মতবিরোধ দেখেন, তখন বুঝে নেবেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত সুসংবাদে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেরূপ তাদের অন্যান্য বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

১. 'শান্তল' গ্রামে তদানীন্তন সময় কোমল হৃদয়ের অধিকারী 'বিষ্ণুব্যাস' নামক ব্যক্তির বাড়িতে 'কালকি' জন্মগ্রহণ করেন।[১৭২]

শব্দের ব্যাখ্যা

শব্দটি শাম, যার অর্থ নিরাপদ। 'ভালো' যার অর্থ শহর বা গ্রাম। উভয় শব্দ মিলে অর্থ দাঁড়ায় নিরাপদ নগরী বা শহর।

বিষ্ণুব্যাস শব্দটি দুটি শব্দ দ্বারা গঠিত। বিষ্ণু অর্থ আল্লাহ। ব্যাস অর্থ বান্দা (যার আরবি হলো আবদ)। সুতরাং তার দাঁড়ায়, 'তার পিতার নাম আবদুল্লাহ'। এবং কালকি অর্থ হলো পাপ ও গুনাহ থেকে পবিত্রকারী। আল্লাহ কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে তিনি পবিত্রকারী ও শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা সম্বোধন করেছেন—

[১৭২] গীতা : ২/১৮।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

(হে নবি) আপনি তাদের ধনসম্পদ হতে সদকা গ্রহণ করুন, যদ্দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করে দেবেন, আর তাদের জন্য দুআ করুন। নিঃসন্দেহে আপনার দুআ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ, আর আল্লাহ খুব শোনেন, খুব জানেন। [সুরা তাওবা, আয়াত : ১০৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

আল্লাহ শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। [সুরা আহযাব, আয়াত : ৩৩]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন—

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৬]

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্রকরণের কারণ ছিলেন। যে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাঁকে সত্যায়ন করে এবং তাঁর আনীত ধর্ম অনুযায়ী আমল করে, সে আল্লাহর হুকুমে পবিত্র হয়ে যায়। মহানবির বেশ কয়েকটি নাম আছে। যেমন তিনি নিজেকে মাহি নামে পরিচয় দিয়েছেন। মাহি শব্দের অর্থ—যার মাধ্যমে কুফরি মুছে যায়। আর কুফরি জঘন্যতম নাপাকি।

জুবাইর ইবনে মুতইম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয় আমার কিছু নাম আছে। আমি মুহাম্মদ। আমি আহমাদ। আমি আল মাহি। আল্লাহ তাআলা আমার মাধ্যমে কুফরিকে নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি

সমবেতকারী, মানুষকে আমার কদমে সমবেত করা হবে। আমি সর্বশেষ নবি। যার পরে কোনো নবি আসবে না।'[১৭৩]

২. মহাঋষি কালকি বিষ্ণুব্যাসের গৃহে তার স্ত্রী সুমতি থেকে জন্মগ্রহণ করে।[১৭৪]

সুমতি শব্দের অর্থ নিরাপদ ও শান্ত মেয়ে। আমরা এই অর্থের মাঝে ও মহানবির মা আমেনার নামের মাঝে সম্পর্ক দেখতে পাই। আর বিষ্ণুব্যাস হলেন আবদুল্লাহ।

৩. তিনি মাদুহ নামক চান্দ্র মাসের বারোতম দিবসে জন্মগ্রহণ করেন।[১৭৫]

'মাদুহ' অর্থ হলো কাঙ্ক্ষিত মাস এবং মানুষের প্রিয় মাস। আর সেটি হলো রবি বা বসন্ত। ইতিহাসবেত্তা ও সিরাতবিদরা একমত যে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, তিনি রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

ইবনে আবি শাইবা তাঁর মুসান্নাফে হজরত জাবের ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের ১৮ তারিখ সোমবার হস্তী সালে জন্মগ্রহণ করেন। সোমবারে নবুওয়তপ্রাপ্ত হন। এই দিনেই মেরাজ সংঘটিত হয়। এই দিনেই তিনি হিজরত করেন এবং এই দিনেই ওফাত বরণ করেন।

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-তে ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহু বলেন, সঠিক তারিখ হলো ১২ তারিখ। ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ২৩ তারিখ মোতাবেক জ্যোতির্বিদ মাহমুদ পাশা সুদৃঢ়ভাবে বলেছেন।

৪. মহাঋষি কালকি আট গুণে গুণান্বিত হবেন।[১৭৬]

এ পর্যায়ে আমরা এই অষ্টগুণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব। উল্লেখ্য, হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এই আট গুণে গুণান্বিত কোনো মহারথী পাওয়া যায়নি। এমনকি বিশেষত কলিযুগে প্রতীক্ষিত নবির মাঝেও এ সকল গুণ বিদ্যমান নেই।

---

[১৭৩] *সহিহুল বুখারি* : ৬/৫৫৪, *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং : ২৮৪২, *মুসনাদু আহমাদ* : ৪/৮০০, *সুনানু দারিমি* : ২/২১৮, ইবনু সাদ : ১/১০৪। তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।

[১৭৪] কালকি পুরাণ : ২/১১।

[১৭৫] কালকি পুরাণ : ২/১৫।

[১৭৬] ভগবত পুরাণ : ১২/২-১৯।

আট গুণগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো—

প্রথম : প্রজ্ঞা (Pragya)

প্রজ্ঞা থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খবর দান করা। এতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সত্যায়নস্বরূপ আল্লাহপ্রদত্ত মুজিজা বা অলৌকিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আলিমগণ *দালায়িলুন নবুওয়াত* নামে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ হলো, *কিতাবুল বায়হাকি*। তাতে মুজিজার বর্ণনা সংবলিত শত শত হাদিস রয়েছে।

দ্বিতীয় : কুলীনতা (Culinata)

অর্থাৎ এই নবি সম্প্রদায়ের অতি সম্মানী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হবেন।

ইমাম আহমাদ মুত্তালিব ইবনে আবি ওদাআহ থেকে বর্ণনা করে বলেন, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, লোকদের কিছু কথা মহানবির কাছে পৌঁছলে তিনি মিম্বরে উঠে বললেন, 'আমি কে?' তারা বলল, আপনি আল্লাহর রাসুল। তিনি বললেন, 'আমি মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মুত্তালিব। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টি সৃজন করেছেন। অতঃপর আমাকে সর্বোত্তম সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাদেরকে দুই দলে বিভক্ত করেছেন। অতঃপর তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ দলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি সকল গোত্র সৃষ্টি করেছেন। আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি তাদেরকে নানা ঘরবাড়িতে বিভক্ত করেছেন। আমাকে সর্বোত্তম বাড়িতেই অন্তর্ভুক্ত করলেন। সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নিবাসী। সর্বোত্তম মানুষ।'[১৭৭]

ওয়াসিলা ইবনুল আসকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ ইবরাহিমের বংশধর থেকে ইসমাইলকে নির্বাচিত

---

[১৭৭] ইমাম আহমাদ *মুসনাদে* ২/২১০, *সুনানুত তিরমিজি* :৩৬০৮, *বায়হাকি* :১/১৬৯ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। সকলে

سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعة عنه

উক্ত সনদে রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, হাদিসটি সহিহ।
আমি বলছি, মুত্তালিব ইবনু আবু ওদাআহ মক্কা বিজয়ের দিন ইসলামগ্রহণকারী সাহাবি। ইয়াজিদ ইবনু আবি জিয়াদ হাশেমি (হাশেমিদের আজাদকৃত) কুফি দুর্বল বর্ণনাকারী। তিনি বয়োবৃদ্ধ হয়ে গেলে যুবক অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়। তাকে বুঝিয়ে দিতে হতো। তিনি শিয়া মতাদর্শী ছিলেন। কিন্তু *মুতাবিআত* ও *শাওয়াহেদে* তার মতো বর্ণনাকারীর সমস্যা হয় না। গ্রহণ করা যায়। তার শাওয়াহেদ হাদিসের উদাহরণ যেমন ওয়াসিলা ইবনুল আসকার হাদিস, যা পরে বর্ণিত হয়েছে।

করেছেন। বনু ইসমাইল থেকে বনু কিনানাকে নির্বাচন করেছেন। বনু কিনানা থেকে কুরাইশকে নির্বাচন করেছেন। কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে নির্বাচন করেছেন। আর আমাকে বনু হাশিমের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন।[১৭৮]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের সরদার হবো। আর প্রথমে আমি কবর থেকে উত্থিত হবো। আমি প্রথম সুপারিশকারী। সুপারিশ-গৃহীত ব্যক্তি হবো।[১৭৯]

রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস রাসুলুল্লাহর বংশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে আবু সুফিয়ান কাফির অবস্থায় সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি আমাদের মাঝে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশধর মানুষ। হিরাক্লিয়াস বলল, তার গোষ্ঠীদের মাঝে তথা অতি সম্মানী ও বেশি গোত্রসমৃদ্ধ সম্প্রদায়ে রাসুলগণ প্রেরিত হন।

তৃতীয় : ইন্দ্রিয়দমন (Indridaman)

অর্থাৎ আত্মসংযমী ব্যক্তি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যদের চেয়ে খুবই আত্মসংযমী ছিলেন। কারণ, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে শয়তানের একটি সঙ্গ থাকে, যে তাকে খারাপ নির্দেশ দেয় এবং তার জন্য মন্দ ও নিষিদ্ধ কাজগুলো সুন্দররূপে সাজিয়ে দেখায়। ফলে মানুষ নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে শয়তানের ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত রেখেছেন।

অনুরূপ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গতরাতে অবাধ্য জিনের একটি দৈত্য আমার কাছে এসেছিল অথবা এ ধরনের কিছু কথা তিনি বললেন, আমার সালাত নষ্ট করার উদ্দেশ্যে। তখন আল্লাহ আমাকে তার ওপর আধিপত্য দিলেন। আমি ইচ্ছা করলাম, মসজিদের খুঁটিগুলোর একটির সঙ্গে ওকে বেঁধে রাখতে, যাতে ভোরে তোমরা সকলে ওটা দেখতে পাও। তখন আমার ভাই সুলাইমান (আ.)-এর দুআ স্মরণ হলো। তিনি দুআ করেছিলেন رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দান করো এমন

[১৭৮] *সহিহু মুসলিম* : ৪/১৭৮২, *সুনানুত তিরমিজি* : ৩৬০৫, তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।

[১৭৯] *সহিহু মুসলিম* : ৪/১৭৮২, *সুনানু আবি দাউদ* : ৫/৫৪।

এক রাজ্য, যার অধিকারী আমি ব্যতীত আর কেউ না হয়।' বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন।[১৮০]

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, তোমাদের মধ্যে কে তার জৈবিক চাহিদাকে রাসুলের মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে?[১৮১]

সহিহ হাদিসসমূহে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইঙ্গিত করেন যে, 'কুস্তিতে যে লড়ে সে মহাবীর নয়; ক্রোধের সময় আত্মসংযমী ব্যক্তিই মহাবীর।'[১৮২]

চতুর্থ : শ্রুত (Shrut)

অর্থাৎ তাঁর কাছে খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান আছে। এর দ্বারা ওহি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাঁর কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি বা ঐশী বাণী। কুরআনুল কারিম বলে—

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

> এবং সে মনগড়া কোনো কথা বলে না। এটা তো ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। [সুরা নাজম, আয়াত ৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ

> সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতো। আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। [সুরা হাক্কাহ, আয়াত ৪৪]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন—

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

> এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায়, যাতে তুমি সতর্ক করতে পার উম্মুল কুরা (মক্কা) এবং তার চতুর্দিকের জনগণকে। [সুরা শুরা, আয়াত : ৭]

---

[১৮০] *সহিহুল বুখারি* : ১/৫৫৪, *সহিহ মুসলিম* : ১/৩৮৪।
[১৮১] *সহিহুল বুখারি* : ১/৪০৩।
[১৮২] *সহিহুল বুখারি* : ১০/৫৬৬ (মুআল্লাক), *সহিহ মুসলিম* : ৪/২০১৪, *মুসনাদু আহমাদ* : ২/২৬৮। সকলে হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেন।

পঞ্চম : পরাক্রম (Prakram)

অর্থাৎ অপরাজিত সুঠাম পুরুষ। গড়নে তিনি একজন সুসম্পন্ন গাম্ভীর্যপূর্ণ ত্রুটিহীন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ। এর দ্বারা স্থূলকায় উদ্দেশ্য নয়। রাসুলের গড়ন সম্বন্ধে হজরত বারা ইবনে আজেব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যমাকৃতির ছিলেন। দুই কাঁধের মাঝখানে অন্যদের তুলনায় সামান্য প্রশস্ত ছিল।[১৮৩]

আলি ইবনু আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈহিক গঠন বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি দীর্ঘ কিংবা বেশি খাটো ছিলেন না। তার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের তালু এবং আঙুলসমূহ ছিল মাংসল। তাঁর মাথা ছিল কিছুটা বড় এবং হাত-পায়ের জোড়াগুলো ছিল মোটা। বুক হতে নাভি পর্যন্ত পশমের একটি সরু রেখা প্রলম্বিত ছিল। যখন পথ চলতেন, মনে হতো যেন কোনো উঁচু স্থান হতে নিচে অবতরণ করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তার পূর্বে কিংবা পরে আমি তার মতো (অনুপম আকর্ষণীয়) আর কাউকে দেখিনি।[১৮৪]

এসব গঠনে ও দেহে সুস্থ ব্যক্তির গুণাবলি যা পুরুষের জন্য প্রশংসিত। নারীর জন্য নয়। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহৎ ও ভীতিপ্রদ-রূপে পরিচয় দেওয়া হয়। যেন রাসুলকে শত্রুরা ভয় পায়।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ' أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً '.

---

[১৮৩] *সহিহুল বুখারি* : ৬/৫৬৫, *সহিহ মুসলিম* : ৪/১৮১৮, *সুনানুন নাসায়ি* : ৮/১৮৩, *মুসনাদু আহমাদ* : ৪/২৮১।

[১৮৪] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং : ৩৬৩৭, ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান ও সহিহ। *মুসতাদরাক হাকিম* : ২/৬০৪, ইমাম জাহাবি রহ. হাদিসটি সহিহ ও মুওয়াফিক বলেছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকে দান করা হয়নি। ১. আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, একমাস দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়। ২. সমস্ত জমিন আমার জন্য পবিত্র ও সালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যেকোনো লোক ওয়াক্ত হলেই সালাত আদায় করতে পারবে। ৩. আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কারও জন্য হালাল করা হয়নি। ৪. আমাকে (ব্যাপক) শাফাআতের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ৫. সমস্ত নবি প্রেরিত হতেন কেবল তাদের সম্প্রদায়ের জন্য, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য।[১৮৫]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি বেশি অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত শব্দ (জাওয়ামিউল কালিম) দ্বারা প্রেরিত হয়েছি এবং আমি প্রভাব দিয়ে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি।[১৮৬]

বর্ণিত আছে, রুকানা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কুস্তি লড়েন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধরাশায়ী করেন।[১৮৭]

ষষ্ঠ : অল্পভাষী

---

[১৮৫] *সহিহুল বুখারি* : ১/৪৩৬-৪৩৭, *সহিহ মুসলিম* : ১/৩৭১।

[১৮৬] *সহিহ মুসলিম* : ১/৩৭১।

[১৮৭] *সুনানু আবু দাউদ* : ৪/৩৪০-৩৪১, *সুনানুত তিরমিজি* : ৪/২৪৭-২৪৮। ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিজি উভয়ে মুহাম্মদ ইবনে রাবিয়া আবুল হাসান আল আসকালানি থেকে, তিনি আবু জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে রুকানা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে উক্ত সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন। তারা আরও বৃদ্ধি করেন—

فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس

'আমাদের ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হলো টুপির ওপর পাগড়ি পরিধান করা।'

তিরমিজি রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান গরিব। সনদটি প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা আবুল হাসান আল আসকালানিকে ও ইবনে রুকানাকে চিনি না। প্রকাশিত গ্রন্থে হাদিসটি হাসান গরিব আছে। বিশিষ্ট হাদিস বিশারদ আল্লামা মিযযি হাদিসটি তাঁর *তুহফাতুল আশরাফ* এ *গরিব* বলে উল্লেখ করেছেন। তবে আবু দাউদ এর সনদে উল্লেখ হয়েছে আবু জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে রুকানার সনদে।

হাদিসটি ইবনু কানে তার *মুজামে* আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে রুকানা থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। অতঃপর হাদিসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমনটি মিজ্জি বলেছেন। ইবনে সাদ তার গ্রন্থ *তাবাকাতে ইবনে সাদ*-এ আবুল হাসান আল আসকালানি, তিনি আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে রুকানা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। ইবনু সাদ-আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনু রুকানার উপনাম বলেছেন। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালোই জানেন।

স্বল্পভাষী অর্থাৎ কথা কম বলেন। আর মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশি অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত শব্দ দেওয়া হয়েছে, যা অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শুনেছি, আমি বেশি অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত শব্দ দ্বারা প্রেরিত হয়েছি।[১৮৮]

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহর বাচনভঙ্গি প্রসঙ্গে বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের মতোই কথা বলতেন। তবে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় এমনভাবে কথা বলতেন, যেন তাঁর কাছে সমবেত লোকেরা তা আত্মস্থ করতে পারে।[১৮৯]

সপ্তম : দান (Dan)

অর্থাৎ উদার দানশীল ব্যক্তি যে তার সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করে না। এই গুণে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ছিলেন।

হজরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুলের কাছে কখনো কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি না বলতেন না।[১৯০]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উদার ব্যক্তি। তাঁর বদান্যতা রমজানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেশি থাকতো। তাঁর কাছে জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে কুরআন পাঠ করতেন। যখন তাঁর সঙ্গে জিবরাইল সাক্ষাৎ করেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুবাতাসের চেয়েও বেশি উদার হয়ে যেতেন।[১৯১]

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো বস্তু বা জিনিস আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখতেন না।[১৯২]

---

[১৮৮] *সহিহুল বুখারি* : ১২/৪০১, *সহিহ মুসলিম* : ১/৩৭১।

[১৮৯] *সুনানুত তিরমিজি* : ৫/৬০০, শামায়েল, হাদিস নং : ২২৪, *মুসনাদু আহমাদ* : ৬/২৫৭, *ইবনু সাদ* : ১/৩৭৫। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উক্ত হাদিস হাসান।

[১৯০] *সহিহুল বুখারি* : ১০/৪৫৫, *সহিহ মুসলিম* : ৪/১৮০৫, *সুনানুত দারিমি* : ১/৩৪, *ইবনু সাদ* : ১/৩১৮, আবুশ শাইখ : ৪৭, *সুনানুত তিরমিজি* (শামায়েলে), হাদিস নং : ৩০২, *বাগবি শারহুস সুন্নাহ* : ১৩/২৫০।

[১৯১] *সহিহুল বুখারি* : ৬/৩০৫, ৬/৫৬৫ ও ৯/৪৩, *সহিহ মুসলিম* : ৪/১৮০৩, *সুনানুন নাসায়ি* : ৪/১২৫, *মুসনাদু আহমদ* : ১/২৩১,২৮৮,৩৪৬,৩৬৩, *সুনানুত তিরমিজি* (শামায়েলে), হাদিস নং : ৩০৩, ইবনু সা'দ : ১/৩৬৮-৩৬৯, আবুশ শাইখ:৪৬। *বাগভি শারহুস সুন্নাহ* :১৩/২৫০।

[১৯২] *সুনানুত তিরমিজি*, হাদিস নং : ২৩৬২, *ইবনে হিব্বান* : হাদিস নং : ২১৩৯,২৫৫৫, *বাগভি* : ১৩/২৫৩। সনদটি মুসলিমের শর্তে সহিহ।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরও বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে তার কাছে কিছু যাচনা করলেন। তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি ছাগল-পাল দান করলেন। উক্ত ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের কাছে এসে বললেন, তোমরা মুসলিম হয়ে যাও। কারণ, মুহাম্মদ দুর্ভিক্ষে নির্ভীক লোকের মতো দান করেন।[১৯৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদারতা ও দানশীলতার বিষয়ে এটি অল্পই বর্ণনা।

অষ্টম : কৃতজ্ঞতা (Kritagyata)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়শ মদিনার আনসারি সাহাবিদের সাহায্য ও সুসম্পর্কের কথা বলতেন। তিনি তাদের মধ্যকার হতে আশাও করতেন।

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি আনসারগণ এক উপত্যকা বা এক গিরিপথে চলে, আমি আনসারদের উপত্যকায় চলবো। যদি হিজরত না হতো, আমি আনসারদেরই একজন হতাম।[১৯৪]

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্বন্ধে বলেন, আবু বকরের সম্পদ আমাকে যতটুকু উপকার করেছে, অন্য কোনো সম্পদ এত পরিমাণ আমাকে উপকার দেয়নি।[১৯৫]

রাসুলের এই মহৎ গুণের ব্যাপারে আল্লাহর একটি বাণীই যথেষ্ট, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত আছেন। [সুরা কলম, আয়াত : ৪]

---

[১৯৩] *সহিহ মুসলিম* : ৪/১৮০৬, *বাগভি* : ১৩/২৫৩, *আবুশ শাইখ*, পৃষ্ঠা : ৪৭।

[১৯৪] *সহিহুল বুখারি* : ৭/১১২।

[১৯৫] *মুসনাদু আহমাদ* : ২/২৫৩, ৩৬৬, *ইবনু মাজাহ* : ১/৩৬, *ইবনু আবি শায়বা* : ১২/৬, *ইবনু আসিম ফিস সুন্নাহ* : হাদিস নং-১২২৯। সকলে মুয়াবিয়া আমাশ থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। সনদটি সহিহ।

৫. তিনি ঘোড়ায় চড়বেন। তাঁর থেকে নূর (দীপ্তি) বিচ্ছুরিত হবে। ভীতি ও সৌন্দর্যে তাঁর মতো কেউ হবে না। তিনি খতনা প্রাপ্ত হবেন। আর লক্ষ লক্ষ জালিম (অত্যাচারী) ও কাফির (অস্বীকারকারী)-কে বিনাশ করবেন।[১৯৬]

উপরোক্ত গুণাবলি মহানবির সঙ্গে কতই না মাননসই! সামনে এর সবিস্তার বর্ণনা বিধৃত হলো।

১. হজরত জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নকশি চাদর পরিহিত অবস্থায় জ্যোৎস্নারাতে দেখেছি। আমি তাঁর দিকে ও চাঁদের দিকে দেখতে থাকি। আমার কাছে তিনি চাঁদের চেয়েও অতীব সুন্দর।[১৯৭]

২. আবু ইসহাক বলেন, জনৈক ব্যক্তি বারা ইবনে আজেব রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারক কি তরবারির মতো ছিল? তিনি উত্তর দিলেন, না। বরং চাঁদের মতো ছিল।[১৯৮]

৩. ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনের দাঁত হালকা ফাঁকা ছিল। যখন তিনি কথা বলতেন, মনে হতো তাঁর সামনের দু-দাঁতের মাঝখান থেকে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।[১৯৯]

---

[১৯৬] ভগভদ পুরাণ : ১২/০২/২০।

[১৯৭] *সুনানুত তিরমিজি* : হাদিস নং : ২৯১১, *সুনানুত দারিমি* : ১/৩০, *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৪/১৮৬, তাবারানি (মুজামুল কাবির) : ১৮৪২ ও *আবুশ শাইখ আখলাকুন নবি সা.* গ্রন্থে বর্ণনা করেন। প্রত্যেকে আশআশ ইবনে সিওয়ার-আবু ইসহাক থেকে, তিনি জাবির ইবনে সামুরা থেকে বর্ণনা করেন।

তবে আবুশ শাইখ হাদিসটি শুবা আবু ইসহাক থেকে, তিনি বারা রাদি. থেকে বর্ণনা করেন।

তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, উক্ত হাদিস হাসান গরিব। আমি আশয়াসের হাদিসই জানি। শুবা ও সাওরি আবু ইসহাক বারা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণনা করে বলেন, হাদিসটিতে দীর্ঘ কথা আছে। আমি মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইলের কাছে জানতে চাইলাম—বারা রাদি. থেকে আবু ইসহাকের বর্ণিত হাদিসটি অধিক সহিহ নাকি জাবের ইবনে সামুরার হাদিস অধিক সহিহ?

তিনি উভয় হাদিসকে সহিহ বললেন। আমি বলেছি আশয়াস ইবনু সিওয়ার দুর্বল রাবি (বর্ণনাকারী)। যেমনটি হাফিজ ইবনে হাজার বলেছেন। কিন্তু শুবা ও সাওরি তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। অথচ তারা আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস ছিলেন। তবে হাকিম তাকে সহিহ বলেছেন। আর ইমাম জাহাবি তার সঙ্গে একমত হয়েছেন। আবু ইসহাক উভয় সনদে তথা জাবের ইবনে সামুরা ও বারা রাদিয়াল্লাহু দুজন সাহাবি থেকে বর্ণনা করেছেন। তাই ইমাম বুখারি সহিহ বলেছেন। উক্ত মতনৈক্য কোনো অস্বীকৃতি বা সাব্যস্ত করা নিয়ে নয়। বরং সনদ আনয়নে এ মতানৈক্য।

[১৯৮] *সহিহুল বুখারি* : ৬/৫৬৫, *সুনানুত তিরমিজি* : ৩৬৪০, *সুনানুত দারেমি* : ১/৩২, *ত্বয়ালিসি* : ২৪১১, *মুসনাদু আহমদ* : ৪/২৮১। তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, হাসান সহিহ।

আর হিন্দুরা খতনা সেকালেও করতো না। এ কালেও করে না।

ঘোড়ার আরোহণের ব্যাপারে বলা যায় হিন্দু নেতাদের কেউ ঘোড়ায় চড়েছে এমন ইতিহাস জানা নেই। তবে সর্বশেষ নবি ঘোড়ায় চড়বে বলে তারা কল্পনা করেছে। আমরা দেখতে পাই, হিন্দুরা তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে তাদের নেতাদেরকে বিভিন্নরূপে চিত্রায়িত করে। উদাহরণস্বরূপ রামকে তারা তিরন্দাজরূপে চিত্রায়িত করেছে। সর্বশেষ নবি কালকিকে চিত্রায়ণ করেছে, চার ডানা বিশিষ্ট ঘোড়াতে আরোহণকারী হিসেবে। সুতরাং ঘোড়ায় আরোহণকারী এই ব্যক্তি কে?

৬. তিনি তাঁর চার সঙ্গীর সহযোগিতায় শয়তানকে নিধন করবেন। আর ফেরেশতারা যুদ্ধে তাঁর সহযোগিতার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।[২০০]

এতে রাসুলের চার সাহাবি খোলাফায়ে রাশেদিনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যারা রাসুলের জীবদ্দশায় মন্ত্রীর সমতুল্য ছিলেন। আর রাসুল ও সাহাবিদের সহযোগিতার জন্য পৃথিবীতে ফেরেশতা অবতরণের বিষয়ে কুরআনে আলোচিত বদর কাহিনিতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ—

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

---

[১৯৯] *সুনানুত তিরমিজি* (শামায়েলে) হাদিস নং-১৩। ইমাম সুয়ুতি রহ. জামে সগিরে সহিহ বলে তাবারানি ও বায়হাকির দিকে নিসবত দেন। হাদিসটির সনদে রাবি আবদুল আজিজ বিন আবু সাবিত জুহরি-হাফেজের মতে 'মাতরুক' বা পরিত্যাজ্য। তার বই-পুস্তক পুড়ে গেলে তার স্মৃতিশক্তি থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন। ফলে তার বড় বড় ভুল হতো। তিনি বংশনামা-বিশারদ ছিলেন।

[২০০] কলকি পুরাণ : ২/৫-৭।

স্মরণ করো সেই সংকট মুহূর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট কাতর-কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবুল করে বলেছিলেন; নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবো, যারা একের পর এক আসবে। আল্লাহ এটা করেছিলেন শুভ সংবাদ হিসেবে এবং যাতে তোমাদের চিত্ত আশ্বস্ত হয়। বস্তুত সাহায্য তো শুধু আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। যখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন, আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, (উদ্দেশ্য ছিল) তোমাদেরকে এর দ্বারা পবিত্র করবেন এবং তোমাদের হতে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করবেন, আর তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করবেন এবং তোমাদের পা স্থির ও প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতার নিকট প্রত্যাদেশ করলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখো, আর যারা কাফির, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দেবো। অতএব, তোমরা তাদের স্কন্ধে আঘাত হানো, আর আঘাত হানো তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রতিটি জোড়ায়। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ শাস্তিদানে খুবই কঠোর। [সুরা আনফাল, আয়াত ৯-১৩]

৭. তিনি জন্মগ্রহণের পরে 'পরশুরাম' থেকে শিক্ষার্জনের জন্য পাহাড়ের অভিমুখী হবেন। অতঃপর উত্তর দিকে যাবেন। অতঃপর তার জন্মভূমিতে ফিরে আসবেন।[২০১]

'পরশুরাম' অর্থ হলো, মহাগুরু বা মহান শিক্ষক। এই সুসংবাদে মহানবির জীবদ্দশায় সংগঠিত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ঘটনা সুস্পষ্টভাবে আঁচ করতে পারি।

১. নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে হেরা গুহায় তাঁর ধ্যানমগ্নতা। এবং তাঁর কাছে 'اقرأ' -এর ওহি নিয়ে প্রথম জিবরাইল আলাইহিস সালামের আগমন।

২. মক্কার উত্তর দিকে অবস্থিত মদিনাতে মহানবির হিজরত।

৩. মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর জন্মস্থান মক্কাতে ফিরে আসা।

---

[২০১] কলকি পুরাণ।

৮. নিশ্চয় লোকেরা তাঁর দেহ থেকে নিঃসৃত সুবাসে বিমোহিত হয়। আর তাঁর দেহের পবিত্র সুবাস বাতাসে মিশে যায়। আত্মা ও প্রাণ কোমল ও স্নিগ্ধ করে দেয়।[২০২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শামায়েল হতে জানা যায়, তাঁর দেহ মুবারক হতে সুগন্ধময় ঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হতো। এ ব্যাপারে অনেক সাহাবির বর্ণিত হাদিস রয়েছে। নিম্নে কিছু হাদিস উল্লেখ করবো।

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের চেয়ে কোমল আমার হাত দ্বারা রেশমি বস্ত্র ও কোনো বস্তু স্পর্শ করিনি। রাসুলের সুঘ্রাণ হতে অতীব পবিত্র ঘ্রাণ আমি কখনো শুঁকিনি।[২০৩]

জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে প্রথম নামাজ আদায় করেছি। অতঃপর তিনি তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে গেলেন। আমি তাঁর সঙ্গে বের হলাম। তাঁকে কয়েকটি ছোট বাচ্চা অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তিনি এক এক করে প্রত্যেকের গণ্ডদেশ স্পর্শ করতে লাগলেন। জাবির রাদিয়াল্লাহু বলেন, আমার গণ্ডদেশ তিনি স্পর্শ করলেন। আমি তাঁর হাত ঠান্ডা অথবা সুগন্ধময় পেয়েছি। যেন আতরের ডিব্বা থেকে তাঁর হাত মুবারক বের করেছেন।[২০৪]

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে তাশরিফ আনেন। তিনি আমাদের কাছে 'কাইলুলা' (ভর দুপুরের বিশ্রাম) করলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি ঘেমে গেলেন। আমার মা কাচের একটি শিশি নিয়ে তাতে ঘামগুলো সংগ্রহ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে বললেন, হে উম্মে সুলাইম, তুমি কী করছ? আমার মা উত্তরে বললেন, এগুলো আপনার ঘাম মুবারক। আমরা আমাদের সুগন্ধি দ্রব্যে রাখবো। আর তা হবে সবচেয়ে বেশি সুগন্ধময়।

অপর বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইমের গৃহে এসে কাইলুলা করতেন। তিনি (উম্মে সুলাইম) তার জন্য মাদুর বিছিয়ে দিতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচুর ঘাম ঝরতো। উম্মে সুলাইম ঘাম মুবারক জমা করে সুগন্ধির সঙ্গে বোতলে রেখে দিতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[২০২] ভগবত পুরাণ : ২/২/২১

[২০৩] *সহিহুল বুখারি* : ৬/৫৬৬, *সহিহ মুসলিম* : ৪/১৮১৪, *মুসনাদু আহমাদ* : ৩/১০৭,২০০, *বায়হাকি* (দালায়িলুন নাবুওয়াতে) : ১/২৫৪।

[২০৪] *সহিহ মুসলিম* : ৪/১৮১৪, *বায়হাকি* (দালায়িল) : ১/২৫৬।

ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, হে উম্মে সুলাইম, এগুলো কী? তিনি উত্তর দিলেন, আপনার ঘাম। তার সঙ্গে আমি আমার সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রণ করি।[২০৫]

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুণের সমাহার ছিলেন। তিনি যে পথে হেঁটে যেতেন, ওই পথে পরে কেউ হেঁটে গেলে রাসুলের সুগন্ধময় ঘাম অথবা তাঁর ঘামের গন্ধে বুঝতে পারতেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইপথ দিয়ে হেঁটে গেছেন।[২০৬]

অথচ হিন্দু সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ তাদের জন্য সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। এবং তাদের মনকে সংবরণ করার জন্য দেহে মাটি মিশ্রণ অবধারিত করে। ফলে তাদের দেহ থেকে ঘৃণ্য দুর্গন্ধ বের হয়।

৯. প্রথম যিনি জবাই করেন ও কুরবানি দেন, তিনি হলেন 'আহমেদু'। অতঃপর তিনি সূর্যরূপ হয়ে গেলেন।[২০৭]

অর্থাৎ তিনি আল্লাহর জন্য জবাই করেছেন। জাহেলি যুগের লোকেরা 'গাইরুল্লাহ' তথা মূর্তি ইত্যাদির জন্য পশু জবেহ করতো। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে আসা প্রচলিত বিধান আল্লাহর জন্য পশু কুরবানি পুনরায় ফিরিয়ে আনেন। আল্লাহর কাছে মহানবির মর্যাদা বেড়ে যায়। ধর্ম প্রচার ও সমুন্নত শিক্ষাদানে মহানবি সূর্যের মতো হয়ে যান।

কোনো হিন্দু পণ্ডিত *আহমেদু* শব্দের সংস্কৃত ভাষায় অর্থ করতে পারেনি। কারণ *আহমেদু* শব্দটি সংস্কৃত শব্দ নয়। ফলে তারা অসংখ্য ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। 'বেদ অভিধান' প্রণেতা 'মাক্রোনেল' ও 'কিৎ' অজ্ঞতার ভান করে তাদের অভিধানে শব্দটি আদৌ উল্লেখই করেনি।

১০. অতি শীঘ্রই একজন আধ্যাত্মিক গুরু তাঁর সম্মানিত সফরসঙ্গীদের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করবে। তিনি 'মহামেদ' নামে মানুষের মাঝে সুপরিচিত হবে। তাকে আমির বা নেতা নিম্নোক্ত স্লোগান বা কথা বলে অভ্যর্থনা দেবে—

---

[২০৫] *সহিহু মুসলিম* : ৪/১৮১৬, *মুসনাদু আহমদ* : ৩/১৭৭, ২৯০, *বায়হাকি* (দালায়িলে) : ১/২৫৭-২৫৮।

[২০৬] *বায়হাকি* (দালায়িল) : ৬/৬৯।

[২০৭] সাম বেদ : ৩/৬/৮।

হে মরুভূমির অধিবাসী বা মরুবাসী, শয়তানকে পরাভূতকারী, অসংখ্য মোজেজার অধিকারী, সকল অনিষ্ট থেকে মুক্ত, সত্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত, আল্লাহর পরিচয়ে সম্যক অবগত ও শক্তিশালী এবং আল্লাহ প্রেমিক। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনার গোলাম। আমি আপনার পদযুগলে জীবন কাটিয়ে দেবো।[২০৮]

'মহামেদ' শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না। শব্দটি মুহাম্মদের বিকৃত রূপ। উল্লিখিত গুণাবলি হিন্দু কোনো রথী-মহারথীর মাঝে পাওয়া যায়নি। উক্ত গুণাবলি আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে।

১১. কালপরিক্রমায় মানবজাতির সম্মিলিত কল্যাণের আত্মপ্রকাশের সময় যখন ঘনিয়ে আসবে, তখন তিনি হক বা সত্য জানবেন। মুহাম্মদের আবির্ভাবের মাধ্যমে সমূহ-অন্ধকারের অবসান ঘটবে। আর প্রজ্ঞা ও প্রতিভার আলো উদ্ভাসিত হবে।[২০৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত-প্রাপ্তির পূর্ব সময়কাল জাহিলি যুগ হিসেবে খ্যাত। নবুওয়ত-প্রাপ্তির পরবর্তী সময় ইসলাম, জ্ঞান ও সামাজিক কল্যাণের যুগ হিসেবে প্রসিদ্ধ। মহানবির নবুওয়তের মাধ্যমে অন্ধকারসমূহ নিঃশেষ হয়।

১২. অগ্নিদেবী সুমহান বিধির প্রবক্তা আমি তোমাকে কুরবানি বা পশু বলিদানের জন্য পৃথিবীর নাভিস্থলে পাঠাব।[২১০]

ভূগোলবিদের মতে, মক্কা পৃথিবীর নাভিস্থলে অবস্থিত। এতে করে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, প্রতীক্ষিত নবি অতি সত্বর মক্কাতে আবির্ভূত হবেন।[২১১]

হিন্দু পণ্ডিতরা পৃথিবীর (মধ্য) নাভিস্থল নির্ধারণ করেননি। এতে প্রতিভাত হয়, তারা তাদের দেশের (ভারতে) পৃথিবীর নাভিস্থল খুঁজে পাননি। ফলে, তারা এ ব্যাপারে মত প্রকাশ না করে চুপ থাকেন।

আমার সম্মুখে হিন্দু পণ্ডিত শ্রী শর্মাচার্য কর্তৃক রচিত ঋগ্বেদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। কিন্তু ঋগ্বেদের এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় তিনি কিছুই বলেননি।[২১২]

---

[২০৮] ভবিষ্য পুরাণ : ৩/৩/৫-৮।
[২০৯] ভগবত পুরাণ : ২/৭৬।
[২১০] ঋগ্বেদ : ৩/২৯/৪।
[২১১] *রাহমাতুল লিল আলামিন* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১, শাইখ মুহাম্মদ সুলায়মান মনসুরপুরী।
[২১২] ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা-২/৪৯২।

মিশরীয় বিজ্ঞানী ডক্টর হোসাইন কামাল উদ্দিন নতুন আবিষ্কারের কাহিনি বর্ণনা করে বলেন, তিনি একটি গবেষণা শুরু করেছেন। গবেষণার লক্ষ্য সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। তা হলো—বিশ্বের নানা প্রান্তে কিবলার স্থান নির্ধারণ ও জানার উপায় বা মাধ্যম আবিষ্কার করা। কারণ, তিনি বহির্বিশ্বে নানান যাত্রাকালে উপলব্ধি করেন যে, কিবলার স্থান নিরূপণকারী মসজিদ শূন্য কোনো জায়গাতে অথবা অপরিচিত দেশে প্রত্যেক মুসলিমের কিবলা নির্ধারণে সমস্যা হয়। তেমনইভাবে বহির্বিশ্বে সহস্রাধিক প্রবাসী ছাত্রেরও কিবলা নির্ধারণ দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাই ডক্টর হোসাইন কামাল উদ্দিন কিবলার দিকগুলো নির্ধারণ করার লক্ষ্যে পৃথিবীর নতুন মানচিত্র তৈরির চিন্তা করেন।

এ মানচিত্র প্রস্তুতির প্রাথমিক গবেষণায় প্রথম রেখাগুলো স্থাপন ও পাঁচ মহাদেশ অঙ্কনের পর তাঁর কাছে কৌতূহলের সঙ্গে একটি বিষয় উন্মোচিত হয়। মিশরীয় বিজ্ঞানী মক্কা মুকাররমার স্থান পৃথিবীর মিড্‌ল পয়েন্ট বা ঠিক মাঝখানে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর হাতে ধরে কম্পাসের একটি কোণ মক্কা নগরীতে রাখলেন। কম্পাসের অপর কোণটি সকল মহাদেশের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরালেন। অতঃপর তাঁর কাছে প্রমাণিত হলো যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের স্থলভাগ মক্কার আশপাশে পরিবেষ্টিত। আর এমতাবস্থায় মক্কাকে স্থলভাগের প্রাণকেন্দ্র পায়।

তিনি আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পূর্বে প্রাচীন বিশ্বের মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন—বারবার প্রচেষ্টার পরে—তাঁর কাছে উন্মোচিত হয় যে, ইসলামের দাওয়াতের সূচনালগ্নেও মক্কা প্রাচীন বিশ্বের মানচিত্রে স্থলভাগের প্রাণকেন্দ্র বা নাভিস্থল ছিল।[২১৩]

১৩. ভীতিকর ইন্দ্র প্রথমবারের মতো 'অশুক' নামক একপ্রকার ঘোড়াতে চড়ে আসমানে ঊর্ধ্বগমন করেন। তিনটি কক্ষপথ অতিক্রম করেন।[২১৪]

ঋগ্বেদের এই অনুচ্ছেদগুলোতে ঘোড়া, আংটি ও আরবে আবির্ভূত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা এসেছে। ইন্দ্র শব্দটি মূলত হিন্দুদের কাছে গর্জনের প্রভুর নাম। তবে তার গুণবাচক অর্থ হলো ভীতিকর বা ভয়ানক। 'অশুক' নামক ঘোড়াতে এই বার্তাবাহক বা রাসুল (ইন্দোর) আকাশের তিনটি কক্ষপথ পাড়ি দিয়েছেন।

এই অনুচ্ছেদের কিয়দংশ মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে।

---

[২১৩] মক্কাতুল মুকাররমা মারকাযুল আলাম, *আল-ইলমু ওয়াল ঈমান* পত্রিকা, সংখ্যা ২০, প্রকাশকাল : ১৯৭৭।

[২১৪] ঋগ্বেদ : ১৬৩/১/৩।

আল্লাহ তাআলার বাণী—

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ.

> ফলে, তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহি করার তা ওহি করলেন। যা সে দেখেছে তার অন্তকরণ তা অস্বীকার করেনি। সে যা দেখেছে, তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত সুরম্য উদ্যান। [সুরা নাজম, আয়াত : ৯-১৪]

উল্লিখিত ঘোড়া হলো, মিরাজের হাদিসে বর্ণিত *সহিহুল বুখারি*তে সংকলিত হাদিসে তার নাম এসেছে। 'অতঃপর আমি গাধার চেয়ে বড় খচ্চরের চেয়ে ছোট একটি বাহনে আসি।'

জারুদ বলেন, হে আবু হামজা সেটি কি 'বুরাক'? হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তার একটি পদক্ষেপ দিগন্তজুড়ে বিস্তৃত ছিল।'

হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে একটি মুরসাল হাদিস ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁকে জাগালেন। তাঁকে নিয়ে মসজিদে গেলেন। তাঁকে বোরাকে চড়ালেন। যা সাদা, খচ্চর ও গাধার মাঝামাঝি আকৃতির একটি জন্তু। তার দুই উরুতে দুটি পাখা ছিল। পাখাদ্বয়ের সাহায্যে সে পা-দ্বয় সঞ্চালন করে। আর হাত দুটিকে সে দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়ে রাখে। তিনি আমাকে ওই জন্তুটির ওপরে সওয়ার করালেন। অতঃপর আমাকে নিয়ে রওনা দিলেন। দুজনের কেউ কাউকে হারিয়ে না ফেলি এতটা পাশাপাশি আমরা চলতে লাগলাম।[২১৫]

হজরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখন আমি আরোহণ করতে তার (বোরাক) নিকটবর্তী হলাম, তখন সে এক পাশে সরে গেল। অতঃপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর হাত মাথার একটি বিশেষ গোশতে রেখে বললেন, হে বোরাক, তুমি যা করছ, তাতে তোমার লজ্জাবোধ হচ্ছে না। আল্লাহর শপথ করে বলছি,

---

[২১৫] *ইবনে হিশাম*, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা: ৩৯৭।

মুহাম্মদের চেয়ে সম্মানিত কোনো আল্লাহর বান্দা এর আগে তোমার ওপর আরোহণ করেনি। তুমি তাকে সম্মান করো। তিনি বললেন, অতঃপর বোরাকের লজ্জাবোধ হলো। তার থেকে ঘাম নিঃসৃত হলো। অতঃপর স্থির হলে আমি তার ওপর চড়ে বসি।'[২১৬]

নরাশংসর সুসংবাদ দান

'নরাশংস' শব্দটি দুটি শব্দে গঠিত। একটি *নর* অর্থ মানব। অপরটি *শংস* যার অর্থ প্রশংশিত (Praised)। সুতরাং নরাশংস শব্দের অর্থ হলো প্রশংসিত মানব বা লোকেরা যার প্রশংসা করেন। ড. রামেশ প্রসাদ সালামুল্লাহ সিদ্দিকীর বইয়ের ভূমিকায় বলেন, *নরাশংসের* আরবি শব্দ মুহাম্মদ। তার আলোচনা অথর্ববেদে এসেছে।

নিম্নে হিন্দুশাস্ত্রে নরাশংসের গুণাবলি সংবলিত অনুচ্ছেদগুলো প্রদত্ত হলো।

১৪. তিনি সুন্দর। পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে তিনি বেশি সুন্দর হবেন।[২১৭]

১৫. নিশ্চয় তাঁর (দীপ্তি) আলো ঘরে ঘরে প্রবেশ করবে।[২১৮]

অর্থাৎ ইসলাম দ্রুত প্রসার হবে। এবং সত্যধ্বনি প্রতিটি ঘরে প্রতিধ্বনিত হবে।

১৬. নিশ্চয় তিনি পাপ ও গুনাহ থেকে মানবজাতিকে পরিত্রাণ দেবে।[২১৯]

১৭. তিনি উটে চড়বেন।[২২০]

অথচ ভারতে উটে আরোহণের বিষয়টি প্রচলিত নয়। ইতিহাসে হিন্দু কোনো মহারথীর উটে চড়ার নজিরও নেই।

১৮. নিশ্চয় তাঁর ১২ জন পত্নী থাকবে।[২২১]

হিন্দুধর্মে একাধিক বিয়ে বৈধ নয়। হিন্দু কোনো রথী-মহারথীরও একের অধিক পত্নী ছিল না। তবে তাদের প্রভু কৃষ্ণের ব্যাপারে কথিত আছে যে, তার কতগুলো সেবিকা ছিল, যাদের সঙ্গে সে বিলাসব্যসন করতো। তারা গোপী নামে প্রসিদ্ধ। রাঁধা (Radha) নাম্নী একজনই তার পত্নী ছিল।[২২২]

---

[২১৬] *ইবনে হিশাম*, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা: ৩৯৮।
[২১৭] ঋগ্বেদ : ২/৩/২।
[২১৮] ঋগ্বেদ : ২/৩/২।
[২১৯] ঋগ্বেদ : ২/১০৬/৪।
[২২০] অথর্ববেদ : ২০/১২৭/২০।
[২২১] অথর্ব বেদ : ২০/১২৭/২।
[২২২] হিন্দু অভিধান, পৃষ্ঠা: ২৪৪-২৪৬।

পক্ষান্তরে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নীদের সংখ্যা নিম্নরূপ (১২ জন)—

প্রথম স্ত্রী

খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ বিন আসাদ বিন আবদুল উজ্জা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছরের বয়স্ক বিধবা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন। তিনি কাসিম, তায়্যিব, তাহির, আবদুল্লাহ, জয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা[২২৩] নামে চার ছেলে ও তিন কন্যাসন্তান জন্ম দেন। হিজরতের তিন বছর বা অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী এক বছর পূর্বে খদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে তার স্বামী ছিলেন আতিক বিন আয়িজ বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর বিন মাখজুম। প্রথম স্বামী আতিক ইন্তেকাল হলে তিনি আবু হালা হিন্দ বিন জুরারা ইবনে নাবাসের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

দ্বিতীয় স্ত্রী

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যুবরণ করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওদা বিন যামআ বিন কায়স বিন আব্দে শামসকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। তার চাচাতো ভাই সাকরান বিন আমর বিন আব্দে শামস পূর্বের স্বামী ছিলেন। তিনি মারা গেলে বিধবা সাওদাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহ করেন।

তৃতীয় স্ত্রী

তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা বিনতে আবু বকরকে বিবাহ করেন। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ছাড়া কোনো কুমারী বিবাহ করেননি। আয়েশার ছয় বছর বয়সে বিবাহ হয়। আর নয় বছর বয়সে হিজরতের সাত মাস পরে শাওয়াল মাসে রুখসতি হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ৯ বছর পাঁচ মাস সংসার যাপন করেন। ৫৮ হিজরিতে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন।

---

[২২৩] কেউ কেউ বলেন, ছেলে দুজন : কাসিম ও আবদুল্লাহ। তায়্যিব ও তাহির আবদুল্লাহর উপাধি নাম।

চতুর্থ স্ত্রী

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাফসা বিনতে ওমর বিন খাত্তাবকে হিজরতের কয়েক মাস পরে জীবনসঙ্গিনী করেন। হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাও বিধবা ছিলেন। তার পূর্বের স্বামী ছিল খুনায়স বিন হুজাফা সাহমি রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি উহুদ যুদ্ধে[২২৪] আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শহিদ হন। উম্মুল মুমিনিন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা হিজরি ৪৫ সনে পরলোক গমন করেন।

পঞ্চম স্ত্রী

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জয়নব বিনতে খুজায়মা বিন হারিসকে নিকাহ করেন। বদর যুদ্ধে শহিদ উবায়দা বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার পূর্বের স্বামী ছিলেন। কথিত আছে, পূর্বের স্বামীর নাম ছিল তুফায়ল বিন হারিস। কেউ কেউ বলেন, তুফায়ল তাকে তালাক দিলে উবায়দা বিবাহ করেন। উম্মুল মুমিনিন জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় বিবাহের আট মাস পর (কোনো বর্ণনায় দুই মাস পর) মৃত্যুবরণ করেন।

ষষ্ঠ স্ত্রী

এরপর উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়াকে বিবাহ করেন। আবু সালামা আবদুল্লাহ বিন আবদুল আসাদ আল মাখজুমি তাঁর পূর্বের স্বামী। উমর, সালামা, দুররা, জয়নব নামে চারজন সন্তান ছিল আবু সালামার। উম্মে সালামা ৫৯ হিজরি সনে ওফাত বরণ করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী পত্নী ছিলেন।

সপ্তম স্ত্রী

জয়নব বিনতে জাহাশ বিন রিয়াব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সপ্তম স্ত্রী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজাদকৃত দাস জায়েদ বিন হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু জয়নবের প্রথম স্বামী। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মহানবি ও জয়নবের বিবাহ করান।[২২৫] যখন মুসলিমরা দেশ-দেশান্তর বিজয় করতে লাগলেন, খলিফা উমর

---

[২২৪] *আল ইসাবা:* ১/৪৫৬

[২২৫] তিনি (জয়নব) অন্যান্য নবিপত্নীর ওপর গৌরব করে বলতেন, আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে আমাকে বিবাহ করিয়েছেন। এর দ্বারা কুরআনের বাণী উদ্দেশ্য করেন:

রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জন্য নির্ধারিত অংশ নিয়ে হাজির হলে জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা কেঁদে দেন। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন যেন আল্লাহ আগামী বছর তাকে না দেখান। অবশেষে তিনি দুনিয়ার স্বল্প চাহিদায় অবিচল থেকে বছর পূর্ণ না হতেই মহানবির সঙ্গে সাক্ষাৎ (ইন্তেকাল) করেন।

অষ্টম স্ত্রী

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস বিন আবু জিরারকে বিবাহ করেন। সাফওয়ান বিন জুশাকার নামক তাঁর এক চাচাতো ভাই পূর্বের স্বামী ছিলেন। ৫৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে তিনি মৃত্যু করেন।

নবম স্ত্রী

উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান সাখর বিন হারবকে হুদাইবিয়ার পরে বিবাহ করেন। উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাবাশা বা আবিসিনিয়া থেকে আগমন করেন। তিনি তথায় মুসলিম মুহাজিরা ছিলেন। তার আগের স্বামী উবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ আসাদি খ্রিষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

কথিত আছে, হাবশার বাদশা নাজাশি উম্মে হাবিবাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বিবাহ দেন। চারশত স্বর্ণ মুদ্রা (দিনার) মহর দেন। তিনি ৪৪ হিজরি সনে তার ভাই হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে মৃত্যু বরণ করেন।

দশম স্ত্রী

খায়বার বিজয়ের পর বনু নাজির গোত্রের সাফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতাবকে বিবাহ করেন। তিনি নবি হারুন বিন ইমরানের বংশধর ছিলেন। কিনানা বিন আবুল হুকাইক তার পূর্বের স্বামী ছিলেন। তিনি ৫০ হিজরিতে পরলোক গমন করেন।

একাদশ স্ত্রী

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

অর্থাৎ অতঃপর জায়েদ যখন তার (জয়নব) সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন তাকে আমি তোমার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম। [সুরা আহজাব, আয়াত : ৩৭]
সহিহুল বুখারি (ফাতহুল বারি):১৩/৪০৩-৪০৪

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ ও হজরত আবদুলাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর খালা মায়মুনা বিনতে হারিস বিন হাযানকে বিয়ে করেন। তার পূর্বের স্বামী কে ছিলেন তা নিয়ে একাধিক মত দেখা যায়। আবু রিহাম বিন আবদু উজ্জা বা আবু রিহমের ভাই হুয়াইতিব বা মাসউদ বিন আমর তার আগের স্বামী ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উমরাতুল কাজা আদায়কালে ইহরাম অবস্থায় মক্কাতে বিয়ে করেন। সারিফ নামক স্থানে বাসর-যাপন করেন। তিনি ৫১ হিজরিতে হজরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে মক্কাতে ইন্তেকাল করেন এবং মক্কাতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।[২২৬]

দ্বাদশ স্ত্রী

রাসুলের দ্বাদশ স্ত্রী ছিলেন মারিয়া বিনতে শামউন কিবতি মিসরি। তিনি নবিজির পুত্র ইবরাহিমের জননী। তাকে ইসকান্দারিয়ার গভর্নর রাসুলের জন্য উপঢৌকন হিসেবে পাঠান। সঙ্গে তার বোন শিরিন, মাবুর নামক একজন খোজা গোলাম ও দুলদুল নামে খ্যাত একটি খচ্চরও হাদিয়া দেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গভর্নরের হাদিয়া গ্রহণ করেন। মারিয়াকে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন। তিনি মিসরের হাফন নামক গ্রামে বাস করতেন। হজরত মারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার সম্মানার্থে ও তার গর্ভে মহানবির সন্তান ইবরাহিমের জন্মের আনন্দ প্রকাশার্থে হজরত মুয়াবিয়া তাঁর খেলাফতকালে উক্ত নগরবাসী থেকে খারাজ (ভূমিকর) মওকুফ করে দেন। বলা হয়, মারিয়া অত্যন্ত শুভ্র ও সুশ্রী ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি বিমোহিত হয়ে তাকে ভালোবাসতেন। বিশেষত ইবরাহিম জন্ম নিলে উম্মুল মুমিনিন হজরত মারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা অধিক সম্মানী হন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বোন শিরিনকে হজরত হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহাকে হেবা বা দান করে দেন। খোজা বালক মাবুর রীতিমতো হজরত মারিয়া ও শিরিনের বিনা অনুমতিতে তাদের রুমে প্রবেশ করতেন। একদল লোক তার এই বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার কারণে আপত্তি করে। কিন্তু তারা বেমালুম ভুলে যায়, সে একজন খোজা।

উপঢৌকনে প্রাপ্ত দুলদুল খচ্চরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চড়তেন।

উপর্যুক্ত ১২ জন উম্মুল মুমিনিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে স্বল্প বা দীর্ঘ বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ ছিলেন। এছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

২২৬ হাফিজ ইবনে আবদিল বার রাহিমাহুল্লাহু তাঁর মৃত্যু ৪৯ হিজরির মতটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। *আল ইসাবা* : খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪১৩।

সাল্লামের আরও বেশ ক'জন পত্নী ছিলেন। তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে একান্ত মিলিত হওয়ার পূর্বে তারা হয়তো মৃত্যুবরণ করেছেন, নতুবা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তালাক প্রদান করেছেন।

তারা নিম্নরূপ—

১. আলিয়া বিনতে জাবয়ান বিন আমর। রাসুল তাঁকে বিবাহ করেছেন। তবে তাঁর সঙ্গে একান্ত হওয়ার পূর্বেই তাঁকে তালাক দেন।

ইমাম জুহরি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু আমরের এক মহিলাকে বিয়ে করেন। রাসুলের কাছে খবর আসে, তার শ্বেত রোগ আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তালাক দেন। একান্ত হননি।

২. ইবনুল জাওন কিন্দির বোন উমাইয়া বিনতে নুমান বিন শুরাহবিল। তিনি রাসুল থেকে আশ্রয় চেয়ে বলেন, আমি বড় আশ্রয় নিয়েছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, 'তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও।' একান্তে মিলনের পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তালাক দিয়ে দেন।

৩. খাওলা বিনতে হুজাইল বিন হুবায়রা তাগলিবি। সিরিয়া থেকে মদিনাতে নিয়ে আসার পথে মারা যান। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খালা শারাফ বিনতে ফাদালা বিন খলিফাকে বিয়ে করেন। তিনিও সিরিয়া থেকে মদিনাতে নিয়ে আসার মাঝপথে মারা যান।

৪. আমরা বিনতে জায়েদ। বনু কিলাবের জনৈক মহিলা। ফজল বিন আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব তাঁর পূর্বের স্বামী ছিলেন। একান্ত হওয়ার পূর্বে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তালাক দেন।

৫. বনু নাজির গোত্রের রায়হানা বিনতে জায়েদ। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি বনু কুরায়জা গোত্রের ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি সুদর্শনা ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দিত হন। ষষ্ঠ হিজরিতে তাঁকে জীবন সঙ্গিনী নির্বাচন করেন। উম্মুল মুমিনিন রায়হানা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলের কাছে ছিলেন। তিনি মদিনাতে থাকাকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯. তাঁর শত শত সঙ্গী (সাহাবি) তাঁর দাওয়াতের আঞ্জাম দেবে।[২২৭]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদেরকে ইসলামের পয়গাম নিয়ে দিক-দিগন্তে পাঠানোর বার্তা বহন করে।

হজরত আমর বিন উমাইয়া দামরিকে হাবাশার বাদশাহ নাজাশির কাছে পাঠান। দিহয়াতুল কালবিকে কায়সারের কাছে পাঠান। আবদুল্লাহ বিন হুজাফা সাহমিকে কিসরার কাছে পাঠান। হাতেব বিন আবি বালতাআকে মিশরের প্রধান ইস্কান্দারিয়ার গভর্নরের মুকাওকিসের কাছে পাঠান। শুজা বিন ওয়াহাব আসাদিকে হারিস বিন আবি শিমর গাসসানির কাছে পাঠান। সালিত বিন আমার আমিরিকে হাউজা বিন আলি আল হানাফির কাছে পাঠান। আমার বিন আসকে আজদ বংশীয় জালান্দিরের দুইপুত্র, জাইফার ও আবদের কাছে পাঠান। তাদের মধ্যে জায়ফার বাদশাহ হয়েছিলেন। জারির ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালিকে জিল কিলা বিন নাকুর বিন হাবিব বিন মালিক বিন হাসসান বিন তাবা ও জি আমরের কাছে পাঠান।

এমনিভাবে রাসুলের পক্ষ থেকে সাহাবিগণ রাসুলের মহান বাণীগুলো ধারণ করেছেন। তারা সকলেই ইসলাম প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবির সংখ্যা এক লক্ষের বেশি ছিল। জনৈক ব্যক্তি আবু জুরআ রাজির কাছে প্রশ্ন করে বলেন, হে আবু জুরআ, নবিজির হাদিস সংখ্যা চার হাজার বলা যাবে না?

আবু জুরআ জিজ্ঞেস করলেন, এ কথা কে বলল? (বিরক্তবোধ করে) আল্লাহ তাআলা তার কর্তিত দন্তগুলো কেটে দিক। এটা অবিশ্বাসীদের কথা। কে হাদিস গণনা করছে? রাসুলুল্লাহ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাহাবি ছিলেন। তারা রাসুলের কাছে শুনেছেন। তাঁর থেকে রেওয়ায়েত (বর্ণনা) করেছেন।

আবু জুরআকে বলা হলো, হে আবু জুরআ, সাহাবিরা কোথায় ছিলেন? আর কোথায় থেকে শুনেছেন?

উত্তরে তিনি বলেন, মদিনা এবং মক্কাবাসী, এতদুভয়ের মধ্যাবস্থানকারীগণ, বেদুইন ও তাঁর সঙ্গে বিদায় হজে উপস্থিত সাহাবিবৃন্দ।[২২৮]

মহানবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো নেতা, বীর, সেনাপতি বা নবির ইতিহাসে স্বল্পতম সময়ে এত বিপুল পরিমাণ আত্মত্যাগী নিবেদিতপ্রাণ কাফেলা গড়ে তোলার নজির নেই।

---

[২২৭] অথর্ব বেদ : ২০/১২৭/৩০।

[২২৮] দেখুন : *তালকিহু ফাহমি আহলিল আসর*, পৃষ্ঠা : ১০৩। *মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ*, পৃষ্ঠা : ২৬৮।

২০. তিনি দশ হারের মালিক বা অধিকারী।[২২৯]

রাসুলের দশ সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবির ইঙ্গিত আছে। কারণ, মহানবির কাছে তাঁদের মর্যাদা গণ্ডদেশের হারের মতো।

দশ সাহাবি নিম্নরূপ—

১. প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২. দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩. তৃতীয় খলিফা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৪. চতুর্থ খলিফা আলি বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৫. আবু উবায়দা বিন আল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এই উম্মতের আমিন বা বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত করেন।

৬. তালহা বিন উবায়দুল্লাহ বিন উসমান আল কুরায়শি রাদিয়াল্লাহু আনহু। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে জীবদ্দশায় শাহাদতের সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। *সহিহ মুসলিমে* সংকলিত[২৩০] হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসে এসেছে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, তালহা বিন উবায়দিল্লাহ ও জুবাইর হেরা গুহায় ছিলেন। অতঃপর পাথর নড়ে উঠলে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি শান্ত হও। নড়ো না। তোমার ওপরে যারা অবস্থান করছে তারা হয়তো একজন নবি অথবা সিদ্দিক অথবা শহিদ। তিনি জুমাদাল উখরা অথবা রজব মাসে ৩৬ হিজররি সনে শাহাদত বরণ করেন।

৭. জুবায়ের বিন আল আওয়াম বিন খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (হাওয়ারি) সঙ্গী। তিনিই প্রথমে আল্লাহর রাস্তায় তরবারি খাপমুক্ত করেন।

৮. আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আটজনের একজন।

৯. সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

১০. সাঈদ বিন জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

---

[২২৯] অথর্ব বেদ : ২০/১২৭/৩, উকুদ : ইকদ এর বহুবচন।
[২৩০] *সহিহ মুসলিম* : ৪/১৮৮০।

উক্ত দশ সাহাবির অনেক মর্যাদা ও গুণাবলি আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। মহান আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

হে নবি, আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসেবে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। [সুরা আহজাব, আয়াত : ৪৫-৪৬।]

২১. হে লোক সকল, নরাশংসের মর্যাদা সমুন্নত হবে।[২৩১]

আল্লাহ তাআলার মহান বাণী—

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। [সুরা আলাম নাশরাহ, আয়াত ৪]

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমান-জমিনে প্রশংসিত ছিলেন। তা মিরাজের ঘটনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কারণ, প্রতিটি আসমানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফেরেশতারা অভ্যর্থনা দিয়ে সম্মান জানান।[২৩২]

অথর্ববেদের বিংশ কাণ্ডে 'কান্তাব' নামক একগুচ্ছ অনুচ্ছেদ আছে। কান্তাব অর্থ গোপন, আবৃত। অর্থাৎ এই অনুচ্ছেদগুলোর গূঢ়রহস্য বা ভেদ ভবিষ্যৎ বা অনাগত কালই উন্মোচিত করবে। তাই এই অনুচ্ছেদগুলোকে 'কান্তাব' বা গোপন অনুচ্ছেদ বলা হয়ে থাকে। এই গোপন অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে রয়েছে—

২২. হে লোকসকল, তোমরা শোনে রাখো, নরাশংস প্রশংসিত হবেন। তিনি ৬০ আর ৯০ হাজারের মধ্যে থেকে হিজরত করবেন। আমি অবশ্যই তাঁকে তাঁর শত্রুদের থেকে

---

[২৩১] অথর্ব বেদ : ২০/১২৭/১

[২৩২] *ইবনে হিশাম*, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা: ৪০৭ (হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিস, ইবনে ইসহাক তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেন, 'জিবরাইল আ. তাঁকে (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিয়ে কোনো আসমানে গেলেই প্রবেশে অনুমতি চাওয়া হলে তারা (ফেরেশতারা) বলতেন, হে জিবরাইল! ইনি কে? তিনি উত্তর দিতেন, মুহাম্মদ। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করতেন, তিনি কি নবি? জিবরাইল উত্তর দিতেন, হ্যাঁ। তারা বলতেন, আল্লাহ তাকে বন্ধু হিসেবে দীর্ঘ হায়াত দান করুন! এভাবে সপ্তম আসমান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন।

হেফাজত ও নিরাপদ রাখবো। তিনি উটে আরোহণ করবেন। তার ১২ জন পত্নী থাকবে। আমি 'মামেহ'-কে ১০০ খাঁটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিয়েছি। ১০টা তাসবিহ ও ৩০০ ঘোড়াও দান করেছি।[২৩৩]

ব্যাখ্যা :

১. এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলির ইঙ্গিত আছে।

২. মহা নবির মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের কথা ইঙ্গিত আছে।

৩. ৬০ থেকে ৯০ হাজার মক্কার অধিবাসী হওয়ার কথা ইঙ্গিত আছে।

৪. মহানবিকে শত্রু থেকে হেফাজত করার কথা ইঙ্গিত আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফের) হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না। [সুরা মায়েদা, আয়াত ৬৭]

৫. *মামেহ* শব্দটি দুটি শব্দে গঠিত। *মা* তথা মহা অর্থ বিশাল, মহান। *মেহ* অর্থ প্রশংসা করা হয়েছে, যার বা প্রশংসিত ব্যক্তি। উভয় শব্দ মিলে অর্থ হলো বিশ্বজগতে অধিক প্রশংসিত ব্যক্তি। আমাদের মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া এই গুণের অধিকারী আর কে হতে পারে?

৬. ১০০ খাঁটি স্বর্ণ মুদ্রা (দিনার)। এতে ইঙ্গিত আছে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী একনিষ্ঠ সাহাবিদের প্রতি।

৭. ১০ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবিদের ইঙ্গিত আছে।

৮. ৩০০ ঘোড়া বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন সাহাবির ইঙ্গিত বহন করে। আল্লাহই ভালো জানেন।

অথর্ববেদের অনুচ্ছেদগুলো হিন্দুরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে পড়ে থাকে। আমাদের মহানবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া এই সুসংবাদগুলোর উপযুক্ত ব্যক্তি ইতিহাসে কেউ আছে, এমন প্রমাণ নেই। হাজার হাজার বছর থেকে হিন্দুরা এই নবির অপেক্ষা করে আসছে। অথচ উক্ত গুণাবলি-সম্পন্ন নবি চৌদ্দশ বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছেন, এ ব্যাপারে তারা অজ্ঞতার ভান করে।

---

[২৩৩] অথর্ব বেদ : ২০/১২৭/১।

২৩. রাতের গহিনে সিন্দু রাজা-বাদশা 'ভোজে'র কাছে এক সজ্জন এসে বলল, হে বাদশাহ, নিশ্চয় আপনার 'আর্য ধর্ম' ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কিন্তু আমি বড় খোদার হুকুমে এমন এক ব্যক্তির ধর্ম প্রকাশ করছি, যিনি সকল পবিত্র খাবার খাবেন। তিনি হবেন (হিন্দুদের বিপরীত) খতনাপ্রাপ্ত। তার মাথায় (হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো) গিঁটযুক্ত প্রতীকী বেণি থাকবে না। তার দীর্ঘ দাড়ি থাকবে। বিশাল বিপ্লব ঘটাবেন। মানুষের মাঝে ঘোষণা দেবেন। শূকরের গোশত ছাড়া সকল হালাল পবিত্র খাবার গ্রহণ করবেন। তাঁর ধর্ম দ্বারা সকল ধর্ম রহিত হবে। আমি তাদেরকে 'মুসলি' (ওহিদানকারী বড় খোদা) এই ধর্মের নাম দিয়েছি।[২৩৪]

২৪. বুদ্ধ থেকে পর্যায়ক্রমে একাধিক বর্ণনা আছে, মৃত্যুকালে তাঁর অন্যতম শিষ্য আনন্দকে বলেন—

> 'হে আনন্দ, তুমি চিন্তিত হয়ো না। কারণ, আমি প্রথম ও শেষ বুদ্ধ নই। বরং আমার পরে এমন একজন আসবেন, যার হৃদয় হিংসা ও বিদ্বেষমুক্ত হবে। তিনি সুষ্ঠু বিবেকবান হবেন। তিনি লোকদেরকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করবেন। মানবজাতির জন্য পথ আলোকিত করবেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা চিরকাল থাকবে।'[২৩৫]

হিন্দু পণ্ডিতদের স্বীকারোক্তি মতে, ঋগ্বেদে শেষ জামানায় মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের ইঙ্গিতবহ অনেক সংবাদ পাওয়া যায়।

২৫. রামচন্দ্রের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মানুষ কত কক্ষ পথ অতিক্রম করলে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে?

তিনি উত্তর দিলেন, ১৪ কক্ষ পথ।

তাকে প্রশ্ন করা হলো, কেউ কি কক্ষপথগুলো পরিভ্রমণ করেছে? উত্তর করলেন, না।

বলা হলো, আপনিও না। তিনি বললেন, না।

তাকে বলা হলো, সেই কক্ষপথগুলোতে কেউ কি পৌঁছতে পারবে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

বলা হলো, তাঁর নামটা কী?

---

[২৩৪] ভবিষ্য পুরাণ:৩/৩/৩/২৩-২৭।

[২৩৫] শেষ কালের নবি, বেদ, পৃষ্ঠা: ৬৯।

তিনি বললেন, তার নাম 'মহামেদ'।

তাকে বলা হলো, তিনি কোথায় জন্ম নেবেন?

উত্তর দিলেন, পাথুরে ভূমিতে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। খেজুর বৃক্ষের দেশে জীবনযাপন করবেন। সেই দেশ থেকেই তাঁর ধর্ম সারাবিশ্বে প্রসার লাভ করবে।

তিনি যা বলবেন, তা বাস্তবায়িত হবে।

যে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করবে, সে স্বর্গে প্রবেশ করবে। যে তাঁর ধর্মকে অস্বীকার করবে, সে নরকে যাবে। তিনি গোশত খাবেন। দুধপান করবেন। তরবারি দিয়ে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আর শত্রুদের রাজ্য বিজয় করবেন।[২৩৬]

এগুলো হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত শেষ জামানার প্রতীক্ষিত নবির গুণাবলি। এগুলো দিবানিশি তারা জপ করতে থাকে। তারা অদ্যাবধি ভারতে নবির আবির্ভাবের অপেক্ষা করছে। অথচ তারা জানে না তাদের নবি ও বিশ্বনবি চৌদ্দশ বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছেন। ইসলাম ও নবির বিরুদ্ধে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জাহিলি যুগের গোঁড়ামি তাদের অন্ধ ও বধির বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ .

> আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্দ্বারা উপলব্ধি করে না; তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু তারা তদ্দ্বারা দেখে না। তাদের কর্ণ রয়েছে কিন্তু তদ্দ্বারা তারা শোনে না। তারা হলো পশুর মতো, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফেল বা উদাসীন। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭৯]

তবে যারা আল্লাহ তাআলার দয়াপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাঁকে সত্যায়ন করে এবং মুমিনদের দলে শামিল হয়, তারাই সফলকাম।

হিন্দু সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, বই-পুস্তকে প্রাপ্ত তথ্যাদি আমি তুলে ধরেছি। আল্লাহ তাআলা এগুলোর বিশুদ্ধতা ভালো জানেন। কারণ, হিন্দুশাস্ত্র ও পুস্তকাদি অন্ধকারের (অজ্ঞাতসারে) মধ্যেই রচিত হয়েছে। শাস্ত্রগুলোর স্ব-স্ব লেখক প্রমাণ করা খুবই দুরূহ বিষয়।

---

[২৩৬] *আল বিশারাতুল মুহাম্মাদিয়া,* আবদুল আজিজ জামালুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ১১৮-১১৯, ইউসুফ প্রকাশনা, দিল্লী।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের ইসলামের নিয়ামত (অনুগ্রহ) দান করেছেন।

অযুত দুরূদ ও সালাম রহমত ও শান্তির নবির ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সকল সাহাবি ও কিয়ামত অবধি তাঁর অনুসারীদের জন্য।

শেষ কথা

হিন্দুধর্ম নিয়ে গবেষণার সমাপ্তিতে আমি মহান আল্লাহর সাহায্য ও তাওফিক কামনা করে এখানে কিছু কথা বলা সমীচীন মনে করছি।

মুসলিমদের সঙ্গে হিন্দুদের বৈরিতার বড় ও প্রধান কারণটি হলো, ইসলাম ধর্মের প্রকৃতি, বিশেষত তাওহিদের (একত্ববাদের) আকিদা-বিশ্বাস তারা সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। কারণ, ভারতীয় মুসলিম সুফিগণ সন্দিগ্ধ করে তোলেন ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসকে, যা কুরআন-সুন্নাহ প্রদর্শিত। উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষ-সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িনদের অনুসৃত পথ ও পন্থা, যার জন্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহু জিহাদ করেছিলেন এবং তৎপরবর্তী ইমাম শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহু প্রমুখ আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ যা আঁকড়ে ধরেছিলেন।

তদুপরি ভারতীয় মুসলিম সুফিগণ ইসলামি আকিদা ও পৌত্তলিক আকিদার মাঝে মিশ্রণ ঘটান। তার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ ও প্রমাণ হলো মন্দিরে মূর্তি-প্রতিমা কেন্দ্রিক হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠানাদির মতোই ভারতে অধিকহারে কবরে গম্বুজ করা, তাওয়াফ, সিজদা, (মৃত ব্যক্তির কাছে) সাহায্য প্রার্থনা, নজর-মানতসহ কবর কেন্দ্রিক পুরোদমে শিরকি কর্মকাণ্ডের প্রচলন।

একত্ববাদ (তাওহিদ) ও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামের স্বচ্ছ আকিদাকে এসব শিরকি কর্মকাণ্ড খুবই মলিন করেছে।

ইসলাম ও মুসলিমদের সঙ্গে হিন্দুদের ভুল বোঝাবুঝির আরেকটি কারণ হলো, হিন্দু লিখিয়েরা ইসলাম, ইসলামের আকিদা, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আমাদের সোনালি ইতিহাস নিয়ে অসত্য তথ্য ও সমূহ মিথ্যাচার ছড়িয়ে রেখেছে। ফলে, একজন হিন্দু শিক্ষার্থী তার শিক্ষাজীবনের প্রথম ধাপেই ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি খারাপ ধারণাটি পোষণ করে নেয়।

তাই ইসলামের মৌলিক গ্রন্থাদি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা ভারতের মুসলিমদের একান্ত কর্তব্য।[২৩৭]

অধিকন্তু মুসলিমরা প্রায় আট শতাব্দী ভারতবর্ষ শাসন করেছে। কিন্তু আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত কয়েকজন শাসক ব্যতীত হিন্দু প্রজাদের মাঝে ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস ও বিধিবিধান প্রচারে গুরুত্বারোপকারী শাসক আমাদের চোখে পড়েনি। বরং মুসলিমরা বেদ, গীতা ও রামায়ণের মতো হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রগুলো আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদে বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। অথচ তারা কুরআনুল কারিম, হাদিস শরিফ, মহানবির জীবনচরিত, খোলাফায়ে রাশেদিন, সাহাবি ও তাবিয়িনদের জীবনী ও বিশুদ্ধ আকিদার গ্রন্থরাজি ভারতবাসীদের ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় অনুবাদের দিকে ভ্রূক্ষেপই করেননি।

আমাদের সৌদি সরকার আল্লাহর পাক কালাম কুরআনুল কারিমের খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে বিশাল গৌরব অর্জন করেছেন। আল্লাহ তাআলা সৌদি আরবকে ইসলাম-বিদ্বেষী শত্রুদের সকল প্রতিহিংসা ও ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন।

ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশাল পরিমণ্ডলে বহু ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির প্রকাশিত হতে দেখে সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলিমের সম্মান ও গৌরব অর্জিত হলো।

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ তাআলা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। আমিন।

স মা প্ত

[২৩৭] যখন আমি এই অবস্থা (ভারতীয় মুসলিমদের এরূপ ঔদাসীন্য) দেখতে পাই, তখন আকিদা, সুলুক (চরিত্র, আচার-আচরণ), নবিদের কাহিনি ও তাদের দাওয়াত, জীবনী, বিভিন্ন সম্প্রদায়-জাতিগোষ্ঠী বিবিধ বিষয় সংবলিত কুরআনুল কারিমের বিশ্বকোষ গ্রন্থনায় সংকল্পবদ্ধ হই। আমি মহান আল্লাহর কাছে তাওফিক ও সামর্থ্য কামনা করছি।

ভারতবর্ষে যে সকল জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মাবলম্বী রয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকটি ধর্ম ও ধর্মের ইতিহাস, তাদের জীবনাচার, সংস্কৃতিচর্চা, প্রাকৃতিক গড়ন ও সত্যান্বেষা, সমূহ বিকৃতি ও বিভ্রান্তি, আন্তপ্রতিবেশি সুসম্পর্ক ও বৈরিতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

ওই সকল ধর্মে ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কাছে সত্যধর্ম তথা ইসলামের দাওয়াত কীভাবে পৌঁছেছে, কেন তারা সত্যধর্মকে গ্রহণ করেছেন বা করেননি, পূর্বেকার ইতিহাস ও পরের ইতিহাসের সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্নতা, তাদেরই বিবৃত বা গৃহীত ধর্মগ্রন্থের আলোচ্য বিষয়কে তারা কীভাবে পাশ কাটিয়ে যান—ইত্যাকার বিশদ বিবরণ উঠে এসেছে এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায়, অধ্যায়ে ও কথামালার আবরণে।

গ্রন্থটি আরবি ভাষায় লেখা। লেখক স্বয়ং নওমুসলিম। কিন্তু নও মুসলিম হলেও তার আলোচনা ও গভীর দৃষ্টিপাত ঐতিহ্যগত মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, নাড়িয়ে দিয়েছে, জাগিয়ে দিয়েছে রীতিমতো। সত্যপথকে আবিষ্কারের তথা হিদায়াতের পথে তার যে দুস্তর অভিযাত্রা, তা অলৌকিক প্রাপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ পথে মহান আল্লাহই যে তার একমাত্র সহায়, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

9 789849 919193